আবুল আসাদ

যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম সমাজ

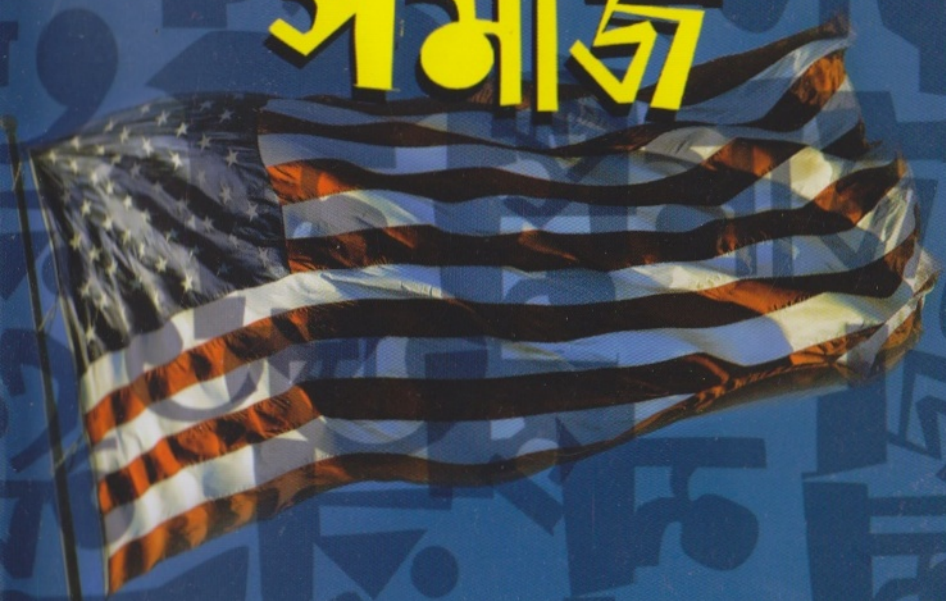

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশক
এপিক পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেল্‌স এণ্ড সার্কুলেশন :
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড (২য় তলা), দোকান নং-১৫, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭২-৪৩১২৫৪, ০১৭৬২-৪৩১২৫৪
ই-মেইল : publicationepic@gmai.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১৬
পৌষ, ১৪২৩
রাবী'উল আওয়াল, ১৪৩৮

মূদ্রণ : জননী প্রিন্টার্স
৩২, আজিমপুর রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন: ০২-৫৫১৫১৮৩৬, মোবাইল: ০১৭২২-৮৯৪৪১৫

বিনিময় : দুইশত টাকা মাত্র।

Juktarastre Dharma Somaj : Written by Abul Asad & Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Managing Director, EPIC Publication Private Limited, 1st Edition December 2016, Price Taka 200.00 only.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

'যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম সমাজ' শীর্ষক বইটি প্রথিতযশা সাংবাদিক ও সুলেখক জনাব আবুল আসাদের দুই দুইবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা। ১৯৯৫ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের **ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস প্রোগ্রামের** অধীনে প্রায় এক মাস **'যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে ধর্মের প্রভাব'** বিষয়ক সফরে সেখানকার ইসলাম, খ্রিষ্ট ও ইহুদী ধর্মের বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাত ও আলোচনা করেন। এরপর ২০০৩ সালে তিনি পুনরায় **মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের** আমন্ত্রণে পনের দিনের সফরে যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিলেন। অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং শিক্ষামূলক এই দুই সফরের অভিজ্ঞতা তিনি যারপরনাই সুন্দর ও সুখপাঠ্য করে তুলে ধরেছেন তাঁর এই লেখনীতে।

আস্ত:ধর্মীয় সংলাপ, সহাবস্থান, ভুল বুঝাবুঝির নিরসনসহ সেখানকার গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ, নাইন ইলেভেনের পর সেখানে মুসলমানদের অবস্থা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সৌজন্যবোধ, সময়ানুবর্তিতা, মানবাধিকার ও দেশপ্রেম ইত্যাদির কতক বাস্তব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণীয় বিষয় ফুটে উঠেছে তাঁর এই বইটিতে।

বইটি প্রকাশ করে বাংলাভাষী পাঠক/পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে পেরে **'এপিক পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড'** মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। সুধী পাঠক/পাঠিকাদেরকে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বইটি খোরাক জোগাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
এপিক পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড

www.pathagar.com

ভূমিকা

যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস প্রোগ্রামের অধীনে ১৯৯৫ সালে ১৬ মে থেকে ১০ জুন পর্যন্ত আমি যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছি। সফরের মধ্যে ছিল ওয়াশিংটন ডিসি, কলরাডো স্টেটের ডেনভার, ক্যালিফোর্নিয়ার লসএঞ্জেলেস, টিনেসি স্টেটের ন্যাসভিল, ইলিনয়ের শিকাগো, ইন্ডিয়ানা স্টেটের ব্লুমিংটন এবং প্লেনফিল্ড এবং নিউইয়র্ক। প্রোগ্রামে না থাকলেও আমরা জনৈক বাংলাদেশী ছাত্রের আমন্ত্রণে মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোর যাই।

সফরের বিষয় ছিল 'যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে ধর্মের প্রভাব'। এই বিষয়ে জানার জন্য ইসলাম, খ্রিস্ট ও ইহুদি ধর্মের বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও ব্যক্তিত্বের সাথে সাক্ষাৎ ও আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

আলোচনার মধ্যে ব্যাপক বিষয় শামিল হয়। তবে মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে চার্চ এবং স্টেট আলাদা হওয়া, যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে ধর্মের ভূমিকা, মার্কিন পাবলিক স্কুলে ধর্ম শিক্ষা নিষিদ্ধ হওয়া ও প্রার্থনার সুযোগ না থাকা, মানবাধিকার, ইসলাম ও গণতন্ত্র, ইসলাম ও সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও ইসলাম, বিশ্বশান্তি ও ধর্ম, খৃষ্টান-মুসলিম ডায়ালগ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, ধর্ম ও আগামী শতক, ধর্মহীনতা এবং অপরাধ প্রবণতার সমস্যা ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয় ছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর আমার জন্য একটা বিরাট সুযোগ। এতে মার্কিন জনগণকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে। অনেকভাবে তাদের জানার সুযোগ পেয়েছি এর ফলে। দেখেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি মুক্ত সমাজ। মত প্রকাশ ও সমিতি-সংগঠন কায়েমের সমান অধিকার সকলের আছে। আইনের চোখে সেখানে ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে কোনো বৈষম্য নেই। গণতন্ত্র যেন মার্কিন জনগণের ধ্যান ও জ্ঞান। জনসমর্থন নিয়ে যাই আসুক সেটাই তাদের কাছে শিরোধার্য। তাদের ধারণা গণতন্ত্রের মাধ্যমে কোনো মন্দ এলেও গণতন্ত্রের মাধ্যমেই তা দূর হয়ে যাবে। আবার এসব কিছুর অন্তরালে গ্রুপ বিশেষের মধ্যে শক্তি ও সন্ত্রাসের খেলাও রয়েছে।

গণতন্ত্র মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের জন্য এক ধরনের আফিমে পরিণত হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। গণতন্ত্র যাই করুক তাতে তাদের আপত্তি নেই।

www.pathagar.com

আলজেরিয়ার ব্যাপারে তাদের দ্বিমুখী নীতিতে তাদের কোনো অনুশোচনা নেই। তারা পরিষ্কার বলেছে, গণতন্ত্রের সিঁড়ি যারা গণতন্ত্রকে ধ্বংসের জন্য ব্যবহার করবে, তাদেরকে আমরা এ সিঁড়ি ব্যবহারের সুযোগ দিতে পারি না। এর উত্তরে যখন বলেছি, আপনাদের কথা যদি সত্যও হয় যে, তারা গণতন্ত্র ধ্বংস করবে, তবু তাদের ক্ষমতায় যেতে দেয়া উচিত ছিল। তারা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে গেলে জনগণই তাদেরকে আজ না হয় কাল ক্ষমতা থেকে নামিয়ে দিতো। জনগণের যেটা দায়িত্ব সেটা আপনাদের হাতে তুলে নেয়া ঠিক নয়। তারা উত্তরে বলেছে, জনগণ নামাবে, বিষয়টি একটা অনিশ্চিত ব্যাপার। গণতন্ত্র ধ্বংস করে জনগণের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা ৭২ বছর ক্ষমতায় ছিল।

মনে হয়েছে এক অতি গণতন্ত্র এবং চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার বল্গাহীনতা মার্কিন জনগণের মধ্যে তাদের জাতীয় লক্ষ ও আদর্শ সম্পর্কে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। তাদের এই শূন্যতা বা লক্ষহীনতারই সুযোগ গ্রহণ করেছে সেখানে ইহুদীরা।

মার্কিন সমাজের আরেকটা বৈশিষ্ট্য আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছে, সেটা হলো তাদের ইতিহাস প্রীতি, ঐতিহ্যপ্রীতি। তাদের জাতীয় নেতাদের তারা অত্যন্ত ভালোবাসে। জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, জেফারসন প্রমুখের স্মৃতি সৌধে গিয়েছি। কোনটিতে বার কয়েক যাওয়া হয়েছে। প্রতিবারই সেখানে যা দেখেছি, তাকে অনেকটা উৎসবের সাথে তুলনা করা চলে। বিশেষ করে কিশোর-তরুণদের উপস্থিতি খুবই বেশি। যাদুঘরগুলোতেও দেখেছি এই দৃশ্য। আমেরিকানরা তাদের জাতীয় বীরদের, জাতির জন্য জীবন বিসর্জনকারী সৈনিকদের কেমন ভালোবাসে তার জীবন্ত রূপ দেখেছি ভিয়েতনাম স্মৃতিসৌধ এবং অরলিংটন সমাধিভূমিতে গিয়ে। সেখানে উৎসব ছিল না, ছিল শ্রদ্ধাবনত গর্বিত হৃদয় বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণী এবং বৃদ্ধ-যুবাদের মৌন জনস্রোত। দেখে আমার মনে হয়েছে নিহত সৈনিকরা এ দৃশ্য যদি দেখত, তাহলে তারা কৃতজ্ঞ এ জাতির জন্য শুধু একবার নয়, শতবার মরতে চাইত। মার্কিনীদের এই ইতিহাসপ্রীতি, জাতীয় নেতা ও বীরদের প্রতি এই শ্রদ্ধা তাদের জাতীয় শক্তির এক অফুরান উৎস। এমন জাতির জীবনে নেতা ও বীরদের কখনও অভাব পড়ে না এবং জগৎ সভায় এমন জাতি তাদের অস্তিত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে চলে।

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা শতকরা আশি শতাংশেরও বেশি। কিন্তু কোনো ধর্মই বিশ্বাস করে না, এমন লোকের সংখ্যা সেখানে বাড়ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার্চ ছাড়াও খৃস্টান ধর্মীয় সংগঠন অসংখ্য। এর মধ্যে শতশত সামাজিক ও দাতব্য সংগঠনসহ ধর্মীয় রেডিও-টিভি নেটওয়ার্ক রয়েছে। আমরা একটি ধর্মীয় বার্তা সংস্থা ও দুইটি ধর্মীয় রেডিও-টিভি কেন্দ্র পরিদর্শন করেছি। এর একটি রেডিও-টিভি নেটওয়ার্ক যুক্তরাষ্ট্রসহ তেত্রিশটি দেশে, অপরটি ৪২টি দেশে অনুষ্ঠান প্রচার করে। তারা দর্শকদের কাছ থেকে মাসিক ভিত্তিতে ডোনেশন পায়। এটাই তাদের আয়ের মূল ভিত্তি, তারা বলেছে।

খৃস্টান ধর্মীয় সংগঠনগুলো অত্যন্ত বিত্তশালী। কারও কারও মতে সরকারও এত রিসোর্সফুল নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খৃষ্টান ইউনিভার্সিটি রয়েছে অনেক। তার একটি আমরা পরিদর্শন করেছি। আমাদের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে তা সুন্দর সুসজ্জিত।

খৃস্টানদের মধ্যে বিখ্যাত কিছু বুদ্ধিজীবী এবং সংগঠন রয়েছে, যারা চার্চ ও রাষ্ট্রকে আবার একত্র করতে চায়। তাদের মতে, রাজনীতি থেকে চার্চকে আলাদা রাখার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রটাকে শয়তানরা (Devils) এসে দখল করে ফেলেছে। ঐ শয়তানদের তাড়াতে হলে চার্চকে রাজনীতি করতে হবে। এদের সংখ্যা খুব নগণ্য। এদের সাথে আমাদের দেখা হয়নি। দেখা হলে বুঝা যেত, এদের সম্পর্কে যা শুনেছি তা সত্য কি না।

ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ের অধ্যাপক মি. হেনরী এক প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলেন, মার্কিন সমাজ খুবই ধর্মভীরু, কিন্তু সামাজিক প্রতিকূলতার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাঁর মতে, তাদের ফাউন্ডিং ফাদারদের সামনে ছিল ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা। ধর্ম ও রাষ্ট্রের রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বের রোমান অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে ফাউন্ডিং ফাদাররা চেয়েছিলেন রাষ্ট্র প্রশাসনকে ধর্ম প্রতিষ্ঠা বা ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে দূরে রাখতে। কিন্তু পরবর্তীকালে এর অপব্যাখ্যা, অপব্যবহার হয়েছে। শুধু ধর্ম থেকে রাষ্ট্রেরই বিচ্ছেদ ঘটানো হয়নি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সবকিছু থেকে ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে।

www.pathagar.com

আমেরিকান খৃস্টান ও খৃস্টান ধর্মীয় গ্রুপগুলোও তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা চিন্তা করে না। তাদের প্রশ্ন করেছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলতঃ দুইটি পক্ষ, একটি ধর্ম, অপরটি সেকুলার মতবাদ। সেকুলার মতবাদ নিজেই আজ এক ধরনের ধর্মে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থায় রাষ্ট্র যেহেতু সেকুলারিজমের পক্ষে কাজ করছে সেহেতু বলা যায় রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে সেকুলার ধর্ম পালনকারীতে পরিণত হয়েছে। যার ফলে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সেকুলার হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে সমাজে ধর্মহীনতাই প্রবল হয়ে উঠবে না কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তারা স্পষ্টই বলেছেন, মানুষ যা চায় সেটাই হবে, গণতন্ত্রের এটাই আদর্শ। সেই সঙ্গে তারা বলেছেন, রাষ্ট্র ধর্মের প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে যেমন কাজ করছে না, তেমনি ধর্মের বিরুদ্ধেও কাজ করছে না। রাষ্ট্র ও প্রশাসন যারা চালান তারাও ব্যক্তিগতভাবে ধর্ম পালন করেন।

একটা মজার ব্যাপার হলো, মার্কিন চার্চ ও স্টেট আলাদা হওয়া এবং সেখানে সরকারি স্কুলে প্রার্থনার ব্যবস্থা না থাকার কারণে সেখানে বিরাজিত অবস্থা বিষয়ে এক সময়ে যে ধারণা পোষণ করতাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর তা পরিবর্তন ঘটেছে।

ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা রাখার ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খৃষ্টান, মুসলমান ও ইহুদীদের মোটামুটিভাবে একমত দেখা গেছে। তবে কারণ ভিন্ন ভিন্ন। মুসলমানরা মনে করে চার্চ ও স্টেট এক হয়ে গেলে মুসলমানরা সংখ্যালঘু হয়ে যাবে এবং সংখ্যাগুরুর দয়ার পাত্র, এমনকি নির্যাতনেরও শিকার তারা হতে পারে। অথচ চার্চ ও স্টেট আলাদা থাকায় সকল ধর্মের সমান অধিকার এবং সমান মর্যাদা রয়েছে। ইহুদীরাও এটাই ভাবে। আর খৃষ্টানদের যুক্তি হলো, তাদের ফাউন্ডিং ফাদাররা ইউরোপীয়ান অভিজ্ঞতা সামনে রেখে রাষ্ট্র পরিচালিত ধর্মের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে নাগরিকদের রক্ষার জন্যই চার্চ ও স্টেট আলাদা রেখেছে। এর ব্যতিক্রম হলে দেশের ক্ষতি হবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি স্কুলে ধর্ম শিক্ষা ও উপাসনার ব্যাপারে মিশ্র মতামত দেখা গেছে। খৃষ্টানরা সাধারণভাবে এর বিরুদ্ধে, আবার খৃষ্টান কোয়ালিশন নামক একটা গ্রুপ এর বিরুদ্ধে নয়। সাধারণভাবে খৃষ্টানদের যুক্তি হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দু'শরও বেশি খৃষ্টান মত রয়েছে, এত মতকে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায়

www.pathagar.com

এ্যাকোমোডেট করা সম্ভব নয়। মুসলমানরা স্কুলে ধর্ম শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে, তবু সবাইকে এ ব্যাপারে খুব সিরিয়াস মনে হয়নি। অনেকে বলেছেন, এতে ধর্ম শিক্ষার প্রকার, প্রকৃতি, পরিমাণ ইত্যাদি নিয়ে যে বিতর্ক দেখা দেবে, লাভের চেয়ে তাতে ক্ষতিই বেশি হবে। তারা বলেছেন, সানডে স্কুল এবং কমিউনিটি স্কুলগুলোতে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা তারা করছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের আগমন ঘটে, অনেকের মতে, প্রাথমিক ইউরোপীয় সেটলারদের সাথে। বিশেষ করে স্পেন ও আফ্রিকা থেকে তারা আসেন সৈনিক অথবা দাস হিসেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে আমাদের এস্কর্ট অফিসার ইরউইন কার্ন ছিলেন নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের মানুষ। তার মতে স্পেন থেকে আসা ঐ ধরনের মানুষের বংশধর তাদের এলাকায় বেশ আছে। তাদের মুখে অপভ্রংশ আরবী শব্দ এখনও ব্যবহৃত হয়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন। 'ইনশাআল্লাহ' শব্দ তারা 'ওকালা' শব্দের আকারে ঐ একই অর্থে ব্যবহার করে। যা হোক পরবর্তীকালে আমেরিকায় মুসলমানদের আগমন শুরু হয় ১৮৭৫ সালের দিকে। ওসমানীয় খেলাফত কালে সিরিয়া, লেবানন এলাকা থেকে মুসলমানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসে। তারপর ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত পাঁচটি পর্যায়ে মুসলমানদের আগমন ঘটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তাদের সাথে আজ যুক্ত হয়েছে ইসলাম গ্রহণকারী ব্ল্যাক ও হোয়াইট আমেরিকান। সব মিলিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের মার্কিন মুসলিম সমাজ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইসলামের জন্য খুবই উর্বর ক্ষেত্র মনে হয়েছে আমার কাছে। মুসলমানরা এখনই আমেরিকায় দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মীয় সম্প্রদায়। ১৯৭০ সালের পর মুসলমানদের সংখ্যা ও তৎপরতা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০ সালের পর এ বৃদ্ধি অত্যন্ত দ্রুত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত মসজিদ আছে তার শতকরা ৭৮ ভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮০ সালের পর। পক্ষান্তরে, ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৯ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শতকরা ১৫ ভাগ, ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শতকরা ৫ ভাগ এবং অবশিষ্ট শতকরা ২ ভাগ হয়েছে ১৯৬০ সালের আগে। এ হিসাব থেকে বোঝা যায় ইসলামের প্রচার ও প্রভাব ১৯৮০ সালের পর কত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মসজিদের সংখ্যা বলা মুশকিল। অধিকাংশ মসজিদই গীর্জা কিনে তৈরি করা হয়েছে। দোকান ভাড়া নিয়ে তাকে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এসবের অনেকগুলো মসজিদ হিসাবে রেজিস্টার্ড নয়। কিছু কিছু হিসাব মতে ৬০৮টি মসজিদ আছে। লসএঞ্জেলেসের বেলাল মসজিদ এবং শিকাগোর মুষ্ঠিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী মসজিদ বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে। ওয়াশিংটনের ইসলামিক সেন্টারের মসজিদের কথা তো আমরা সকলেই জানি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম প্রকাশনা সংস্থা রয়েছে ১৮টি, অডিও ভিডিও প্রকাশনা রয়েছে ১২টি, ছেলেমেয়েদের ধর্ম শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৫০টির বেশি, হাইস্কুল রয়েছে ৯৭টি, কলেজ রয়েছে ২টি, দাওয়া ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৪৯টি, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ২৮টি, বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু ভিত্তিক মুসলিম সংগঠন (যেমন Coalition for free & independent Bosnia & Harzegovina, Democratic League of Kosovo ইত্যাদি) রয়েছে ২৫টি, পত্রিকা ও ম্যাগাজিন রয়েছে ৪১টি, রিলিফ অরগানাইজেশন রয়েছে ৪৫টি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১৫টি। ইসলামিক যুব সংগঠন রয়েছে ২৫টি এবং মহিলা সংগঠন রয়েছে ২১টি। এছাড়া সেখানে আরও নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে মুসলমানদের। এই হিসাব ১৯৯৫ সালের।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের সংখ্যা ৭০ লাখ বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে আফ্রো-আমেরিকান মুসলিম ২৯%, আরব মুসলিম ২১%, হিমালয়ান উপমহাদেশীয় মুসলিম ২৯% ও উপমহাদেশীয় মিশ্র ১০% এবং অন্যান্য ১১% শতাংশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতিতে মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে যাচ্ছে। লসএঞ্জেলেসে আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটির নেতা আব্দুল করিম হাসান আমাদের জানালেন, স্থানীয় নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানরা ব্যালান্স অব পাওয়ার। স্থানীয় নির্বাচনে অনেক জায়গায় মুসলমানরা নির্বাচিত হচ্ছে। কিছুদিন আগে টেক্সাসের একটি শহরে একজন মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হন। নির্বাচিত উক্ত মেয়র বলেন, শহরে তার পরিবারই একমাত্র মুসলিম পরিবার। মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও আস্থাভাজন ভেবেই শহরের অধিকাংশ মানুষ তাকে ভোট দিয়েছে। স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে এ ধরনের ঘটনা এ দেশে

www.pathagar.com

আরও ঘটছে। অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় নির্বাচনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার ব্যাপারে সেখানকার মুসলমানরা আশাবাদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্তসমাজে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন। কথা প্রসঙ্গে ব্ল্যাক মুসলিম নেতা আব্দুল করিম হাসান জানালেন, বিশেষভাবে মুসলিম দেশগুলোতে সন্ত্রাসমূলক কাজকে তারা খুব ভয় করেন। এই ধরনের কাজ মুসলমানদের খুব ক্ষতি করে, ইসলামের প্রচার কাজকে ব্যাহত করে এবং সুনাম ক্ষুণ্ন করে। জনাব আব্দুল করিমের কাছে শুনে আমরা খুব খুশি হয়েছি যে, মুসলিম স্কুলগুলোর চরিত্র গঠনমূলক সুনামের কারণে অনেক খৃষ্টান বাবা-মা তাদের ছেলে-মেয়েকে মুসলিম স্কুলে পাঠায়। এমনকি ইহুদীদের ছেলে-মেয়ে পর্যন্ত মুসলিম স্কুলে আসে।

মুসলিম ও ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাধারণ মার্কিনীদের কোনো বিরূপ ধারণা নেই। তবে সম্প্রতি মুসলমানদের সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করায় তারা মুসলিম ও ইসলামিক সংগঠনের ব্যাপারে সাবধান হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মানবতাবাদী পরিচয়ের কিছু খৃস্টান সংগঠন রয়েছে, যারা সব ধর্মের মধ্যে একটা সম্প্রীতির চেষ্টা করছে। তারা চেষ্টা করছে তিনটি বৃহৎ ধর্মের (খৃস্টান, ইহুদি ও ইসলাম) সাজুয্যগুলোকে বড় করে তুলে ধরতে এবং তা নতুন প্রজন্মকে জানাতে। যাতে করে এসব ধর্ম সম্পর্কে তাদের ভালো ধারণা হয়।

ওয়াশিংটনের মিডল ইস্ট ইনস্টিটিউটে এ ধরনের একটা ফিল্ম আমরা দেখেছি। এ ফিল্ম ছাত্রদের দেখানো হয় এবং এর উপর একটা তাৎক্ষণিক পরীক্ষাও নেয়া হয়। লসএঞ্জেলেসের 'ক্রিস্ট্যাল ক্যাথেড্রালে' গিয়ে এ ধরনের আর একটি সংগঠন দেখেছি। তার নাম 'ক্রিশ্চিয়ান এন্ড মুসলিম ফর পিস'। এ সংস্থার যিনি ডাইরেক্টর তিনি কাশ্মীর ও ফিলিস্তিন- এর উপর দু'টি বই লিখেছেন। কাশ্মীরে গণনির্যাতনের উপর একেবারে আপটুডেট এ্যালবাম তার কাছে দেখলাম। মুসলমানদের ব্যাপারে তাদের আগ্রহ আমাকে বিস্মিত করেছে।

মার্কিন সমাজ খুবই গণতন্ত্রী, কিন্তু জাতীয় ব্যাপারে খুবই রক্ষণশীল। ওকলাহোমা, টুইন-টাওয়ার, প্যারিস, ইত্যাদি ঘটনার প্রতিক্রিয়া থেকে প্রমাণ হয়েছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ও শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও দারুণ উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব আছে। আরও প্রমাণ হয়েছে, মুসলমানদের সম্পর্কে তারা দারুণ ভুল বোঝাবুঝির শিকার এবং এ কারণে তাদের কেউ কেউ মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণু

www.pathagar.com

হয়ে উঠছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের ধারণা ওকলাহমার ঘটনায় একজন খৃস্টান ধরা পড়ায় মুসলমানরা বেঁচে যায়। কিন্তু টুইন টাওয়ার ও প্যারিস ঘটনার পর মুসলমানরা, তাদের প্রতিষ্ঠান ও মসজিদ আক্রান্ত হয়। টুইন টাওয়ারের পর যা ঘটেছিল, তার চেয়ে বেশি ঘটে প্যারিস ঘটনার পর। মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছে সংবাদ মাধ্যমের অপপ্রচার। অনেকের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি, মার্কিন জনসাধারণ সন্ত্রাসবাদকে খুবই ঘৃণা করে বা ভয় করে বিধায় তারা খুব সহজেই এ অপপ্রচারের শিকারে পরিণত হয়। বোধ হয় এই কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যেখানেই মার্কিন মুসলমানদের সাথে কথা বলেছি, তাদের ভেতরে প্রবল সন্ত্রাসবিরোধী মনোভাব দেখেছি। তারা বলেছে, বিশ্বের কোথাও মুসলমানদের হাতে কোনো সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটলে মনে হয় আমরা এখানে দশ বছর পিছিয়ে গেলাম।

ইসলাম গণতন্ত্রের পক্ষে নয়, মুসলমানরা গণতন্ত্রকে ক্ষমতায় যাবার শ্লোগান হিসেবে ব্যবহার করে, এই ধারণা মার্কিন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রবল। যাদের সাথে আমাদের আলোচনা হয়েছে, তাদের আমরা এ ধারণা যে ভুল তা বুঝাতে চেষ্টা করেছি। ইসলামের প্রসার ও প্রচারের স্বার্থে তাদের এ ধারণা দূর করা দরকার।

তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাদের সাথে এবং যে সব খৃস্টান সংগঠনের সাথে কথা বলেছি, তাদেরকে মুসলমানদের ব্যাপারে খুবই উদার দেখেছি। তারা বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত সমাজে মুসলমানদের সামনে এগুবার অনেক সুযোগ রয়েছে। অনেকের মধ্যে আবার ভুল বোঝাবুঝিও কম নেই। যেমন নিউইয়র্কে আমাদের শেষ সাক্ষাৎকারটা ছিল 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব দ্য চার্চের অব ক্রাইস্ট অব দ্য ইউএসএ'-এর কো-ডাইরেক্টর বার্ট এফ, ব্রেইনারের সাথে। তিনি তাঁর অফিসে আমাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু কম্যুনিটি হিসেবে। কিন্তু আলোচনার এক পর্যায়ে বললেন, মুসলমানরা যেভাবে পশ্চিমকে শত্রু ভাবছে এবং যুদ্ধ ঘোষণা করছে, তাতে সৌহার্দ-সম্প্রীতির চেষ্টা সামনে এগুবে কি করে ?

সন্দেহ নেই ভুল বোঝাবুঝির এটা একটা বড় পয়েন্ট। এটা দূর করার চেষ্টা করেছি। আমি ব্রেইনারের জবাবে বলেছিলাম, 'যুদ্ধ' শব্দের এই ব্যবহার বোধ হয় ঠিক নয়। আর 'শত্রু' শব্দের বদলে 'ভয়', 'অবিশ্বাস', 'বিক্ষুব্ধ', ধরনের শব্দ ব্যবহার করাই মনে হয় সংগত হতো।

www.pathagar.com

তারপর তাকে বলেছিলাম, পশ্চিমকে ভয় করার, পশ্চিমকে অবিশ্বাস করার এবং পশ্চিমের উপর বিক্ষুব্ধ হবার মুসলমানদের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলোঃ আজকের পাশ্চাত্য মুসলিম ইস্টকে শাসন ও শোষণ করেছে স্থানভেদে দেড়শ, দু'শ আড়াইশ বছর পর্যন্ত। এই শাসন-শোষণের বেদনা মুসলমানরা ভুলেনি। ভুলতে পারেনি পশ্চিমেরই কিছু দেশের কিছু ভূমিকার কারণে। উপনিবেশ তারা ছেড়ে দিলেও শক্তি, অর্থ ও বিজ্ঞান-টেকনোলজির জোরে তারা আধিপত্যবাদী হস্তক্ষেপ অব্যাহত রাখে মুসলিম দেশগুলোর উপর। আরেকটি কারণ বলেছিলাম, কাশ্মীর, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, বসনিয়া প্রভৃতি ইস্যুতে পশ্চিম কার্যত হয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, নয়তো পশ্চিমের কারণেই সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি অথবা সমাধান বিলম্বিত হয়েছে। স্লোভেনিয়া-সার্বদের মধ্যে যুদ্ধ তিন সপ্তাহ এবং ক্রোশিয়া-সার্ব যুদ্ধ তিন মাসের বেশি চলতে দেয়া হয়নি, অথচ বসনিয়ার যুদ্ধ আজ সাড়ে তিন বছরেও শেষ হচ্ছে না। পূর্ব তিমুর, দক্ষিণ সুদানে খৃস্টানদের বিদ্রোহ। বিচ্ছিন্নতা বা স্বাধীনতার আন্দোলন বেশি দিন চলতে দেয়া হয়নি, তাদের দাবী পূরণ করা হয়েছে। কিন্তু কাশ্মীর ও ফিলিস্তিন সমস্যা চলছে যুগের পর যুগ ধরে। এই জলজ্যান্ত ঘটনাগুলো পশ্চিমের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে। শেষ যে কারণটির কথা আমি মিষ্টার ব্রেইনারকে বলেছিলাম, সেটা মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমী কিছু এনজিও-এর ভূমিকা নিয়ে। দারিদ্র্যের সুযোগ গ্রহণ করে সাহায্যের নামে তারা সাংস্কৃতিক আগ্রাসান চালাচ্ছে। ঔপনিবেশিক শাসনের পুরানো জ্বালা-পীড়িত মানুষ একে নতুন এক ঔপনিবেশিক অভিযান বলে মনে করছে। মূলতঃ এসবই পশ্চিমের প্রতি মুসলমানদের ভয়, অবিশ্বাস এবং বিক্ষুব্ধতার জন্যে দায়ী।

মিষ্টার ব্রেইনার এসব কারণের ব্যাপারে আমার সাথে একমত হয়েছিলেন, তবে বলেছিলেন, এর কোনোটির জন্যই পশ্চিমী জনগণ দায়ী নয়, দায়ী একশ্রেণীর সরকার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখেছি, মুসলমানদের ব্যাপারে খৃস্টান ও ইহুদিদের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই পৃথক। ইহুদিদের আচরণ অনেকটাই মারমুখো। আমরা নিউইয়র্কে 'কাউন্সিল অব জুইস এ্যাসোসিয়েশনস' এর নির্বাহী পরিচালকের সাথে দেখা করেছিলাম। তিন জায়গায় তিনবার বডি সার্চ করার পর আমাদেরকে তার অফিস

www.pathagar.com

কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তিনি কথা শুরুর প্রথমেই অভিযোগ তুলেন। বলেন যে, মুসলমানরা সন্ত্রাসের জন্য আমেরিকায় অস্ত্র এবং অর্থ যোগাড় করছে। তার মতে, সারা বিশ্বে মুসলমানরাই প্রধান টেররিস্টের ভূমিকায় রয়েছে। এ অভিযোগের জবাব দিয়েছি। বলেছি, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, মিন্দানাও ইত্যাদির মত জায়গায় যা ঘটছে তা মূলতঃ স্বাধীনতা যুদ্ধ, সন্ত্রাস নয়। আর এ যুদ্ধের সাথে মুসলমানিত্ব বা ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। নিছকই ভূ-খন্ডগত সংঘাত এগুলো। কিন্তু মনে হয়েছে, তারা পরিকল্পিতভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদনাম ছড়াচ্ছে। কোনো খৃস্টান ব্যক্তি বা সংগঠনের মধ্যে এই মনোভাব আমরা দেখিনি। খৃস্টানরা সব সময় মুসলমানদের সাথে সু-সম্পর্ক ও সহযোগিতার কথা বলেছে, ফান্ডামেন্টালিজম শব্দটা মুসলমানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় তাও তারা বলেছে। উপরন্তু তারা ওকলাহোমা টুইন টাওয়ারের ঘটনায় মুসলমানদের যে কিছু অসুবিধা হয়েছে, সে জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। খৃস্টান অনেক নেতা বলেছেন, ঘটনাগুলো নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতির সময় তারা মুসলিম নেতাদের কাছে গিয়েছেন, তাদের সাহস দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন।

প্রথম আমেরিকা সফরের ৮ বছরের মাথায় আমেরিকায় দ্বিতীয় সফরে যাই ২০০৩ সালের অক্টোবরে। ঢাকা থেকে আমরা ছয়জন সম্পাদক মার্কিন ষ্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ১৫ দিনের সফরে আমেরিকা গিয়েছিলাম। এবারের সফরটা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাঞ্চলে। ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, ডিয়ার বর্ন, ডেট্রয়েট- এর বাইরে আমাদের কোনো প্রোগ্রাম ছিল না। আমাদের এ সফরটার লক্ষ ছিল নাইন-ইলেভেনে টুইন-টাওয়ার ধ্বংস-ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তন সরেজমিনে দেখা। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানরা কেমন আছে তা জানা। এ জন্যেই বেশি পরিমাণে মুসলমানদের বাস যে এলাকায় বেশী এমন শহরে আমাদের প্রোগ্রাম বেশি রাখা হয়। যেমন মিশিগানের ডিয়ারবর্ন-ডেট্রয়েটে ছিল আমাদের ৬ দিনের প্রোগ্রাম। অথচ ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে সময় রাখা হয়েছিল তিনদিন করে। ডিয়ারবর্নে মুসলমান বিশেষ করে আরব মুসলমানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার সাথে আরব মুসলমানদের সংশ্লিষ্টতা বেশি দেখানো হয়েছিল। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তারাই সবচেয়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্মুখিন হওয়ার কথা। তারা

www.pathagar.com

এখন কেমন আছে, সেটা আমাদের জানার বিষয় ছিল। আমরা হতাশ হইনি। আমরা দেখেছি, তারা যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়েছিল, তা তাদেরকে আরও সংহত, সচেতন করেছে এবং মুসলমানদের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্যে তারা আরও সক্রিয় হয়েছে। অন্যদিকে আমেরিকানদের মধ্যে বিদ্বেষপরায়ণ সক্রিয় অনেক লোক থাকলেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও শুভেচ্ছাকামী লোকের সংখ্যাই সেখানে বেশি। প্রয়োজনের সময়ে তাদের মধ্যে অনেকেই সক্রিয় হয়ে উঠে এবং বিভিন্নভাবে মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়ায়।

আমার প্রথম আমেরিকান সফরে মার্কিন সমাজজীবনের যতটা গভীরে প্রবেশ করার সুযোগ হয়েছিল, দ্বিতীয় সফরে তা না হলেও এটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়ের একটা সফর। এমন সময়েই কোনো দেশের মঙ্গল ও অমঙ্গলের শক্তিকে খুব ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় সফরে মার্কিন সমাজ জীবনের এই দুই শক্তিকেই আমরা দেখতে পেয়েছি। সেখানকার অমঙ্গলের কিছু ঘটনা খুব বড় বলে মনে হয়নি আমার কাছে। কারণ মার্কিন সমাজ ও সরকার গণতন্ত্র চর্চার ব্যাপারে যেহেতু আপোসহীন, তাতে সমাজ বিচ্ছিন্ন অমঙ্গলের শক্তি পরাজিত হতে বাধ্য। আমরা দেখেছি মার্কিনীরা তাদের রাষ্ট্রের ফাউন্ডার ফাদারদের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার রক্ষার নীতিকে সবার উর্ধে স্থান দেয়। মার্কিন জনগণের এই রূপকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ করে দেয়ার জন্যে আমি ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্র প্রতিনিধিদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আবুল আসাদ

www.pathagar.com

১

১৯৯৫ সাল। মে মাসের ১২ তারিখ বিকেলে ওয়াশিংটনের পথে লন্ডন যাত্রা করলাম। এটা আমার আমেরিকায় প্রথম সফর। সফরটির আয়োজন করেছিল ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস প্রোগ্রামের অধীনে। সফরের সুযোগটা আমি আনন্দের সাথে গ্রহণ করেছিলাম। অন্যান্য সফরের চেয়ে এই সফরে একটা ভিন্ন আনন্দ ও আবেগ অনুভব করছিলাম। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আজকের একমাত্রিক দুনিয়ার সর্দার হিসাবে কাজ করছে। এইসাথে মনে একটা প্রশ্নও বার বার জাগছিল। সেটা হলো, যে দেশের স্বাধীন ইতিহাসের বয়স সাড়ে তিনশ' বছরও নয়, সে দেশ আজ শক্তি ও মর্যাদার শীর্ষে উঠল কি করে। জবাবও সাথে সাথে পেলাম। গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যই তাদেরকে এ সম্মানে ভূষিত করেছে। গণতন্ত্র যেমন তাদের জাতীয় ঐক্যকে সংহত করেছে, তেমনি তাদের জাতীয় ঐক্যই আবার তাদের গণতন্ত্রকে ফলপ্রসূ করেছে। আর একটা বড় সুবিধা তারা পেয়েছে, কোনো বড় শক্তিশালী দেশ তাদের প্রতিবেশী হিসাবে নেই।

লন্ডনের আগে দুবাইতে আমাদের যাত্রা বিরতি হলো। রাতেও সেখানে থাকতে হলো আমাদের। সামান্য একটা অসুবিধায় আমরা পড়েছিলাম। আমাদের ক্যারিয়ার আমিরাত এয়ারলাইন্স। আমিরাত এয়ারলাইন্সের ডেস্কের কর্মকর্তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো একোমোডেশন ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই করতে হবে। কিন্তু পরে এ নিয়ে কথা বলাতে স্বাভাবিক যা তাই-ই হলো। দুবাইয়ের রিভেরা হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। আমার সফর সঙ্গী ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান। আমরা পাশাপাশি দু'টি রুম পেলাম।

ওয়াশিংটন যাবার পথে হিথ্রো বিমান বন্দর ইমিগ্রেশনে সামান্য একটা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম। শীঘ্রই সমাধান হয়ে যায়। একজন ব্রিটিশ সিকিওরিটি অফিসার আমার কাছে আসেন। আমি আবুল আসাদ কিনা জিজ্ঞাস করেন। তিনি আমাদের সহযোগিতা করলেন। হিথ্রো মনে হলো নিজেই একটা নগরী। হিথ্রো সম্পর্কে যা শুনেছিলাম হিথ্রোকে আমার তাই মনে হলো।

www.pathagar.com

আমরা দুবাই ছেড়েছিলাম ১৩ তারিখ ৭-৩০ মিনিটে। লন্ডনের হিথ্রো পৌছলাম ১১-৫২ মিনিটে। নিউইয়র্ক যাত্রা করলাম দুপুর দেড়টায়। বিশাল বিমান বন্দর হিথ্রোতে প্লেন পরিবর্তন বেশ ঝামেলার। হিথ্রো পর্যন্ত এসেছিলাম আমিরাত এয়ারলাইন্সে। এবার আটল্যান্টিক পাড়ি দিবার জন্য উঠলাম ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সের বিমানে। নতুনদের জন্য আটল্যান্টিক পাড়ি দেয়া রোমাঞ্চকর। সাত ঘন্টার দীর্ঘ পথ। কিন্তু আমার জন্য বিষয়টা হয়ে দাঁড়াল অনেকটাই হতাশাব্যঞ্জক। আটল্যান্টিকের অথই জলরাশি আমার নজরে এলনা। মেঘ-কুয়াশার চাদরে তা ঢাকা ছিল। স্থানীয় সময় বিকেল চারটায় নিউইয়র্কের জন এফ কেনেডি বিমান বন্দরে নামলাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের এটা এন্ট্রি পয়েন্ট। ইমিগ্রেশনে অনেক সময় লাগলো। ঢাকার মার্কিন দূতাবাস থেকে আমাদেরকে একটা সিল্ড এনভেলাপ দেয়া হয়েছিল। সেটা ইমিগ্রেশনে দিলাম। ভ্রমণ ও দাওয়াত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র দিতে হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই এন্ট্রি পয়েন্টে ইমিগ্রেশন অফিসারদের ব্যবহার ও সহযোগিতা খুব ভালো লাগলো। খুঁত ধরার চাইতে সহযোগিতার মনোভাবই তাদের বেশি ছিল। সকল ফরমালিটি শেষ করে লাগেজ নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। এরপরের করণীয়টা ছিল আমাদের জন্য নতুন, তাই কিছুটা বিব্রত ছিলাম আমরা। জন এফ কেনেডি বিমান বন্দর থেকে আমাদেরকে ইন্টারন্যাল ফ্লাইটে যেতে হবে ওয়াশিংটনে। ইন্টারন্যাল ফ্লাইটের টার্মিনালে যাওয়া, ফরমালিটি সম্পন্ন করা নতুনদের জন্যে কিছুটা ঝামেলার। কিন্তু সাহায্য আমরা পেয়ে গেলাম। জন এফ কেনেডি টার্মিনাল থেকে বের হবার পরপরই একজন সিকিউরিটি অফিসার আমাদের কাছে এলেন। ওয়াশিংটনে যাবার জন্য টি ডাবলু এর টার্মিনালে গিয়ে বডিং কার্ড নেয়ার ব্যাপারটা আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। ঠিক এই সময় ড. মোস্তাফিজ সাহেবের ভাতিজা আলমগীর সাহেব এলেন। আলহামদুলিল্লাহ, মানসিকভাবে আমরা যে প্রেসারে ছিলাম সেটা দূর হয়ে গেল। আমরা টি ডাবলু এর টার্মিনালে গিয়ে বডিং কার্ড নিয়ে নিলাম। ওয়াশিংটন ফ্লাইটটা আরো দু'ঘন্টা পর। অনেক সময় হাতে। আলমগীর সাহেব তার বাসায় নিয়ে গেলেন আমাদের। সময়টা আমাদের খুব কাজে লাগলো। ফ্রেশ হলাম। আসরের নামায আদায় করলাম এবং ঢাকায় বাড়িতে কথা বললাম।

টি ডাবলু একটি প্রাইভেট এয়ারলাইন্স। যে বিমানে চড়লাম তা এতটাই ছোট যে আমি এর আগে এত ছোট বিমান দেখিনি। ছোট হলেও খুব আরামদায়ক এবং

www.pathagar.com

যাত্রীদের কোনো সুযোগ সুবিধারই অভাব নেই। ফ্লাইটের সব যাত্রীই ছিল আমেরিকান, আমি ও ড. মুস্তাফিজ দু'জন মাত্র বিদেশী। বিমানটি তুলনামূলকভাবে অনেক নিচু দিয়ে ফ্লাই করছিল। কিন্তু নিচের কিছুই দেখা গেল না রাত বলে। নিচে মাঝে মাঝে আলোর গুচ্ছ দেখে বুঝলাম ঐগুলো জনপদ। আরো বুঝলাম জনবসতি খুবই কম। সম্ভবত সন্ধ্যা সাতটা চল্লিশ মিনিটে বিমানে চড়েছিলাম। ওয়াশিংটনে পৌঁছলাম রাত নয়টার দিকে। খুশি হলাম যে বিমান বন্দরে লাগেজ চেক বা ইমিগ্রেশনের কোনো ঝামেলা পোহাতে হলো না। ডোমেস্টিক এয়ারপোর্টে এ ধরনের চেক হয় না। ওয়াশিংটন এয়ারপোর্ট থেকে যখন লাগেজ বুঝে নিলাম তখনকার অনুভূতি ছিল পথ না জানা, করণীয় না জানা এক পথিকের মতো। এটুকুই শুধু আমাদের জানা যে কেউ একজন আমাদের রিসিভ করবেন। লাগেজ কাউন্টার থেকে বের হতে হলো না। মধ্য বয়সী এক হাসিখুশি আমেরিকান আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন এবং স্বাগত জানিয়ে বললেন তিনি ইরউইন কার্ন। পরিচয় দিলাম আমাদের। ইরউইন কার্ন এর নাম শুনেই বুঝেছিলাম তিনি আমাদের এ স্কর্ট অফিসার। গোটা সফরে আমাদের সঙ্গে থাকবেন। ভদ্রলোক স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন রিটায়ার্ড অফিসার। তার সাথে কথা বলে খুবই খুশি হলাম। খুব খোলামেলা এবং আন্তরিক। গোটা সফরকালে তার সাথে অনেক কথা বলেছি। আমেরিকানদের জীবন সম্পর্কে তিনি অনেক কথা আমাদের বলেছেন। তিনি নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের রাজধানী সান্তা ফে'র মানুষ। সফরের শুরুর দিকে একদিন একটি ইনভেলাপে তার ছেলের নাম দেখে বুঝেছিলাম যে তিনি ইহুদী হতে পারেন। আমি এ কথা ড. মোস্তাফিজকে বলে এ বিষয়টা তাকে বলতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু ড. মোস্তাফিজ কথায় কথায় একদিন তাকে এ কথা বলেছিলেন। শুনার পর ইস্কট ইরউইন কার্ন কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে বলেছিলেন আপনাদের এই অনুমান ঠিক। তবে আমি সিনাগগে যাই না গির্জাতেও যাই না। আমি প্রকৃতপক্ষে কোনো ধর্ম মেনে চলি না। তার কথা ঠিক। গোটা সফরে আমরা তাকে এভাবেই দেখেছি। মিস্টার ইরউইন কার্ন এতটাই আন্তরিক এবং অতিথিপরায়ণ ছিলেন যে, তার সহযোগিতা এবং সাহচর্য আমাদের সফরকে সুন্দর করে তুলেছিল। তার বিবেচনাবোধ আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। আমাদের সফর কালে আমরা বহু মুসলিম, খৃস্টান এবং ইহুদী সংস্থা, সংগঠনের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেছি। খৃস্টান এবং ইহুদী সব প্রতিষ্ঠানের বৈঠকে তিনি আমাদের সাথে ছিলেন। কিন্তু মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সাথে

www.pathagar.com

বৈঠকে তিনি সাথে থাকতেন না। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাস করলে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, এ সব বৈঠকে আনুষ্ঠানিক আলোচনা ছাড়াও আপনাদের কিছু অনানুষ্ঠানিক আলোচনাও স্বাভাবিক। যাতে আপনারা ফ্রি হতে পারেন এ জন্যই আমি বৈঠকে থাকি না। আমি বলেছিলাম আপনার জানা উচিত নয় এমন অনানুষ্ঠানিক আলোচনা আমাদের কোথাও হয় না। সফরকালে তার প্রশংসা যেমন পেয়েছি তেমনি মূল্যবান পরামর্শও তিনি দিয়েছেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, 'আপনাকে একটা তথ্যের ভান্ডার বলে আমার মনে হয়। সব বিষয়ে আপনি মূল্যবান সব তথ্য নিয়ে এসে কথা বলেন। নিশ্চয় সাংবাদিক হওয়ার কারণে এটা সম্ভব হয়েছে।' তেমনি আর একদিন তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়ে বললেন, 'আলোচনায় কোনো সময়ই আপনার অফেনসিভ অ্যাপ্রোচ থাকা উচিত নয়, এমনকি সাজেস্টিভও নয়।' আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম আমি এ বিষয়ে সতর্ক, আপনার পরামর্শ আমাকে আরো সতর্ক হতে সাহায্য করবে। আমেরিকায় মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে আমার আগ্রহের বিষয় তিনি জানতেন। তিনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, আপনার আমাদের নিউ মেক্সিকোতে যাওয়া উচিত। আমাদের রাজধানী সান্তা ফে'র যে রোডে আমার বাড়ি সে রোডের নাম জিয়া রোড। এই রোডটা খুব পুরানো, নামটাও পুরানো। এই 'জিয়া' শব্দটি ইংরেজি কিংবা ইউরোপীয় ভাষার নয়। এটা আরবী ভাষা হতে পারে। এটা আরবী অরিজিন থেকে আসতে পারে। তিনি জানিয়েছিলেন, তাদের নিউ মেক্সিকোতে একটা সম্প্রদায় আছে যাদের কালচার আমেরিকানদের সাধারণ কালচারের সঙ্গে মিলে না। তাদের ভাষার অনেক শব্দ আরবী ভাষার অপভ্রংশ বলে মনে করা হয়। আপনি নিউ মেক্সিকো গেলে এদের অতীত অনুসন্ধানের একটা সুযোগ পেতেন। এই সুযোগ আমার হয়নি। আমরা সফরে নিউ মেক্সিকোর পাশে কলোরাডো গিয়েছিলাম। নিউ মেক্সিকো আমাদের সফর তালিকায় ছিল না। আজ অনেক দিন গত হলেও আমেরিকার কথা মনে হলে ইস্কর্ট ইরউইন কার্ন এর এসব কথা মনে পড়ে।

বিমানবন্দর থেকে আমরা ইরউইন কার্ন এর সাথে ওয়াশিংটনে আমাদের আবাসস্থল অ্যামব্যাসী স্কোয়ার হোটেলে পৌঁছলাম। হোটেলটি ওয়াশিংটনের সুন্দর ডুপন্ট এলাকায়। আমাদের রুম রিজার্ভ ছিল। আমরা আমাদের নির্ধারিত রুমে উঠে গেলাম। ইরউইন কার্নের এই হোটেলে একোমোডেশনের ব্যবস্থা রয়েছে। হোটেলের রুমগুলো সুন্দর। এখানে খাবার ঠান্ডা রাখা ও গরম করারও

www.pathagar.com

ব্যবস্থা রয়েছে। রুমের সাথে যুক্ত এই ব্যবস্থাকে বলা যায় ছোটখাট একটা কিচেন। চাইলে ছোটখাট রান্নাও করা যায়। রুমে উঠার পর ইরউইন কার্ন এলেন। একটা ফাইল দিলেন। ফাইলে ভ্রমণ সংক্রান্ত কিছু তথ্য পত্রের সাথে তিনটি চিঠি ছিল। চিঠিগুলো ইউ এস আই এর প্রোগ্রাম অফিসার মিস এলিস শিফেট, আই আই ই প্রোগ্রাম অফিসার মিস্টার আলেকজান্ডার পাটিকো, সিনিয়র প্রোগ্রাম এসোসিয়েট মিস্টার ডগলাস ব্রুকস এবং ইউ এস স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশ ডেস্ক অফিসার জুন কর্করান এর। তাতে তারা আমাদের সফরকে স্বাগত জানিয়েছেন। আমাদের প্রোগ্রাম নিয়ে কিছু আলোচনার পর ইরউইন কার্ন বিদায় নিলেন। পরদিন ১৪ মে আমাদের কোনো কাজ ছিল না। তার পরের দিন সফর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সফর সূচীর বিষয় আলোচনার পর আমাদের সফর কার্যক্রম ফরম্যালি শুরু হয়। সকালে উঠেই প্রশ্ন দেখা দিল নাস্তার। সঙ্গে সঙ্গে সামনে এলো হালাল, হারাম সমস্যা। সমাধান করলেন ইরউইন কার্ন। তিনি ইহুদী ধর্ম না মানলেও হালাল হারাম সম্পর্কে ইহুদী ধর্মের বিধি ব্যবস্থা ভালো জানেন। আর ইহুদীদের হালাল হারামের সাথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে। নাস্তার জন্য তিনি আমাদেরকে একটি ভালো রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। একটা তৃপ্তিদায়ক নাস্তা আমাদের হলো। মেন্যু নতুন কিছু নয়। তেলে ভাজা ডিম ও আলুর ফ্রাই, ব্রেড ধরনের কিছু এবং জুস। আমাদের গোটা সফরকালেই যখনই আমাদেরকে রেস্টুরেন্টে নাস্তা করতে হয়েছে তখনই নাস্তার এ ধরনের মেন্যুই আমরা পছন্দ করেছি।

দিনের পরবর্তি অংশ আমাদের ভালোই কাটলো। ড. মুস্তাফিজ সাহেবের এক ছাত্র মেরিল্যান্ডে থাকে। জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে। তার নামের ইকবাল অংশটাই শুধু আমার মনে আছে। এদিন আমাদের প্রোগ্রাম নেই খবর পেয়ে তিনি এলেন তার বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যেই তার গাড়িতে চড়ে আমরা মেরিল্যান্ড গেলাম। যাওয়ার পথে আমেরিকার গ্রাম এলাকা প্রথম দেখলাম। বাংলাদেশ সবুজ দেশ বলে আমার গর্ব ছিল। কিন্তু আমেরিকার গ্রামাঞ্চলে সবুজের সম্ভার দেখে এ গর্ব যেন রাখতে পারলাম না। বন-জঙ্গল, গাছ-পালার এত সমারোহ যে, দু'পাশে নগ্ন কোনো জনবসতি, বাড়ি চোখেই পড়েনি। চলার পথে নতুন আরো একটি বিষয় চোখে পড়ল। মাঝে মাঝে দেখা গেল রাস্তার পাশ বরাবর উঁচু দেয়াল। পরে

www.pathagar.com

জেনেছিলাম যেখানে পাশে লোকালয় আছে সেখানেই এই দেয়াল তোলা হয়েছে। রাস্তায় যান চলাচলের অব্যাহত শব্দ থেকে মানুষকে নিরাপদ রাখার জন্য।

কয়েক দিন পর ইকবাল সাহেবের বাড়িতে পরিচিত পরিবেশে দেশীয় স্বাদের খানা খাবার সুযোগ হলো। আর ইকবাল সাহেবের বাড়িটাই হলো আমেরিকার গ্রামীন পরিবেশে প্রথম দেখা বাড়ি। ছোটখাট হলেও কিন্তু ছবির মতো সুন্দর বাড়ির একটি সুন্দর ফ্লাট। মেরিল্যান্ডের এই এলাকায় আমি ২০০৩ সালে আরো একবার এসেছিলাম। আমার বড় মেয়ে নুসরাত নুরুন্নাহার সাবিনা তার স্বামী ড. হাসমত আলীর সাথে এই এলাকাতেই থাকতো। হাসমত জাপান থেকে পিএইচডি করার পরে হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরাল স্কলারশীপ নিয়ে এসেছিল। নাম ভুলে যাওয়ায় ইকবাল সাহেবদের সেই বাড়িটি তখন আর খুঁজে পাইনি।

www.pathagar.com

২

পরদিন, ১৫ মে, সকাল সাড়ে নয়টায় এলাম ফোরটিন স্ট্রিটে আমাদের হোস্টদের সাথে আলোচনার জন্যে। সকাল নয়টার মধ্যে আমরা নাস্তা সারলাম হোটেলের রেস্টুরেন্টে। ইরউইন কার্ন আমাদের সাথে ছিলেন। নাস্তার পর আমরা কাগজ-পত্র গুছিয়ে নিলাম। আমাদের বলা হয়েছিল আমরা যেন টিকিট এবং পাসপোর্ট সাথে নিয়ে যাই।

সাড়ে নয়টার দিকে আমাদের বৈঠক শুরু হলো। বৈঠকের হোস্ট ছিলেন ইউ এস ইনফরমেশনস্ এজেন্সির (USIA) প্রোগ্রাম অফিসার মিস এলিস শিফেট, ইনিস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশনস (IIE) এর প্রোগ্রাম অফিসার মিস্টার আলেকজান্ডার পেটিকো এবং উপরোক্ত সংস্থার সিনিয়র প্রোগ্রাম এসোসিয়েট মিস্টার ডগলাস ব্রুকস। আলোচনা ছিল আমাদের সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে। এর সাথে আমাদের পরিচয়পত্র নিয়েও কথা হলো। আমাদের যে পরিচয়পত্র তারা সব জায়গায় দিবেন সে পরিচয়পত্র আমাদের দেখিয়ে বললেন, এ বিষয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য আছে কি না। আমার পরিচয়পত্র ঠিকই ছিল তবে দু'টি বিষয় আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমার পরিচয়পত্রে আমাকে দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে পত্রিকাটি রক্ষণশীল জামায়াতে ইসলামীর একটি অর্গান। আমি আপত্তি করে বললাম, কোনো কোম্পানি পরিচালিত একটি পত্রিকাকে একটি দলের অর্গান বলা বোধ হয় ঠিক নয়। কথা বললেন মিস এলিস শিফেট। তিনি হেসে বললেন,আইনী বিষয় নয়, সাধারণভাবে মানুষ যা মনে করে আমরা সেটাই লিখেছি। আমরা চাই যাদের সঙ্গে আপনাদের সাক্ষাত হবে, কথা-বার্তা হবে, তাদের কাছে আপনার সম্পর্কে যেন সব ধারণাই থাকে। যুক্তিটা আমি মেনে নিলাম। আমার পরিচয়পত্রে আমার স্পোকেন ইংলিশকে এক্সিলেন্ট (Excellent) বলা হয়েছে। আমি Excellent শব্দের ব্যাপারে আপত্তি তুলে বললাম, এখানে বরং Good শব্দ উপযুক্ত হতে পারে। মিস এলিস বললেন, মিস্টার আসাদ অতীতে যাদের নিয়ে প্রোগ্রাম করেছি

www.pathagar.com

সে বিচারে আপনার ইংরেজি অবশ্যই Excellent। এ নিয়ে আর কথা হলো না। আলোচনা শুরু হলো আমাদের সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাসব্যাপী আমাদের সফরের উদ্দেশ্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় বৈচিত্র্য বিষয়ে জানা ও মতবিনিময়। এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার বিষয় প্রথমত: মার্কিন সমাজে ধর্ম ও ইসলামের ভূমিকা, দ্বিতীয়ত: অনুসন্ধান করা যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মীয় মূল্যবোধ কিভাবে সংরক্ষিত এবং সম্মানীত হচ্ছে। এবং এটা দেখা যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বিশেষ করে মুসলমানরা মার্কিন সমাজ ও সংস্কৃতির সাথে নিজেদের কতটা সমন্বিত করতে পারছে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বিভিন্ন খৃস্টান, মুসলিম এবং ইহুদী সংস্থা সংগঠনের সাথে আমাদের মতবিনিময়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আমাদের সফর তালিকার মধ্যে রয়েছে ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়ার টিপল আইটি, কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের ডেনভার, ক্যালিফোর্নিয়ার লসএঞ্জেলস, টিনেসির ন্যাসভিল, ইলিনয় স্টেটের শিকাগো, ইন্ডিয়ানা স্টেটের ব্লুমিংটন ও প্লেনফিল্ড এবং নিউইয়র্ক।

সফর সম্পর্কিত বৈঠক শেষে আমরা ১২টার আগেই বেরিয়ে এলাম। আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশ ডেস্কের সাথে। সেটা বেলা তিনটায়। মাঝখানে তিন ঘণ্টা আমাদের কোনো কাজ নেই। আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ালাম ওয়াশিংটনের দর্শনীয় স্থানগুলোতে। ওয়াশিংটনে হাঁটায় মজা আছে। প্রশস্ত ফুটপাত, মানুষের ভিড় নেই, গাড়ি চাপা পড়ার ভয়ও নেই। অফিস এবং কমার্শিয়াল এলাকা ছাড়া হাইরাইজ কোনো বিল্ডিং এর দেয়াল চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় না। বেশির ভাগ বিল্ডিংই চার তলার বেশি নয়। ওয়াশিংটন শান্ত শহর। রাজধানীর গাম্ভীর্য সর্বত্র। ওয়াশিংটন ডিসির পত্তন হয় ১৭৯১ সালে দেশের রাজধানী হিসাবে। ১৮১২ সালে যুদ্ধের পর দ্রুত বিস্তার ঘটে রাজধানী শহর ওয়াশিংটন ডিসির। ওয়াশিংটনের ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান অনেক। আড়াই ঘণ্টা ধরে আমরা ঘুরলাম। দেখলাম হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল, ভিয়েতনাম মেমোরিয়াল, লিঙ্কন মেমোরিয়াল, ন্যাশনাল সেমিট্রি (জাতীয় সমাধিক্ষেত্র) এবং পটোম্যাক নদীর ব্রিজ ও এর সন্নিহিত এলাকা। এখান থেকে মার্কিন প্রতিরক্ষা হেড কোয়ার্টার পেন্টাগন দেখা যায়। বিভিন্ন মেমোরিয়াল ও ওয়েলিংটন ন্যাশনাল সেমিট্রি দেখার সময় সবচেয়ে বড় যে বিস্ময় আমাকে অভিভূত করেছিল সেটা হলো দর্শকের সমাগম। ওয়াশিংটন মনুমেন্ট, আব্রাহাম লিংকন মোমোরিয়াল, হোয়াইট হাউস এবং ওয়েলিংটন ন্যাশনাল

www.pathagar.com

সেমিট্রি- যেখানেই গেছি দেখেছি উৎসবের আমেজ। অবিরাম মানুষের স্রোত আসছে এবং যাচ্ছে। এই জনস্রোতে রয়েছে শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলেই। তাদের সকলের চোখে-মুখে আনন্দ এবং আবেগের প্রকাশ সুস্পষ্ট। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম এই জনস্রোত প্রতিদিনের। ছুটির দিনগুলোতে আরও বেশি হয়। আমার মনে হলো মার্কিনীদের দেশপ্রেমের সবচেয়ে বড় প্রকাশ বোধহয় এ সব জায়গাতে ঘটে। নিজের ইতিহাসকে ভাল না বাসলে, ইতিহাসের মানুষদের আত্মার আত্মীয় না ভাবলে ইতিহাসের জায়গাগুলোতে মানুষের এইভাবে ছুটে আসা সম্ভব নয়। শিশুরা তাদের দেশপ্রেমের সবক এখান থেকেই পায়। খুবই দুঃখ হলো আমাদের দেশে ইতিহাসই সবচেয়ে অবহেলিত বিষয়। আর সর্বসম্মত জাতীয় নেতা বলতে কাউকে আমরা রাখিনি। বিভিন্ন জনকে বিভিন্নভাবে অপবাদ দিয়ে কুলষিত করেছি। আমাদের উত্তরসূরীদের সামনে তুলে ধরার মতো কাউকে আমরা থাকতে দেইনি। পাশের দেশ ভারতের জাতীয় দিবসগুলোতে বিভিন্ন মিডিয়া এবং সরকারিভাবেও জাতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সামনে আনা হয় এবং সে ইতিহাসের ব্যক্তিবর্গকে দলমত নির্বিশেষে যথাযথ মর্যাদার চোখে দেখা হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা এটা পারি না। জাতীয় ইতিহাসের প্রতি এ অবিচার এবং জাতীয় ইতিহাসের সম্মানীত ব্যক্তিবর্গের প্রতি অসম্মান, অমর্যাদা এভাবে চলতে পারে না, চলা উচিত নয়। কী উচিত সেটা আমাদের উত্তর-জেনারেশনের হাতে ছেড়ে দেয়া ছাড়া কোনো উপায় বোধ হয় আমাদের নেই।

ভিয়েতনাম মেমোরিয়াল ও ওয়েলিংটন মেমোরিয়াল সেমিট্রি দেখতে গিয়ে একটা জিনিস আমাকে আকর্ষণ করেছিল। সেটা হলো আত্মদানকারী প্রতিটি সৈনিককে তার ইতিহাস সমেত স্মরণীয় করে রাখার প্রচেষ্টা। প্রতিটি সৈনিকের নাম ফলক পরিচয়সহ কবরকে সুচিহ্নিত করা হয়েছে। এবং কবরগুলো সৈনিকের কলামের মতোই সারিবদ্ধ। আবার কবরগুলোকে যুদ্ধের সময় ও স্থান-ভিত্তিক পৃথকভাবে গুচ্ছাকারে সুবিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভিয়েতনামযুদ্ধ ইত্যাদি যুদ্ধে আত্মদানকারী সৈনিকদের কবরকে আলাদা আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সমাধিক্ষেত্রের একপাশে দাঁড়িয়ে নজর বুলালে মনে হয় সামনে যেন দৃষ্টিনন্দন এক ফুলের বাগান। জাতির জন্য, দেশের জন্য আত্মদানকারী সৈনিকরা সেখানে একেকটি নন্দিত ফুল। শিশু, তরুণ, যুবা, বৃদ্ধ যারা অবিরাম এখানে আসছে, তারা শুধু এই ফুলগুলোকেই দেখছে না, ফুলের গন্ধও নিচ্ছে। তারা আত্মদানকারী সৈনিকদের ত্যাগের মহৎ শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। দেশ ও

www.pathagar.com

জাতির ত্যাগী সৈনিকদের যে সম্মান দিচ্ছে সে সম্মান উত্তরসূরীদের উদ্বুদ্ধ করারই কথা। খুবই ভালো লাগলো যে মার্কিনীরা তাদের অতীত দিয়ে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশ ডেস্কের সাথে আমাদের বৈঠক বিকাল তিনটায়। টুয়েন্টি ফাস্ট এবং টুয়েন্টি থার্ড স্ট্রিটের মাঝখানে সি স্ট্রিটে স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিস। পায়ে হেঁটে দর্শনীয় স্থানগুলোতে অনেক ঘুরাঘুরি আমরা করেছি। এরপরও ঠিক সময় স্টেট ডিপার্টমেন্টে পৌঁছাতে আমাদের কোনো সমস্যা হলো না। স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রবেশের ফরম্যালিটি জটিল ও সময় সাপেক্ষ মনে হলো না। আমাদের মতো দেশের তুলনায় অনেক সহজ ও সম্মানজনক। আমেরিকানদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ অফিসগুলোতেও জাঁকজমক রাখঢাক অনেক কম। হোয়াইট হাউস, স্টেট ডিপার্টমেন্ট এবং এ ধরনের অন্যান্য অফিস দেখে আমার মনে হয়েছে ওগুলো যেমন জনগণের জন্য, তেমনি জনগণের কাতারে দাঁড়িয়ে আছে।

আমরা স্টেট ডিপার্টমেন্টে ঢোকার পর বাংলাদেশ ডেস্কের অফিসার মিস জুন এসে আমাদের স্বাগত জানালেন এবং আমাদেরকে তার অফিসে নিয়ে গেলেন। তিনি স্বাগত জানানোর সময় হ্যান্ডসেকের জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই হাত সরিয়ে নিয়ে হেসে বললেন, 'সরি, ভুলে গিয়েছিলাম আপনাদের কালচার এটা এলাও করে না।' তাকে ধন্যবাদ দিলাম। তার অফিসে গিয়ে বসলাম। তার অফিস অপ্রয়োজনীয় রকম বড় নয়। দেয়ালে কয়েকটা বাংলাদেশের মানচিত্র দেখলাম। আলমারিতে বাংলাদেশ সংক্রান্ত কিছু বই। অনেক বিষয় নিয়ে তার সাথে মতবিনিময় হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম, মুসলিম বিশ্বে মৌলবাদ, চরমপন্থা আলোচনার বড় বিষয় ছিল। দুনিয়ার জলবায়ু, পরিবেশ বিষয় নিয়ে আলোচনার সময় আমরা আমাদের গঙ্গার পানি বণ্টন নিয়ে কথা তুললাম। গঙ্গার ওপর ভারতের বাঁধ বাংলাদেশের পরিবেশ ও জনজীবনের যে ভয়ানক ক্ষতি করছে সেটা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। তিনি বাংলাদেশের শিশু শ্রম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। আমি বললাম, বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার যে বাস্তবতা তার কারণে হঠাৎ করে শিশু শ্রমের শতভাগ দূর করা সম্ভব নয়। তবে 'সব শিশুর জন্য শিক্ষা' এবং মেয়েদের দ্রুত শিক্ষা বিস্তারে যে কর্মসূচি বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে তা ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে। তিনি বাংলাদেশের এই দু'টি কর্মসূচির প্রশংসা করলেন। কথা প্রসঙ্গে জামায়াতে

www.pathagar.com

ইসলামীর কথা উঠল। তিনি বললেন, জামায়াতে ইসলামীকে তারা দুনিয়ার অন্যান্য ইসলামী আন্দোলন থেকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখে। জামায়াতে ইসলামী সব সময় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে রয়েছে। আবেগের চেয়ে তারা নীতি ও বাস্তবতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। উদাহরণ হিসাবে তিনি সাদ্দামের কুয়েত দখলের কথা তুলে বললেন যে, অন্যান্য অনেক ইসলামী আন্দোলন সাদ্দামকে সমর্থন করলেও জামায়াতে ইসলামী সাদ্দামের আগ্রাসনকে সমর্থন করেনি।

চারটার দিকে আমরা স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। সোজা এলাম হোটেলে। আজ আর কোনো প্রোগ্রাম নেই ভেবে রিলাক্স ফিল করলাম। বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছি। নিউইয়র্ক থেকে মাহতাব সাহেব টেলিফোন করলেন। গতকালও তিনি টেলিফোন করেছিলেন। তিনি জানালেন আবুল কাশেম ভাই আজ শিকাগো থেকে ওয়াশিংটন ফিরছেন। আবুল কাশেম ভাই ওয়াশিংটনে থাকেন। চাপাইনবাবগঞ্জের লোক। শিক্ষকতা করেন ওয়াশিংটনেরই একটা কলেজে। মাহতাব সাহেবের সাথে কথা বলে টেলিফোন রাখতেই আবুল কাশেম ভাইয়ের টেলিফোন পেলাম। তিনি ওয়াশিংটনে আমাদের স্বাগত জানালেন। তিনি অন্যান্য বিষয়ের সাথে আমাদের বিশেষ করে খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ নিলেন। আমি আমাদের খাওয়ার দুর্গতির কথা জানালাম। হালাল হারাম বিষয়টা দেখতে গিয়ে আশেপাশের কোনো হোটেল রেস্টুরেন্টে খাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বললেন, কি করা যায় আমরা দেখছি।

খাওয়া-দাওয়ার বিষয়টি গোটা সফরকালে সব সময় একটা সমস্যা হিসাবেই থাকার কথা। কিন্তু সমস্যা হয়নি। সফরকালে যেখানেই আমরা গেছি সেখানকার স্বদেশী ভাইরা আগেই জানতে পেরেছে এবং তারা আমাদের সবসময় খোঁজ-খবর নিয়েছে। প্রচুর দাওয়াত খেতে হয়েছে। অনেকে হোটেলেও আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছে।

আজ ১৬ জুন। সকাল সাড়ে এগারটায় ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট এর অফিসে যাওয়া এবং তাদের সাথে আমাদের মত বিনিময়ের প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু সকালে ইরউইন কার্ন জানালেন ট্রিপল আই টি তাদের প্রোগ্রাম শিফট করেছে। তাদের সাথে আমাদের প্রোগ্রাম হবে ১৮ তারিখ বৃহস্পতিবার। তাড়া নেই বলে আমরা ধীরে সুস্থে নাস্তা করলাম। আজকের দ্বিতীয় প্রোগ্রাম ভয়েস অব আমেরিকার সাথে বেলা ১-৪০ মিনিটে। তার পরের প্রোগ্রাম ৪টায় 'রিলিজিয়ন নিউজ সার্ভিস' এর সাথে। সুতরাং হাতে আমাদের

www.pathagar.com

প্রচুর সময়। সময় কাটানোর জন্য গত দু'দিন যা করেছি আজও তাই করলাম। আমরা হোটেল থেকে বের হলাম। ইরউইন কার্নও আমাদের সাথে। ইরউইন কার্ন সবসময় স্বল্প দূরত্বের জায়গাগুলোতে হেঁটে যাওয়ার পক্ষপাতি। আমরাও হাঁটতে পছন্দ করছি। শহরকে যদি দেখতে বুঝতে হয় তাহলে হেঁটে বেড়ানোর বিকল্প নেই। হোয়াইট হাউজ এলাকায় আমরা আবার আসলাম। হেঁটে, বসে, দাঁড়িয়ে হোয়াইট হাউজকে আমরা নানাভাবে দেখলাম। সাদা রঙের একটি নিরাভরণ বিল্ডিং এর চারদিকে সবুজ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ ঘিরে সাধারণ ধরনের লোহার শিক দিয়ে তৈরি বেড়া। চারদিকের কোথাও দেয়াল নেই। চারদিক থেকেই হোয়াইট হাউজকে সমানভাবে দেখা যায়। আর একটি বিষয় হোয়াইট হাউজের চারদিকে সিকিউরিটি বক্সের সমারোহ দেখলাম না। এই খোলা পরিবেশে সাদামাটা এই বিল্ডিংটাই দুনিয়ার পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। হোয়াইট হাউজের পর 'মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি' এবং 'সাইন্স এন্ড স্পেস মিউজিয়াম' দেখে সময় কাটালাম। মহা আকাশ সম্পর্কে দারুণ এক অভিজ্ঞতা লাভ হলো। একটা ভিডিও দেখলাম আমরা। অ্যাপোলো এবং সুয়ুজের মহাকাশ সফর দেখার সুযোগ হলো।

আনন্দের মধ্যে আমাদের সময়টা কেটে গেল। ঠিক ১টা ৪০ মিনিটে আমরা ভয়েস অব আমেরিকা অফিসে পৌঁছলাম। ভয়েস অব আমেরিকা (ভোয়া) আসলে ইউনাইটেড স্টেট ইনফরমেশন এজেন্সির একটি শাখা। এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি রেডিও ব্রডকাস্ট সার্ভিস হিসাবে কাজ করে। ভয়েস অব আমেরিকার নিউজ, ফিচার ইত্যাদি মার্কিন রাজনীতি এবং সংস্কৃতিকেই তুলে ধরে।

ভোয়া অফিসে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন ভোয়ার পাবলিক এ্যাফেয়ারস বিশেষজ্ঞ জর্জ ম্যাকেনজি। তার সাথে কিছু কথা হলো। তারপর তিনি ঘুরে ঘুরে গোটা অফিস আমাদের দেখালেন। ভোয়া বিয়াল্লিশটি ভাষায় প্রোগ্রাম প্রচার করে। বিশাল অফিসে বিচিত্র ভাষার মানুষের সমারোহ। বেলা আড়াইটার দিকে আমরা ভোয়ার বাংলা বিভাগে গেলাম। ভোয়ার বাংলা বিভাগের স্বনামধন্য ব্রডকাস্টার সাইয়েদ জিয়াউর রহমান, মাসুমা খাতুন ও দিলারা হাসিম আমাদের স্বাগত জানালেন। নিজ দেশের বহুল পরিচিত মানুষদের পেয়ে আমরা খুশি হলাম। মনে হলো তারা আরো বেশি খুশি হয়েছে। দেশ নিয়ে কথা, দেশের রাজনীতি নিয়ে কথা, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা অনেকক্ষণ ধরে চলল। এর

www.pathagar.com

মধ্যে নাস্তা ও চা-পান হল। এর আগে ঘোরাফিরার সময় আমরা লাঞ্চের কাজ সেরে নিয়েছিলাম।

ভোয়ার সাথে আমাদের মূল প্রোগ্রাম ছিল আমাদের সাক্ষাৎকার। আমার সাক্ষাৎকার নিলেন সাঈয়েদ জিয়াউর রহমান এবং মাসুমা খাতুন নিলেন ড. মুস্তাফিজের সাক্ষাৎকার। আমার সাক্ষাৎকারে সাঈয়েদ জিয়াউর রহমান নানা বিষয়ে জানতে চাইলেন। আমাদের আমেরিকা সফরের উদ্দেশ্য, কয়েকদিনে কি অভিজ্ঞতা লাভ করলাম, বাংলাদেশের সংবাদপত্রের অবস্থা কি, বাংলাদেশের রাজনীতি কেমন চলছে, আমেরিকায় ইসলামের অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে বলা যায় বিস্তারিত কথা হলো। আমরা আড়াইটার দিকে ভোয়া অফিস ত্যাগ করলাম।

চারটায় রিলিজিন নিউজ সার্ভিস অফিসে আমাদের প্রোগ্রাম। হাতে দেড় ঘণ্টা সময়। ধীরে সুস্থে যাওয়া যাবে। আমরা কিছুটা হাঁটলাম। মেট্রো স্টেশনে পৌঁছলাম। ক্যানিকটিকাট এভিনিউতে নিউজ সার্ভিসের অফিস। মেট্রোতে গিয়ে নামতে হবে। ফারাগুত নর্থ স্টেশন থেকে ১১১ ক্যানেকটিকাট এভিনিউ খুব কাছে। ওয়াশিংটন আসার পরে এটাই প্রথম মেট্রোতে চড়া। আন্ডারগ্রাউন্ড মেট্রো লাইন। খুব ভালো লাগলো। মনে হলো যানজট জর্জরিত ঢাকায় যদি আন্ডারগ্রাউন্ড এ ধরনের মেট্রো নেটওয়ার্ক থাকতো তাহলে মানুষ অনেকটাই বেঁচে যেত। রিলিজিন নিউজ সার্ভিস অফিসে মিস্টার ইরা রিফকিন আমাদের স্বাগত জানালেন। ইরা রিফকিন এর কাছে জানলাম রিলিজিন নিউজ সার্ভিসটি 'নিউ হাউজ' নামক একটা পারিবারিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। এই পরিবারের আরো ২৮টি কাগজ রয়েছে। মিস্টার ইরা রিফকিন এবং তার সহকর্মীদের সাথে আমাদের আলাপ হলো। আমি এক পর্যায়ে বললাম ধর্মের পরিচয় নিয়ে এ ধরনের ধর্মীয় নিউজ সার্ভিসের কেন প্রয়োজন দেখা দিলো। মিস্টার ইরা রিফকিন বললেন, অন্য নিউজ সার্ভিসগুলো ধর্মীয় নিউজ ভালোভাবে দেয় না। এই শূন্যতা দূর করার জন্য এই নিউজ সার্ভিসের জন্ম। সংস্থার কিছু কাগজ-পত্র তিনি আমাদের দিলেন। সংস্থার পরিচয় এবং কাজ সম্পর্কে নানা তথ্য তাতে রয়েছে। এই কাগজ-পত্র উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখার সময় আমি জানতে চাইলাম নিউজ সার্ভিসের পাশে আবার এত পত্রিকা কেন, এগুলোর পাঠকদের কাছে কেমন রেসপন্স আপনারা পান। তিনি বললেন, মানুষ ধর্ম সম্পর্কে জানতে চায়, সমাজে ধর্মের প্রভাব বাড়ছে। কাগজ আমাদের প্রচুর ছাপা হয়। অবশ্য আলোচনায় তিনি স্বীকার করলেন নন-রেলিজাস পিপল এর সংখ্যাও বাড়ছে। আমি জানতে

www.pathagar.com

চাইলাম পাবলিক স্কুলগুলোতে যদি ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতো তাহলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াত। তিনি বললেন, পাবলিক স্কুলে ধর্ম শিক্ষা ব্যবস্থা থাকলেও পরিস্থিতির উন্নতি হতো বলে তিনি মনে করেন না। তবে তিনি বললেন, ধর্ম শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা না থাকা ধর্ম থেকে মানুষ দূরে সরে যাওয়ার একটা কারণ হতে পারে। চা ও আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে ঘণ্টাখানিক সময় কেটে গেল। আমরা বিকাল পাঁচটায় বেরিয়ে এলাম রিলিজিন নিউজ সার্ভিস এর অফিস থেকে।

১৬ তারিখ মঙ্গলবার রাতে ওয়াশিংটন এসে দ্বিতীয় দাওয়াত খেতে গেলাম আবুল কাশেম ভাইয়ের বাড়িতে। ওয়াশিংটনের হোটেল-রেস্টুরেন্টে আমাদের নাস্তা খাওয়া ছিল অনেকটাই পেট ভরাবার জন্য। পাউরুটি, ডিম, আলু কাহাতক খাওয়া যায়! মাছের তৈরি কাটলেট ধরনের যা পাওয়া যায় সেগুলো কিসের তেলে ভাজা সে নিয়ে প্রশ্ন আছে। আবুল কাশেম ভাইয়ের বাসায় পরিচিত নানা ধরনের খাবার পেয়ে খাওয়াটা আমাদের বেশি হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন পেটভার নিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম। দিনটা ছিল ১৭ মে বুধবার। আজ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রোগ্রাম আছে। এছাড়াও আরো দু'টি প্রোগ্রাম এর সাথে যোগ হতে পারে। একটা 'জর্জটাউন ইউনিভার্সিটি'তে, অন্যটি 'সেন্টার ফর রেসপেক্ট অব লাইফ এন্ড এনভাইরোনমেন্ট' এর সাথে। যদি এই প্রোগ্রাম দু'টি হয় তাহলে বিকাল চারটার 'ক্যাটো ইনিস্টিটিউট' এর প্রোগ্রামের আগেই হবে। আজকে আমাদের প্রথম প্রোগ্রাম সকাল সাড়ে নয়'টায় 'আমেরিকানস ইউনাইটেড ফর দি সেপারেসনস অব চার্চ এন্ড স্টেট' এর সাথে। তার মানে আটটার মধ্যে আমাদের প্রস্তুত হয়ে বেরুতে হবে। পাউরুটি দিয়ে হালকা নাস্তা সেরে বের হলাম। ইরউইন কার্ন বললেন, আমরা মেট্রোতে যাব তবে হাঁটতেও হবে। সংস্থাটির অফিস ১৮১৬ জেফারসনস প্লেসে। মেট্রোতে গিয়ে সিলভার স্প্রিং এ একজিট নিতে হবে। ওয়েন এভিনিউ পর্যন্ত হাঁটতে হবে। তারপর জর্জিয়া এভিনিউ পার হয়ে পেন্টন স্ট্রিট। এখান থেকে চার ব্লক পরেই অফিস সংস্থাটির। আমরা ঠিক সাড়ে নয়টার আগে পৌঁছে গেলাম। সংস্থার ফেথ গ্রুপের ডাইরেকটর মিস বানিরেন্ডল আমাদের স্বাগত জানানোর কথা। কিন্তু হঠাৎ করে তাকে সিএনএন-এর একটি প্রোগ্রামে যেতে হওয়ায় মিস্টার জেসন হায়েস আমাদের স্বাগত জানালেন।

'আমেরিকানস ইউনাইটেড ফর দি সেপারেসনস অব চার্চ এন্ড স্টেট' সংস্থাটি তাদের দেয়া পরিচিতি অনুসারে একটি নন-প্রফিট, অসম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান।

www.pathagar.com

সংস্থাটি সাংবিধানিক বিধির অনুসরণে ধর্মীয় স্বাধীনতার সংরক্ষণ এবং চার্চ ও স্টেট আলাদা রাখার পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। ৫০ হাজার সদস্য রয়েছে এই সংস্থাটির। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার সংরক্ষন এবং চার্চ ও স্টেট আলাদা রাখা সম্পর্কিত সুপ্রিমকোর্টের অধিকাংশ আইনী লড়াইয়ে এই সংস্থা প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

মিস্টার জেসন হায়েস এর অফিসে তার সাথে আমাদের আলোচনা হলো। আলোচনা ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং চার্চ ও স্টেটকে আলাদা রাখা বিষয়ে। দেখলাম মিস্টার জেসন হায়েস তাদের নীতির ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ়। আমি বললাম, মাত্র ইউরোপের অভিজ্ঞতা-জাত ভয় এবং রাষ্ট্রীয় কিছু জটিলতা এড়াবার লক্ষ্যেই চার্চ এবং স্টেটকে আলাদা করা হয়েছে। কিন্তু ঐ ভয় ও জটিলতাকে বাদ দিলে ধর্ম ও রাষ্ট্রকে সমন্বিত রাখার মধ্যে অনেক ভাল দিক রয়েছে তা বিবেচনা যোগ্য কিনা। তিনি বললেন, ধর্ম ও রাষ্ট্র আলাদা রাখার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। আমরা এই নীতির ব্যাপারে যেমন দৃঢ়, তেমনি সকল ধর্মের অধিকার সংরক্ষণে আমরা আপসহীন কাজ করছি। এনিয়ে আরো কিছু কথা বললেন। এক পর্যায়ে বললাম, রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে বাইরে রাখার পর রাষ্ট্র যে 'ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ' অনুসরণ করছে সে 'ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ'কেই পশ্চিমের অনেক মনীষী এক ধরনের 'ধর্ম' বলে অভিহিত করেছেন। এদিক থেকে রাষ্ট্র প্রচলিত ধর্মের প্রতি বৈষম্য করছে এবং সমাজে ধর্মহীনতা বাড়াচ্ছে কি না।' এসব কথা কিছু কিছু মহলে আলোচনা হচ্ছে বলে উল্লেখ করে তিনি বললেন, বিষয়টি একটি জটিল প্রসংগ। এনিয়ে কথা আর আমাদের এগোয়নি। নন-রিলিজিয়াস লোকের সংখ্যা বাড়ছে, এমন অভিমতের উত্তরে তিনি বললেন, এটা দেখার দায়িত্ব পরিবারের, রাষ্ট্রের নয়। ব্যক্তি এবং পরিবারকেই ধর্মের দাবি এবং ধর্মের অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। ভবিষ্যতে চার্চ সরাসরি রাজনীতিতে অংশ নেয়া প্রসঙ্গে তিনি বললেন, কিছু কিছু চার্চম্যানের এমন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। চার্চের লোকরা রাজনীতিতে অ্যাকটিভ হওয়া ভালো। তাতে ধর্মীয় অধিকার আদায় সহজ হতে পারে।

চা এবং আলোচনার মধ্যে দিয়ে কখন যে একঘণ্টা পার হয়ে গেল তা আমরা টেরই পেলাম না। সাড়ে দশটার দিকে আমরা বিদায় হলাম মিস্টার জেসন হায়েস এর অফিস থেকে। এর পরে আমাদের ছুটতে হলো জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানে জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন এল

www.pathagar.com

এসপোজিটোর সাথে সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল। ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞ জন এল এসপোজিটোর ইসলামের কন্টেমপরারি বিষয় এবং বিশ্বের বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলন ও মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থার উপর অনেক প্রবন্ধ আমি পড়েছি। তাছাড়া তিনি ঢাকা গেলে আমার পত্রিকা অফিসে গিয়েছিলেন। ইসলামের বহুমুখী সহাবস্থান নীতি বিষয়ে তার সঙ্গে সে সময়ে আলাপ হয়েছিল। দুঃখের বিষয় জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো না। হঠাৎ করে তাড়াহুড়ার মধ্যে এই প্রোগ্রামটা নির্দিষ্ট হওয়ায় তার পক্ষে থাকা সম্ভব হয়নি। তাকে ওয়াশিংটনের বাইরে যেতে হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন খৃস্টান-মুসলিম সমঝোতা সেন্টারের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ফুলব্রাইট প্রফেসার মিসেস নাসরিন হাকেমি। তার অফিসেই আমরা বসলাম। আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল 'সেন্টার ফর ক্রিশ্চিয়ান মুসলিম আন্ডারস্ট্যান্ডিং' সংস্থার কাজ নিয়ে। এ বিষয়ে তিনি বললেন, সেমিনার ও বিভিন্ন পাবলিকেশন্সের মাধ্যমে খৃস্টান-মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক জানাজানি বৃদ্ধি এবং তাদের মধ্যেকার দূরত্ব দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আলোচনা হলো ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা নিয়ে, যা মুসলিম ও খৃস্টানদের মধ্যে দূরত্ব বাড়াচ্ছে। মিসেস নাসরিন হাকেমি জানালেন, পত্র-পত্রিকায় ইসলাম সম্পর্কে যে ধারণা দেখা যায় সাধারণ আমেরিকানদের এ ধারণা নয়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বললেন, ছাত্ররা ইসলাম সম্পর্কে যা লিখে তা খুবই অবজেকটিভ। তবে তিনি সমসাময়িক অবস্থা প্রসঙ্গে বললেন, মুসলিম নামীয় লোকদের সন্ত্রাস ও বোমাবাজির ঘটনা একটা ভুল মেসেজ সামনে নিয়ে আসছে। সাধারণ আমেরিকানদের অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন এটাই ইসলাম, মুসলমানরা এরকমই। একদিকে সন্ত্রাস ও বোমাবাজির ঘটনা, অন্যদিকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রকৃত রূপ আমেরিকানদের সামনে ব্যাপকভাবে না আসা একটা সংকট হিসাবে কাজ করছে। এই সংকটের জন্য সাধারণ আমেরিকানরা দায়ী নয়। তিনি বললেন, পশ্চিমকে শুধু গালি না দিয়ে তাদের মনের দরজা খোলার জন্যে মুসলমানদের চেষ্টা করা উচিত। মিসেস নাসরিন হাকেমি পরনে ছিল লম্বা কালো স্কার্ট। গায়ে ফুলহাতা কালো একটা লম্বা জামা। মাথায় রুমাল। জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ফুলব্রাইট প্রোগ্রামে এসেছেন। এ প্রোগ্রাম শেষে তিনি লসএঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অব কালিফোর্নিয়ায় ভিজিটিং প্রফেসর হিসাবে যোগ দিবেন।

www.pathagar.com

মিসেস নাসরিন হাকেমি সংবাদপত্রের ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে দৈনিক সংগ্রামের এডিটোরিয়াল পলিসি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি বললাম। তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন, মুসলমানরা সব জায়গায় নির্যাতিত হচ্ছে। তাদের পক্ষে দাঁড়াবার লোক ও মিডিয়া খুব কম। খৃস্টান মুসলিম সহযোগিতা উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও মিডিয়ার ভূমিকাকে প্রধান বাধা বলে মনে করেন।

আলোচনাটা আমাদের জন্য আনন্দদায়ক ছিল। আরো বহুক্ষণ চলতে পারতো। কিন্তু তাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে আমাদের বিদায় নিতে হলো। দেড়টায় আমাদের আরো একটি প্রোগ্রাম আছে। 'সেন্টার ফর রেসপেক্ট অব লাইফ এন্ড এনভাইরোনমেন্ট' এর সাথে আমাদের দেড়টার প্রোগ্রাম নিয়ে এক সময় ভাবছিলাম, তাড়াহুড়া করে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রোগ্রাম না করাই ভালো ছিল। আমার মনোভাবটা পরে বদলে গিয়েছিলো। বেলা দেড়টায় আমরা পৌঁছলাম সংস্থাটির অফিসে। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মিস্টার ক্লাগ স্টোন এর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তার সাথে আলাপ হলো তার সংস্থা নিয়ে। তার সংস্থার নামের মধ্যে একটা অসাধারণত্ব আছে। রেসপেক্ট অব লাইফ বলতে মানুষ পশু-পাখি সব জীবনকে শামিল করা হয়েছে। আবার নামের রেসপেক্ট শব্দটা এনভাইরোনমেন্টেরও বিশেষণ। তার মানে পরিবেশের প্রতি রেসপেক্টের প্রশ্ন আসছে। তিনি তার সংস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে জানালেন আমরা জীবন ও এনভাইরোনমেন্টের সমস্যাকে সেক্যুলার দৃষ্টিতে না দেখে ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছি। আমরা মনে করি এর মধ্যে প্রকৃত কল্যাণ রয়েছে। তার কথায় আমরা খুব খুশি হলাম এবং ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, জীবন ও জগৎকে তারা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাদের কাগজ-পত্র এবং বই আমাদের দেখালেন। দেখে আমাদের খুবই ভালো লাগলো যে জীবন ও পরিবেশের প্রতি সম্মান দেখানো এবং দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত সব ধর্মের বক্তব্যকে তারা একত্রিত করেছেন। মিস্টার ক্লাগ স্টোন বললেন, জীবন ও পরিবেশ বিষয়ে ইসলাম ধর্ম থেকে তারা সবচেয়ে বেশি সাহায্য পেয়েছেন। পরিবেশ বিশেষ করে এনিমেল জীবনের উপর ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা একটা করে বই তিনি আমাদের উপহার দিলেন। আমরা তাদেরকে এই সুন্দর উদ্যোগের জন্য ধন্যবাদ দিলাম।

চার'টার মধ্যেই আমরা ক্যাটো ইনস্টিটিউটে (Cato Institute) পৌঁছলাম। ক্যাটো ইনস্টিটিউট মাসাচুসেটস এভিনিউতে। দুনিয়া জুড়ে পরিচিত ক্যাটো

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ একটা থিংক ট্যাংক। পাবলিক পলিসি রিসার্চ অর্গানাইজেশন হিসাবে কাজ করছে। বলা যায়, 'সীমিত সরকার' ও 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' এদের মূল স্লোগান। এরা সবকিছু প্রাইভেটাইজ করার নীতিতে বিশ্বাসী। কম ও সরল ট্যাক্স আরোপ পর্যন্ত সরকারের ভূমিকা মানতে তারা রাজি। এরা চায় সরকারী খরচ কম থাকুক। আর্থ-সামাজিক সমস্যার স্বতঃস্ফূর্ত সমাধানকে তারা উৎসাহিত করে। সব মিলিয়ে তাদের লক্ষ হলো, অল্প নিয়ন্ত্রিত বা স্ব-নিয়ন্ত্রিত বিশাল বপু প্রাইভেট কর্মকান্ডের মাথার উপরে থাকবে, জড়ো-সড়ো দেহের এক ক্ষুদ্র সরকার।

সংস্থার সিনিয়র ফেলো মিস্টার ডোগ বান্ডো আমাদের রিসিভ করলেন। তার সাথেই তার অফিসে আমাদের কথা হলো। আলোচনার বিষয় যা হওয়ার কথা সেটাই: সরকারকে হ্রস্বকরণ এবং প্রাইভেট সেক্টরকে সর্বোচ্চ বর্দ্ধিতকরণ। মানুষের ও ব্যক্তির অলংঘনীয় স্বাধীনতার বিষয়টি তিনি সামনে এনে বললেন, এমন একটি ব্যবস্থার মধ্যেই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কল্যাণ রয়েছে। আমি বললাম, সব দেশে এক নিয়ম চলতে পারে না। অনেক দেশ আছে যেখানে মানুষের ব্যক্তির স্বাধীনতা ও স্বাধীকার সংরক্ষণের জন্যেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের উপর সরকারের শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ দরকার। সুতরাং আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখেই বেসরকারীকরণ বিষয়টি কন্ডিশনাল হওয়া উচিত। তিনি স্বীকার করলেন; উন্নয়নের একটা পর্যায় পর্যন্ত এটা প্রয়োজন।

এনিয়ে তার সাথে আরও কথা হলো। এক পর্যায়ে আমি কথা তুললাম, কার্ল মার্কস সবাইকে সর্বহারা বানিয়ে স্টেটলেস সোসাইটি গড়ার নামে স্টেটকে সর্বশক্তিমান বানিয়েছিলেন। আপনারা যেন তার উল্টো পথে চলছেন। সরকারকে দুর্বল করার শেষটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? সরকার তার অর্থনৈতিক ও আকারগত দুর্বলতার কারণে স্বাভাবিক রাজনৈতিক-প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসতে পারে। তার ফলে 'কেউ সরকার নয় সবাই সরকার'– এমন একটা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি আসতে পারে। মিস্টার বান্ডো বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে নিলেন। তবে বললেন, ওটা তো অনেক দূর-ভবিষ্যতের ব্যাপার। সহসা এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে না।

আমি মিস্টার বান্ডোকে বললাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো ধর্ম বা পূর্ণাঙ্গ কোনো ডিভাইন আদর্শ নেই। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে যে দু'টি আদর্শ

www.pathagar.com

প্রভাবশালী তার একটি হলো লকিয়ান (Lockian) লিবারেলিজম, অন্যটি প্রাগমাটিক ইউটিলিটারিয়ান। আদর্শ-দু'টিই মূলগত দিক দিয়ে এক। শুধু নীতির প্রয়োগ-পথ আলাদা। একটি যদি হয় ক্লাসিক্যাল লিবারিলিজম, অন্যটি রিফরমড লিবারালিজম। কিন্তু এ ধরনের আর্থ-সামাজিক কর্মসূচী কি মানুষ ও রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালনার সার্বিক বিধান হতে পারে? মিস্টার বান্ডো আদর্শ দু'টির পার্থক্য ও পরিচয় তুলে ধরে বললেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় সার্বিক নীতি হিসাবে এ দু'টি আদর্শ অবশ্যই কাজ করছে। প্রাগমাটিক ইউটিলিটারিয়ার মডেল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের অধীনে 'নিউ ডিল' (New Deal) নামে রাষ্ট্রীয় নীতিতে বিধিবদ্ধ হয়।

সবশেষে আমি তাকে বললাম, প্রাইভেটাইজেশন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলো চাপের সম্মুখিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের পক্ষ থেকে। তিনি বললেন, এটাকে চাপ মনে করা ঠিক নয়। ডোনার কান্ট্রি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ পরামর্শ দিতেই পারে।

পরদিন ১৮ মে'র সকালটা শুরু হলো ঢিলে-ঢালা অবস্থায়। নাস্তারও তাড়া নেই, তাড়াহুড়া করে প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। মিডিলইস্ট ইনস্টিটিউটের সাথে আমাদের প্রোগ্রাম সাড়ে দশটায়। শুয়ে থেকে বই ও নোট পড়ে কাটালাম। পাউরুটি, ডিম, আলুতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। নাস্তারও চিন্তা নেই।

মিডিলইস্ট ইনস্টিটিউটে যাবার জন্যে সাড়ে দশটার দিকে বেরুলাম। সংস্থাটির অফিস নর্থ স্ট্রিটে। মেট্রোতে গেলাম। ওয়াশিংটনে ক'দিন ধরে মেট্রোতেই চলছি। মেট্রো স্টেশন খোঁজা, এগজিট নেয়া, ঠিকানায় পৌঁছা, এসব নিয়ে আমাদের কোনো মাথা নেই। বলা যায় আমরা অন্ধের মতো ইরউইন কার্ন-এর সাথে চলি।

সাড়ে দশ'টার মধ্যেই আমরা মিডিলইস্ট ইনস্টিটিউটে পৌঁছলাম। মিডিলইস্ট ইনস্টিটিউট খুব পরিচিত একটা প্রতিষ্ঠান। বলা হয়েছে, এর মিশনই হলো নানা গবেষণা, পাবলিকেশনস, সেমিনার, প্রদর্শনী ভাষা-শিক্ষা ইত্যাদির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে মানুষের জানার পরিসর বৃদ্ধি করা। সংস্থাটির একটা সমৃদ্ধ পাঠাগার আছে, যা জনগণের জন্যে উন্মুক্ত। 'Middle East Journal' নামে একটি গবেষণা পত্রিকা প্রকাশ করে থাকে সংস্থাটি।

অফিসে পৌঁছলে ইনস্টিটিউট এর প্রেসিডেন্ট অ্যামব্যাসেডর রিচার্ড পারকার আমাদের স্বাগত জানালেন। বসলাম গিয়ে তার অফিসে। প্রাথমিক কিছু কথা হওয়ার পর তিনি বললেন, 'Christian, Jews and Islam: Common

www.pathagar.com

Ground' নামে একটা ফিল্ম আমরা দেখব। ওয়াশিংটনের বাইরের একটা স্কুল থেকে ছেলে-মেয়েরা আসবে। আমরা ফিল্মটা দেখব তাদের সাথে বসেই। এখনও বেশ সময় হাতে আছে। আমাদের আলাপের জন্যে যথেষ্ট হবে।

আলাপ শুরু হলো মিডিলইস্ট ইনস্টিটিউট এর কাজ নিয়ে। তিনি বললেন, মিডিলইস্ট সমস্যা সম্পর্কে মানুষ জানুক, সমস্যার সমাধান হোক এবং মধ্যপ্রাচ্যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হোক আমরা চাই। আমি বললাম, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার বয়স অনেক হলো। সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আসলে যে শান্তি আলোচনা চলছে, তাতে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনীদের সমান চোখে দেখা হচ্ছে না। মূল সমস্যা পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ইসরাইল ১৯৬৭ সালে দখলকৃত এলাকা ছেড়ে দিয়ে তার ১৯৬৭ পূর্ব সীমান্তে যদি ফিরে যায়, তাহলে সমস্যা সমাধান দ্রুত হয়ে যেতে পারে। তিনি বললেন, সমস্যার আরও কিছু দিক আছে যা সমস্যাটিকে জটিল করে তুলেছে। সবাই মিলে জটিলতা দূর করার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি এ প্রসংগে আরব দেশে গণতন্ত্রের কথা তুললেন। তিনি বললেন, মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্রের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। সউদি আরবেও সরকার ও প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ আছে এবং বাড়ছে। সরকারকে সহায়তার জন্যে জনগণের অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সেখানে গড়ে তোলা হচ্ছে। আমি এ প্রসংগে বললাম, গণতন্ত্রের কোনো একক রূপ থাকা কি উচিত? প্রত্যেক দেশ-জাতি তার অবস্থা ও প্রয়োজনেই তার জন্যে উপযোগী গণতান্ত্রিক কাঠামো গ্রহণ করবে। গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের বড় শত্রু হলো বড় দেশের স্বার্থদুষ্ট হস্তক্ষেপ, যেটা আজ ছোট ও উন্নয়নশীল দেশের জন্যে একটা বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনিয়ে আমাদের কথা আর এগুতে পারল না। ফিল্মটা দেখার জন্যে ডাক পড়ল। মোটামুটি বড় একটা হল ঘর। হলে দর্শকদের অনেক চেয়ার। তার সামনে সংস্থার সংশ্লিষ্ট লোকরা বসেছেন, তারাই অনুষ্ঠানটা পরিচালনা করছেন। আমরা তাদের পাশে নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসলাম। সামনে স্কুল ও হাইস্কুল লেভেলের ছেলে মেয়েরা বসে। সংখ্যা পঞ্চাশ ষাটজন হতে পারে। তাদের সাথে বসে আমরা ফিল্মটা দেখলাম। চমৎকার একটা ফিল্ম। ফিল্মে ইসলাম, খৃষ্টান ও ইহুদি ধর্মের পরিচয় ও সাদৃশ্যগুলো দেখানো হয়েছে। তিন রাসূল- হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মুহম্মদ (সাঃ) একই বংশ ধারার মানুষ, একই আরব ভূখন্ডে তাদের জন্ম। ফিল্মে জন্মস্থানগুলো দেখানো হয়েছে। তিন ধর্মই একত্ববাদী। তিন ধর্মেরই উৎস (আসমানী) গ্রন্থ। এছাড়া ফিল্মে প্রত্যেক ধর্মের

www.pathagar.com

ধর্মগ্রন্থ দেখানো হয়। দেখানো হয় তিন ধর্মের আর্ট, আর্কিটেকচার ও ধর্মের পবিত্র স্থানসমূহের দৃশ্য।

ফিল্ম শেষ হবার পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটা কাগজের শিট দেয়া হলো। তাতে প্রশ্ন লিখা আছে, শিটেই তার উত্তর লিখার জায়গা। প্রশ্নগুলো ফিল্মে যা দেখানো হলো তার ওপরে। যেমন, তিন রাসূলের জন্মস্থান কোথায়, তারা বহুত্ববাদী, না একত্ববাদী ইত্যাদি। তিন চার মিনিটের মধ্যেই ছাত্ররা উত্তর লিখে শিট জমা দিয়ে দিল। আমি কয়েকটা উত্তর-পত্র দেখলাম। ঠিক ঠিক উত্তর দিয়েছে ছেলে মেয়েরা। বুঝলাম, ফিল্ম ওরা মনোযোগ দিয়ে দেখেছে।

মিডিলইস্ট ইনস্টিটিউট এর এই উদ্যোগ আমার খুব ভালো লাগল। কর্তৃপক্ষ জানালেন, তারা প্রতি সপ্তাহে স্কুল ছাত্রদের নিয়ে এই প্রোগ্রাম করেন। প্রতি সপ্তাহে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলকে তারা আমন্ত্রণ জানান। স্কুলগুলো আগ্রহের সাথে তাদের ছেলে মেয়েদের পাঠায়। তিন ধর্ম সম্পর্কে এই প্রাথমিক জ্ঞান ছাত্রদের খুব উপকারে আসবে। ধর্মের ব্যাপারে বিদ্বেষের বদলে তাদের মধ্যে সমঝোতা ও জানাজানির আগ্রহ বাড়বে।

আমরা অ্যামব্যাসেডর রিচার্ড পারকারকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, বড়দের জন্যে এ ধরনের ফিল্ম তৈরি হতে পারে। যাতে বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ে তিন ধর্মের শিক্ষা তুলে ধরা হবে। দেখা যাবে মূল ক্ষেত্রগুলোতে তিন ধর্মের বৈসাদৃশ্যের বদলে সাদৃশ্যই বেশি আছে। তাদের এ ধরনের চেষ্টা আছে জানিয়ে তিনি আমাদের ধন্যবাদ দিলেন তাদের প্রতিষ্ঠানে আসার জন্যে।

নর্থ স্ট্রীট থেকে বের হলাম আমরা। যেতে হবে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট হেডকোয়ার্টারে, ভার্জিনিয়ায়। পৌঁছতে হবে ১২টার মধ্যে। চিন্তা নেই। আমাদের প্রধান বাহন মেট্রোরেল আমাদের ঠিক সময়েই নিয়ে যাবে। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক থট এর হেডকোয়ার্টার ভার্জিনিয়ার হার্নডন এর গ্রোভ-স্ট্রীটে।

ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট অফিসের সবচেয়ে নিকটবর্তী মেট্রো স্টেশন ভিয়েনাতে আমরা নামলাম। সংস্থার অফিস থেকে মেট্রো স্টেশনে একজন লোক পাঠানো হয়েছিল আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা খুব খুশি হলাম। পৌঁছলাম আমরা সংস্থার অফিসে। আমাদের স্বাগত জানালেন সংস্থার ডাইরেক্টর ড. ইকবাল ইউনুস। ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থট এর হেডকোয়ার্টারে এই প্রথম এলেও সংস্থাটির সাথে আমি পরিচিত অনেক

www.pathagar.com

আগে থেকেই। 'ট্রিপ্‌ল আই টি' সংস্থাটির সংক্ষিপ্ত এবং পোপুলার নাম। সংস্থাটির সাথে আমার পরিচয় সংস্থাটির ম্যাগাজিনের মাধ্যমে। 'The American Journal of Islamic Social Sciences' ম্যাগাজিনটির নাম। ম্যাগাজিনটি প্রকাশিত হয়'Association of Muslims Social Scientists' এর সাথে যৌথ উদ্যোগে। এই জার্নালে সমাজবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ প্রতিভারা লিখে থাকেন। ম্যাগাজিনটি পড়ে আমি শুধু আনন্দিত নয় আশান্বিত হয়েছি। কেউ যদি এ পর্যন্ত প্রকাশিত জার্নালের সংখ্যাগুলোর শিরোনামগুলোর দিকে তাকান তা হলে দেখবেন ইসলামের আদর্শ ও সমাজচিন্তার বিভিন্ন দিকের উপর বিশ্বমানের আলোচনা রয়েছে প্রবন্ধগুলোতে। মুসলমানদের সমাজবিজ্ঞানীরা ইন্টেলেকচুয়াল লেভেলের দিক দিয়ে বিশ্বমানে পৌঁছে যাচ্ছে। এটা আনন্দের কথা। আর আশার কথা হলো মুসলমানরা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিকভাবে পিছিয়ে পড়ার একটা বড় কারণ হলো তাদের ইন্টেলেকচুয়াল বা বুদ্ধিবৃত্তিক দৈন্য, সেখান থেকে মুসলমানরা দ্রুত উঠে আসছে। এই পথ অবশ্য অনেক দীর্ঘ। এশিয়ান স্টান্ডার্ডে যদি আমরা বিচার করি তাহলে দেখব যেখানে চীন বছরে আট হাজার বিজ্ঞানী তৈরি করে সেখানে মুসলিম বিশ্ব বছরে তৈরি করে মাত্র পাঁচশ' বিজ্ঞানী। এই তথ্য বেশ আগের। ইতিমধ্যে মুসলমানরা আরো এগিয়েছে। কিন্তু সেই এগুনোটা চীন বা ইউরোপ কিংবা আমেরিকান স্টান্ডার্ডে হতাশাব্যঞ্জক। এই হতাশার মধ্যে ট্রিপল আই টি'র জার্নাল একটি আশার আলো। আল্লাহর শুকরিয়া যে, মুসলমানদের অনেক জার্নাল জাতীয় পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেলেও ট্রিপল আই টি'র জার্নাল প্রকাশিত হচ্ছে।

ট্রিপল আই টি'র অফিসে দেখা হলো সংস্থার প্রেসিডেন্ট মিঃ তাহা ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে। দেখা হলো আরো দু'জন অতিথি ইয়াকুব মির্জা ও হিসাম তালিবের সাথে। ট্রিপল আই টি'র কর্মকর্তাদের সাথে অনেক বিষয়ে আলোচনা হলো। ট্রিপল আই টি'র নানা বিষয় আমরা জানলাম। এটি একটি অনন্য সংগঠন। আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে ঘাটতি রয়েছে মুসলমানদের, তা পূরণের জন্য আলোচনা-পর্যালোচনার কাজ শুরু করেছে এই সংগঠন। সোস্যাল সায়েন্স ছাড়াও বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রের সাথে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিকে সমন্বিত করার কাজ চলছে। এ ব্যাপারে মৌল কিছু বিষয় নিয়ে দিক নির্দেশনামূলক কিছু বইও তৈরি হয়েছে। আমরা শুনে খুশি হলাম এ ধরনের বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় দু'শতাধিক বই তৈরি হয়েছে। আমরা কিছু বই উপহার পেয়ে আরো খুশি হলাম। দুপুরে

www.pathagar.com

আমাদের লাঞ্চ হলো ট্রিপল আই টি অফিসে। সংস্থার অফিস এবং চারদিকটা আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। শহর থেকে অফিসটা বলা যায় বেশ দূরেই। তবে জ্ঞান-গবেষণা কাজের জন্য নিরিবিলি এই পরিবেশটাই ভালো। এদিন আমাদের আর কোনো প্রোগ্রাম ছিল না বলে ট্রিপল আই টি'র অফিসে নির্ধারিতের চেয়ে বেশি সময় কাটালাম। সম্ভবত সাড়ে তিনটার দিকে আমরা ফিরে এলাম ওয়াশিংটনে।

আজ ১৯ তারিখ। সকালে আমাদের প্রোগ্রাম ছিল 'Nations of Islam' এর সাথে। এলিজা মোহাম্মদ আলীর এই সংগঠন। 'Nations of Islam' এর বর্তমান প্রধান ফারাহ খান। আগের দিন টর্নেডো হওয়ায় ফারাহ খান উপদ্রুত অঞ্চলে চলে যান। তার ফলে সকালের প্রোগ্রামটি বাতিল হয়ে যায়। কোনো প্রোগ্রাম বাতিল হলে খারাপই লাগে। কিন্তু এই প্রোগ্রাম বাতিল হওয়ায় আমি বরং কিছুটা স্বস্তি পেলাম। আমাদের পরিচিত জনদের কাছ থেকে জেনেছিলাম এলিজা মোহাম্মদ আলীর সংগঠনটি ইসলামের নামে হলেও এদেরকে অনেকটা কাদিয়ানীদের মতো মনে করা হয়। এলিজা মোহাম্মদ আলীর বিশ্বাস নাকি নবুয়ত দাবির কাছাকাছি। এই বিশ্বাসের কারণে মার্কিন মুসলমানরা এই সংগঠনকে এড়িয়ে চলে। 'Nations of Islam' এর বর্তমান প্রধান ফারাহ খান এলিজা মোহাম্মদ আলীর চিন্তাধারারই অনুসারী। আরো জানলাম, এলিজা মোহাম্মদ আলীর ছেলে ওয়ারেস মোহাম্মদ আলী পিতার মতের অনুসারী নন। তিনি সৌদি আরবে লেখাপড়া করেছেন এবং পিতার মতবাদ পরিত্যাগ করে ইসলামে ফিরে এসেছেন এবং নতুন সংগঠন গড়ে তুলেছেন। ওয়ারেস মোহাম্মদ আলীর সংগঠন বেশ বড়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে তাদের কাজ আছে। তার হেডকোয়ার্টার শিকাগোতে। অনেকে আমাদের পরামর্শ দিলেন, আমরা শিকাগোতে গেলে তার সঙ্গে যেনো দেখা করি।

সকালের প্রোগ্রাম বাতিল হওয়ায় আমাদের হাতে এলো প্রচুর সময়। ড. মোস্তাফিজ ফরমাইশ নিয়ে এসেছিলেন একটা কম্পিউটার নোটবুক কেনার। সে নোটবুক কিনতে আমরা বের হলাম। দোকান ঘুরে ঘুরে আমরা দেখলাম। কম্পিউটার নোটবুক সবখানেই পাওয়া গেল। কিন্তু দাম শুনে চক্ষু চড়কগাছ। ড. মোস্তাফিজ সাহেব নোটবুক কিনলেন না। আমি একটা পকেট কম্পিউটার নোটবুক কিনলাম ১০০ ডলার দিয়ে। এসব জিনিস তখনো বাংলাদেশে আসেনি। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। দুপুর ১২টায় আমাদের প্রোগ্রাম ছিল ওয়াশিংটন ইসলামিক

www.pathagar.com

সেন্টারে। এই সেন্টারেই ওয়াশিংটনের কেন্দ্রীয় মসজিদ রয়েছে। ইসলামিক সেন্টারটি মেসাচুচেটস এভিনিউতে। এটা আমাদের হোটেল এলাকার ডুপন্ট সার্কেল থেকে কিছু দূরে রক ক্রিক পার্কের প্রবেশ পথের কাছাকাছি। আমরা হোটেলে একটু রেস্ট নিয়ে ওয়াশিংটন ইসলামিক সেন্টারে গেলাম। ১২টায় সেখানে পৌঁছলাম। সেন্টারের পরিচালকের সাথে আমাদের পরিচয় হলো। দিনটা ছিল শুক্রবার। জুমার দিন। আমরা নামাজ আদায় করলাম। ওয়াশিংটনের বিবেচনায় মসজিদটি বেশ বড়। নামাজের পর মসজিদেরই ওপর তলায় সবার সাথে আমরা লাঞ্চ করলাম। মজার ব্যাপার হলো, যারা জুমার নামাজে আসে সবার জন্যই লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়। নামাজ এবং তারপরের সময়টা লাঞ্চের সময় বলেই হয়তো এই ব্যবস্থা। খাওয়ার পর সেন্টারের পরিচালক ও সংস্থার ফিজিক্যাল অফিসারের সাথে কথা হলো সেন্টারের বিভিন্ন দিক নিয়ে। আমরা জানতে পারলাম, ইসলামিক দেশগুলোর ওয়াশিংটনস্থ রাষ্ট্রদূতদের যৌথ পরিচালনায় সেন্টারটি পরিচালিত হয়। ওয়াশিংটনে এ ধরনের উন্নত মিনার মসজিদ এই প্রথম। গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার ধারে মসজিদটির সুউচ্চ মিনার অনেক দূর থেকে দেখা যায়। সেন্টারের পরিচালক আমাদেরকে বেশ কিছু বই দিলেন।

ঘড়িতে তখন আড়াইটা বেজে গেছে। ইরউইন কার্ন আড়াইটায় আসার কথা। মসজিদে নামায ও প্রোগ্রাম এক যা বলেই মনে হয় তিনি আমাদের সঙ্গে আসেননি। কথা রয়েছে আড়াইটার দিকে এসে তিনি নিয়ে যাবেন।

এরপরে আমাদের প্রোগ্রাম রয়েছে আই আই ই'তে ('Institute of International Education')। ইরউইন কার্ন এসে গেলেন। আমরা আই আই ই অফিসে যাত্রা করলাম। বিকাল তিনটায় পৌঁছলাম আই আই ই অফিসে। আই আই ই আমাদের এই সফরের হোস্ট সেটা আগেই বলেছি। তাদের সাথে আমাদের আজকের বৈঠকটি গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াশিংটনে আমাদের প্রোগ্রাম শেষ। ওয়াশিংটন ছাড়ার আগে তাদের সাথে আমাদের এই বৈঠক। এরপর আমাদের প্রোগ্রাম কলরাডো স্টেটের ডেনভারে। আজকের বৈঠকে ওয়াশিংটনে আমাদের কয়েক দিনের প্রোগ্রাম নিয়ে যেমন আলোচনা হবে, তেমনি পরবর্তী সফরের তথ্যাবলী, ট্রান্সপোর্ট ও টিকিট ইত্যাদি ব্যাপারে আমাদের ব্রিফ করা হবে। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আই আইই'র প্রোগ্রাম অফিসার মিস্টার আলেকজান্ডার পেটিকো এবং সিনিয়োর প্রোগ্রাম এসোসিয়েট মিস্টার ডগলাস ব্রুকস। ওয়াশিংটনে আমাদের বিগত কয়েক দিনের প্রোগ্রাম কেমন হয়েছে এবং এ

www.pathagar.com

ব্যাপারে আমাদের মন্তব্য তারা জানতে চাইলেন। আমি এ সম্পর্কে আমার ইমপ্রেশন থেকে তিনটি বিষয় তাদের বললাম। এক, সব জায়গায় আলোচ্য বিষয়ের প্রতি ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। দুই, ওয়াশিংটনেই ধর্ম সম্বন্ধীয় এত সব গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা, সংগঠন আছে তা আমাদের ধারনায় ছিল না। তিন, অনেকেই আন্ত-ধর্ম সমঝোতা ও সহ-অবস্থানের পক্ষে কাজ করে যাচ্ছে, এটা উৎসাহব্যঞ্জক।

আসলে এটা ছিল আই আই ই'র সঙ্গে আমাদের বিদায়ী বৈঠকও। সফর শেষে আমরা আর ওয়াশিংটনে ফিরছি না। সর্বশেষ প্রোগ্রাম আমাদের নিউ ইয়র্কে। সেখান থেকে আমরা দেশে ফিরবো। রাতে আমাদের হোটেলে আসলেন আবুল কাশেম ভাই। তিনিও এসেছিলেন আমাদের বিদায় জানাতে। তিনি আমাকে ও ড. মোস্তাফিজ সাহেবকে দু'টো গিফট দিলেন। আমরা ওয়াশিংটন থাকাকালে তার সহযোগিতার জন্য তাকে ধন্যবাদ দিলাম।

আজ ২০ মে। আগামীকাল দুপুর ১২টায় কলোরাডো স্টেটের ডেনভারে যাবার ফ্লাইট। আজ সারাদিন বলতে গেলে আমাদের ছুটি। নাস্তা সেরে সকাল ন'টার দিকে গেলাম পোস্ট অফিসে। এ কয়দিন ওয়াশিংটনে বই, বুকলেট, ব্রুশিয়ার যা পেয়েছিলাম তা সারফেস মেলে দেশে পোস্ট করলাম। এর জন্য উপযুক্ত এনভেলাপ আই আই ই কর্তৃপক্ষই আমাদের সরবরাহ করেছিলেন। আমার পোস্টেজ খরচ লাগল ছয় ডলার।

হোটেলে ফিরে এসেই টেলিফোন পেলাম আখতার হোসাইন সাহেবের। তিনি জানালেন ঘণ্টা খানিকের মধ্যেই তিনি আমাদের হোটেলে আসছেন। তার গাড়িতেই আজ ওয়াশিংটন ডিসি'র দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার কথা। এর আগে একদিন আমরা দুই প্রোগ্রামের ফাঁকে কয়েকটি দর্শনীয় জায়গায় গিয়েছলাম। আজ আমরা সবগুলো জায়গা ভালো করে ঘুরেফিরে দেখতে চাই।

বেলা ১১টার দিকে আমরা বের হলাম। আজ আখতার হোসেন সাহেবই আমাদের হোস্ট এবং গাইড। আমরা প্রথমে দেখলাম ইহুদীদের হলোকস্ট মিউজিয়াম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীতে হিটলার ইহুদীদের ওপর কিভাবে কত ধরনের নিপীড়ন, নির্যাতন ও নিধনযজ্ঞ চালিয়েছিলো তারই চিত্র, জিনিসপত্র, ফটো, ফিল্ম ইত্যাদি দিয়ে সাজানো হয়েছে মিউজিয়াম। চারতালা বিশাল বাড়িতে মিউজিয়ামটি। গোটা মিউজিয়াম ভালো করে দেখতে গেলে আধা দিবসেও পারা যাবে কিনা সন্দেহ। প্রচণ্ড ভিড়। হলোকস্ট মিউজিয়ামের যে ধরনের প্রচার আছে,

www.pathagar.com

তাতে সবাই একবার দেখতে যায় বলে আমার ধারণা। আর ইহুদীদের তো কথাই নেই। সিনাগগের চেয়েও হলোকস্ট মিউজিয়ামের প্রতি আকর্ষণ তাদের বেশি হতে পারে। মিউজিয়ামের কয়েকটি সেকশন আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। আমার মনে হলো বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে মিউজিয়ামটি সাজানো হয়েছে। এমন চিন্তা মনে আসতেই একটা নিউজ আইটেমের কথা আমার মনে পড়লো। নিউজটি ছাপা হয়েছিলো সউদি আরবের ইংরেজি দৈনিক আরব নিউজে। নিউজটায় বলা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিস্টোরিক্যাল ফাউন্ডেশন (যতদুর মনে পড়ে) নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। প্রতিষ্ঠানটি যাচাই করতে চেয়েছিল আসলেই হিটলারের জার্মানীতে কত ইহুদী কাদের দ্বারা কিভাবে মারা গিয়েছিলো। তারা এ লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞাপন প্রচার করে। জার্মানীতে ইহুদী হত্যা সম্পর্কিত কোথায়ও কোনো অজানা তথ্য থাকলে তা সংস্থার কাছে সরবরাহ করার অনুরোধ জানানো হয়। তথ্য দাতাদের জন্য তারা বড় ধরনের পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলো। এছাড়া তারা পূর্বাপর তথ্য সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলো। এইভাবে বহু তথ্য তারা সংগ্রহ করে। তারা মনে করছিলো ইহুদী নিধনের প্রচারিত সংখ্যা ও কাহিনী ভুয়া প্রতিপন্ন হবে। কিন্তু সত্য উদঘাটনের আশা তাদের সফল হয়নি। একদিন সকালে উঠে মানুষ দেখলো সংস্থার অফিসটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ধুলো হয়ে গেছে। সংগৃহীত তথ্য প্রমাণাদিসহ বিল্ডিংটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিস্ফোরণের দিন সংস্থার প্রধান ওয়াশিংটনে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি অফিসের ধ্বংসস্তূপ দেখতে এলেন। ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে তিনি কেঁদে কেঁদে বলেছিলেন, হে আমেরিকানরা তোমরা কাঁদো। আসলেই তোমরা স্বাধীন নও।' এই নিউজে জার্মানীতে ইহুদী নিধন সম্পর্কে যে সন্দেহের প্রশ্ন ওঠেছে, অনুরূপ গুঞ্জন রয়েছে। নানাভাবে নানরকম কথা বলা হয়ে থাকে, কিন্তু সন্দেহ নিরসন বা সত্য উদঘাটনে উপযুক্ত উদ্যোগ দেখা যায়নি। হয়তো সামনে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হতে পারে, জানি না।

হলোকস্ট মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আমরা অরলিংটন সমাধিক্ষেত্রের দিকে এগোলাম। এর আগেও একদিন আমরা অরলিংটন সমাধিক্ষেত্রে গিয়েছিলাম। সময় কম ছিল বলে সমাধিক্ষেত্রটা ঘুরেঘুরে দেখা হয়নি। আখতার হোসেন সাহেবের উৎসাহে একটু সময় নিয়ে আমরা সমাধিক্ষেত্রটি দেখতে আগ্রহী হলাম। পটোম্যাক নদীর ব্রীজ পার হয়ে পেন্টাগনকে ডানে রেখে আমরা সামনে কিছু দূর এগিয়ে অরলিংটন সমাধিক্ষেত্রে পৌঁছলাম। সমাধিক্ষেত্রটি আমরা ঘুরে ঘুরে

www.pathagar.com

দেখলাম। মনে হয় কয়েক বর্গমাইল এলাকা নিয়ে গড়ে ওঠেছে জাতীয় সমাধিক্ষেত্র। ভার্জিনিয়ার এই উঁচু-নীচু এলাকা দেখতে খুবই সুন্দর। সবুজ ঘাসে ঢাকা। বৃক্ষশোভিত উঁচু-নীচু সবুজ মাঠে সমাধির ফলকগুলো সাদা ফুলের মতো লাগছে। একটা এলাকা দেখা গেল অজানা সৈনিকদের জন্য নিবেদিত। কেনেডির সমাধি দেখলাম। সেখানে কেনেডির স্ত্রী, ভাই ও মেয়ের সমাধি রয়েছে। কোনো প্রকার স্থাপনা ছাড়া এই সমাধিগুলো খুব সাধারণ হয়েও অসাধারণ। অসাধারণ না হলে সমাধিক্ষেত্রে এত মানুষের ভিড় হবে কেন! শিশু-কিশোর, তরুণদের ভিড়ই বেশি। তাদের চোখে-মুখে একটা গর্বের ভাবও। তরুণ আমেরিকানদের এই গর্বই সমাধিক্ষেত্রকে আরো অসাধারণ করে তুলেছে।

অরলিংটনের পরে আমরা এলাম জেফারসন মেমোরিয়ালে। টমাস জেফারসন আমেরিকার তৃতীয় প্রেসিডেন্ট। তিনি শুধু সংবিধান রচয়িতাদের একজনই নন, সংবিধানের খসড়া প্রণেতাও তিনি। টমাস জেফারসনের মেমোরিয়ালটি বলা যায় মেমোরিয়ালগুলোর সর্বদক্ষিণে। জেফারসন মেমোরিয়ালে ঢুকে আমার প্রথম যে কথাটি মনে পড়ল তা হলো মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে টমাস জেফারসনকে একজন দার্শনিক বলে মনে করা হয়। তার রাজনৈতিক দর্শন, মানবিক দর্শন গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য দিক-নির্দেশিকা হতে পারে। মার্কিন সংবিধানে 'Seperation of Church and State' এর 'Seperation' শব্দটি টমাস জেফারসনের একটি চিঠিতে প্রথম ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটি পরে সংবিধানে Church and State এর পৃথকিকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তাই বলে টমাস জেফারসন সমাজে, রাষ্ট্রে ধর্মের ভূমিকা নেই বা থাকা উচিত নয় মনে করতেন না। বলা হয়েছে 'জুদিও-খৃস্টান ঐতিহ্যের ব্যাপক নীতি সমৃদ্ধ আমাদের ধর্ম এমন একটা ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে যার ওপর মার্কিন ডেমোক্রাসি এবং রিপাবলিকান গভর্নমেন্টের সৌধ বিনির্মিত। টমাস জেফারসন, বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনসহ ফাউন্ডার ফাদারদের সকলেই এটা বিশ্বাস করতেন। তবে তারা মনে করতেন চার্চ যদি রাজনীতিতে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে তাহলে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষায় ধর্মের যে মৌল ভূমিকা তা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (N. J. Demerath & Rhys H. Williaum, 'Society', January- February, 1989') এই মন্তব্যের কোনো কোনো কথা নিয়ে দ্বি-মতের অবকাশ হয়তো আছে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডার ফাদারদের ধর্মের প্রতি ভালবাসার দিকটা এবং রাষ্ট্র, সমাজ

www.pathagar.com

ও মানুষের প্রয়োজনেই ধর্মের অপরিহার্য ভূমিকার বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।
জেফারসন মেমোরিয়ালে গিয়ে আরেকটি মজার বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ওয়াশিংটন মনুমেন্ট, লিংকন মেমোরিয়াল, জেফারসন মেমোরিয়াল, ভিয়েতনাম মেমোরিয়াল, জাদুঘরগুলো, হোয়াইট হাউস ও পার্লামেন্ট ভবন একই এলাকায় এমনভাবে সাজানো যে সেখানে গেলেই যে কোনো মানুষ ফিরে যায় আমেরিকার ইতিহাসে, দেখতে পায় আমেরিকাকে। পার্লামেন্ট ভবন, হোয়াইট হাউস, ওয়াশিংটন মনুমেন্ট এবং মেমোরিয়ালগুলো ঘুরে দেখার পর আমার এমনটাই মনে হয়েছে।
এই দর্শনীয় এলাকা দেখে আমরা যখন রাস্তায় নেমে এলাম তখন আমরা সবাই ক্লান্ত। ড. মুস্তাফিজ বলেই ফেললেন আমি ক্লান্ত, হোটেলে ফিরে চলুন। ঘুরাফেরার মধ্যে আমরা খেয়েছি কম না। হলোকস্ট মিউজিয়াম থেকে বের হবার পর একজন ভিয়েতনামীর রোডসাইড দোকানে বেশ বড় রকমের ক্যান্ডি ও জুস খেয়েছিলাম। এইভাবে আমরা খেয়েছি যথেষ্ট।
ভিয়েতনামীর ওখানে মজার একটি ঘটনা ঘটেছিল। আমার গায়ে ছিল গলাবন্ধ কোট। ভিয়েতনামী মহিলাটি খুশি হয়ে বললো এটা হোচিমিন-এর কোট। আপনারাও পরেন? আমি বললাম, 'আমাদের উপমহাদেশে বিশেষ করে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে বহু আগে থেকেই এ কোটের প্রচলন আছে।' আমরা ঐ দিকের মানুষ জেনে সে তার নিজের পরিচয় দিতে আগ্রহী হয়। সে তিন বছর হলো আমেরিকায় এসেছে, কাজের সন্ধানে। তবে সে এ দেশে থাকবে না, ভিয়েতনামেই আবার ফিরে যাবে। দেখলাম তার চোখে-মুখে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল প্রকাশ। খুশি হলাম। দরিদ্র হলেও সে ভিয়েতনামের একজন যোগ্য প্রতিনিধি। ফেরার পথে আমরা একটা পাকিস্তানী রেস্টুরেন্টে নাস্তা করলাম। আলুবারগার ও জুস দিয়ে। পেট ভরে গেল। কিন্তু এরপরও আমাদের ক্লান্তি কাটল না। আসলে আমরা অনেক হেঁটেছি। মাইলের হিসেব কষলে ক্লান্তি আরো বাড়বে।
হোটেলে ফিরলাম বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম সাড়ে সাত'টায়। বিশ্রাম নেয়ার মতো বেশ সময় হাতে পাওয়া গেল। আমরা হোটেলে এসেই আখতার হোসাইন সাহেবের সাথে কথা বলেছিলাম। তিনি আমাদেরকে সাড়ে সাত'টার প্রোগ্রামে নিয়ে যাবেন। তিনি ঠিক সময় গাড়ি নিয়ে আমাদের হোটেলে এলেন। আমরা প্রোগ্রাম স্থলে পৌঁছলাম সময়ের আগেই।

www.pathagar.com

প্রোগ্রামটা ছিল একটা গেট টুগেদার, তার সাথে খাওয়া-দাওয়া। একটা রেস্টুরেন্টে এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথমেই আমাদের খাওয়া-দাওয়ার পালা। খাওয়ার পর আমরা এক সঙ্গে বসলাম। আমরা নয় জন। আমি ছাড়া আট জনই বাংলাদেশের আমেরিকা প্রবাসী। পরিচয়ের মাধ্যমে দেখলাম সকলেই আমেরিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বড় বড় চাকরি করেন। তাদেরকে বাংলাদেশের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী মনে হলো। বিশেষ করে ইসলামের ব্যাপারে আমেরিকান মুসলমানদের কি করণীয় এই বিষয়ে সকলের মধ্যে একটা সাধারণ আবেগ লক্ষ করলাম। এই প্রসঙ্গেই আমাকে বেশি কথা বলতে হলো। আমি বললাম, এই করণীয় ব্যাপারটা খুবই পুরানো একটি বিষয়। আমাদের গোটা ইতিহাসে এর জবাব ছড়িয়ে আছে। আল্লাহ যেমন বিশ্ব জাহানের মালিক, তেমনি ইসলাম বিশ্বজনীন একটি ধর্ম। এর কোনো দেশ বা ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। এই ধর্ম সব সময়ের, সব মানুষের, সব দেশের। তাই প্রাথমিক যুগ থেকে মুসলমানরা যখন যে দেশেই গেছে সেই দেশকে আপন করে নিয়েছে। সে দেশের মানুষকে একান্ত আপন ভেবেছে। ধর্মীয় ক্ষেত্রের কিছু রসম রেওয়াজ ছাড়া সে দেশের দেশজ কালচারকেও মুসলমানরা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। এটাই ইসলামের আদর্শ এবং মুসলমানদের চরিত্র। আমেরিকায় যারা এসেছেন তাদের জন্য এই ইতিহাসই আদর্শ। যে দেশে আপনারা আবাস স্থাপন করেছেন সেই দেশকে ভালবাসতে হবে, তার জনগণকে আপন করে নিতে হবে এবং অন্য কোনো ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন দেশজ কালচারকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে হবে। এভাবে যুক্ত হয়ে যেতে হবে দেশের মেইন স্ট্রিমের সাথে। আপনাদের আচার-ব্যবহার, আপনাদের চরিত্র, আপনাদের আদর্শ সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেবার এটাই উপায়। এটাই ইসলামের কাজ। বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের দেয়া নেয়ার মধ্য দিয়ে সেখানে ইসলামী সমাজ গড়ে ওঠেছে। নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশ থেকে এর উদাহরণ নিতে পারেন। হিমালয়ান উপমহাদেশে আট'শ বছরের মুসলিম শাসনের কেন্দ্র ছিল দিল্লী। দিল্লী থেকে সবচেয়ে দূরের অবস্থান বাংলাদেশের। সেই বাংলাদেশে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। এটা ইসলামের মানবিকতা এবং মুসলমানদের সেখানকার জনগণের সাথে একাত্মতা, সহমর্মিতা ও দেয়া নেয়ারই ফল। ইসলামী দাওয়াতের সবচেয়ে সুন্দর কাজ প্রকৃতপক্ষে এটাই। বাংলাদেশের প্রতি তাদের দায়িত্বের কথাও ওঠলো। আমি বললাম, বাংলাদেশের জন্য কিছু ভাবা,

www.pathagar.com

কিছু করা আপনাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। এই কর্তব্যবোধ দুনিয়ার সব মানুষ, সব ভাইদের জন্যেও থাকবে। কিন্তু বিশেষ করে থাকবে নিজের জন্মভূমি এবং স্বজনদের আবাসভূমি বাংলাদেশের জন্য। কারণ এদেশকে আল্লাহ আপনার জন্মের জন্যে মনোনীত করেছিলেন সুতরাং জন্মভূমির জন্যে একটা বিশেষ দায়িত্ব থাকবেই। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের সাথে আরো কথা হলো। খুবই ভালো লাগল গেট-টুগেদারের এই ছোট্ট অনুষ্ঠান যখন হোটেলে ফিরলাম রাত তখন এগারটা। এই অনুষ্ঠানে ড. মুস্তাফিজ যেতে পারেননি। শরীরটা ভালো না লাগায়। তিনি হোটেলেই শুয়েছিলেন।

আজ ওয়াশিংটন ছাড়ার দিন। যাবো আমরা কলরোডা স্টেটের ডেনভারে। ডেনভার নামের সাথে আমি স্কুল জীবন থেকে পরিচিত। তখন সপ্তম কিংবা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। আধুনিক নারী স্বাধীনতার স্বরূপ নামে একটা ধারাবাহিক প্রবন্ধ ছাপা হচ্ছিল 'তর্জমানুল হাদিস' নামক ম্যাগাজিনে। প্রবন্ধটি আগ্রহের সাথে পড়েছিলাম। এই প্রবন্ধে 'ডেনভার'-এর একটা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ মেলা-মেশার কুফলের উপর পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছিল। পরিসংখ্যান ছিল গভীর অনুসন্ধানি ও খুবই মূল্যবান। পরবর্তি জীবনে ডেনভার স্কুলের এই পরিসংখ্যানটি বার বার আমি উল্লেখ করেছি বিভিন্ন লেখা ও আলোচনায়। তাই ডেনভার নামটা আমার খুব প্রিয় ও পরিচিত। সেই ডেনভারে আমি যাচ্ছি। এটা আমার জন্যে বাড়তি আগ্রহের।

সকালে ওঠে ডেনভারের জন্যে ব্যাগ ব্যাগেজ বাঁধলাম। আট'টায় গিয়ে বাইরে থেকে নাস্তা করে এলাম। সাড়ে নয়'টায় চেকআউট করে লবিতে নেমে এলাম। হোটেলে বিল পরিশোধ করলাম কাউন্টারে গিয়ে। আমাকে দিতে হলো চারশ এক ডলার। মোস্তাফিজ সাহেবের বিল হয়েছিল তিনশ পঁচাশি ডলার।

ব্রিফিং এর দিনই সফরের হোস্ট কর্তৃপক্ষ সফরের যাবতীয় খরচ আমাদের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে যাবার পরিবহণ ব্যবস্থা তাদের হাতে ছিল। এই ব্যবস্থাকে আমরা ভালো মনে করেছি। আর এই ব্যবস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্যক্তি স্বাধীনতা' তত্ত্বেরও পরিপূরক। ব্যক্তি তার নিজস্ব রুচি ও প্রয়োজনানুসারে খরচ করতে পারবে এটাই সবসময় ব্যক্তির আন্তরিক চাওয়া।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৩

ওয়াশিংটনের ডালেস এয়ারপোর্টে প্লেনে চড়লাম সাড়ে বার'টায়। ডেনভার ওয়াশিংটন থেকে পশ্চিমে, বলা যায় পশ্চিম প্রান্তে, রকি পর্বতমালার পূর্বঢালে। চার ঘন্টা উড়ে কলরাডো স্টেটের রাজধানী ডেনভারে এসে পৌঁছলাম। সেখানকার স্থানীয় সময় বেলা দু'টায়। নামলাম ডেনভার এয়াপোর্টে। বিশাল এয়ারপোর্ট ডেনভার। প্লেনে থেকেই ডেনভার এলাকা দেখলাম। ডেনভার থেকে কিছু পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণ বিলম্বিত রকি পর্বতমালার সুন্দর দেয়াল। ওয়াশিংটন এলাকা অর্থাৎ আমেরিকার পূর্ব এলাকা থেকে ডেনভার এলাকার দৃশ্য একদমই ভিন্ন। ওয়াশিংটনের মতো পূর্ব এলাকায় গাছ-গাছরা ও বন-জঙ্গলের আধিক্যে চোখ বেশি দূর চলে না, দিগন্ত দেখা যায় না। কিন্তু ডেনভার অবারিত মুক্ত এলাকা। মাঝে মাঝে ছোট এবং শীর্ণ গাছপালা। রকি পর্বতমালার পাদদেশে বলেই হয়তো ডেনভার এলাকার পার্বত্য চরিত্রটাই মুখ্য। তাই বলে ডেনভার কিন্তু কেনো দিক দিয়েই খাটো নয়। এটা ভাবতে গিয়ে কলরাডো স্টেটের রাজধানী ডেনভারের উজ্জ্বল প্রোফাইল আমার সামনে এলো। গুরুত্বের দিক দিয়ে ওয়াশিংটনের পরে ডেনভারের স্থান। দ্রুত বর্ধনশীল ডেনভার রকি পর্বত অঞ্চলের অর্থনৈতিক, শিল্পোৎপাদন, গবেষণা, বিতরণ ব্যবস্থা এবং যোগাযোগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। রকি অঞ্চলের গ্রীষ্ম ও শীতের বিনোদন কেন্দ্রগুলোর প্রবেশ পথও এই ডেনভার। ডেনভার বছরের ৩৬৫ দিনে ৩১০ দিনই সূর্যের মুখ দেখে। এই অবস্থা শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় সব ক্ষেত্রের জন্যই ইতিবাচক একটা দিক। কলরাডোর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, তিন মিলিয়ন, বাস করে এই ডেনভারে। জাতীয়ও আঞ্চলিক পর্যায়ের অনেক সংস্থার হেডঅফিস ডেনভারে। জনবৈচিত্রের দিক থেকেও ডেনভার যেন গোটা আমেরিকার প্রতিনিধিত্ব করে। ডেনভারে বিশাল হিসপানিক জনগোষ্ঠীসহ সত্তরটি এথনিক গ্রুপের বসতি। অন্যদিকে ডেনভার অঞ্চল পর্বত পাদদেশের উসর অঞ্চল বলে মনে হলেও গোটা দেশের জন্য অর্থনৈতিক আকর্ষণের কেন্দ্রও বটে। শুনলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম এলাকা থেকে মানুষ এই অঞ্চলের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে। জিনিস-পত্রের দাম কম। কাজও এখানে সহজলভ্য।

www.pathagar.com

এয়ারপোর্টের বাইরে এসে চমকে ওঠার পালা। হাল্কা বৃষ্টি হচ্ছে। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের দুই ডিগ্রি নিচে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে এমন অবস্থার মুখোমুখি হলাম এই প্রথম। যখন ওয়াশিংটনে আমরা প্লেনে উঠি তখনও ডেনভারের এমন আবহাওয়ার কথা বলা হয়নি। হঠাৎ করে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে। এমনটাই নাকি ঘটে থাকে।

আমরা হোটেলে এলাম। কোর্টিস স্ট্রিটে 'এগজিকিউটিভ টাওয়ার ইন' হোটেল। আমাদের হোস্ট ইনিস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এর ডেনভার অফিস আগেই হোটেলে আমাদের জন্য রুম রিজার্ভ করে রেখেছে। হোটেলে উঠে কাপড়-চোপড় ছেড়ে একটু ফ্রেস হলাম। ইরউইন কার্ন আগেই আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। সাড়ে চারটায় আমাদের প্রোগ্রাম। সুতরাং রেস্টের জন্য বেশি সময় আমরা পাচ্ছি না। চার'টায় প্রোগ্রামে উপস্থিত হতে হলে আড়াই থেকে তিন'টার মধ্যে আমাদের বের হতে হবে।

প্রোগ্রামটা ডিনারের। ডেনভার মুসলিম এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মি. আজিজ এত্তেদা আমাদেরকে দাওয়াত করেছেন তার বাসায়। খাওয়াদাওয়া হবে তার সাথে কথাবার্তাও। ইরউইন কার্ন সেখানে যাবেন না। আমাদের একাই যেতে হবে। আমরা বের হলাম। ওয়েদার তখন আগের চেয়ে একটু ভালো। মি. ইরউইন কার্ন আমাদের গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন। মি. আজিজ ইত্তেদার বাড়ি শহরের প্রান্তে, বেশ দূরে। পঁচিশ ডলার ভাড়া লাগল। বেশ খুঁজেই মি. ইত্তেদার বাড়ি বের করা হলো। ভদ্রলোক আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ি থেকে নামতেই স্বাগত জানালেন তিনি আমাদের। বয়সে তরুণ। মরক্কোর অধিবাসি ছিলেন। এখন আমেরিকার। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। গত বছর তিনি হজ্ব করেছেন। প্রাথমিক পরিচয়ের পর আমরা আলাপ-আলোচনায় এসব জেনে নিলাম। তিনি আরো কয়েকজনকে দাওয়াত করেছেন। তাদের মধ্যে দু'জন বাংলাদেশী। একজন নজরুল হাসান। তিনি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। আরেকজন সাজ্জাদ রেজা। তিনিও ইঞ্জিনিয়ার। প্রথমেই কথা ওঠলো খৃস্টান-মুসলমানদের সম্পর্ক নিয়ে। তিনি বললেন, সম্পর্ক আমাদের এমনিতেই ভালো। মাঝে মাঝে সমস্যা সৃষ্টি হয় মিডিয়ার একপেশে প্রচারণার কারণে। তিনি জানালেন, পারস্পরিক জানাজানি বাড়ানোর মাধ্যমে আমরা এর মোকাবিলার চেষ্টা করছি। তার কাছ থেকে আরো জানা গেল। কলরাডো স্টেটটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় মধ্যবর্তী এলাকা হলেও এই রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ত্রিশ হাজার। ত্রিশ লাখ

www.pathagar.com

অধিবাসীর মধ্যে ত্রিশ হাজার খুব কম না। আর ডেনভারে বাস করে দশ হাজার। আমি বললাম, ১৯৮৬ সালের হিসাবে এখানে মসজিদের সংখ্যা ছিল আট। এখন সংখ্যা কত হতে পারে। তিনি বললেন, সংখ্যা এখন প্রায় ডবলের মতো হবে। আমি বললাম, ওয়াশিংটনের যে জনসংখ্যা তার অনুপাতে সেখানে মসজিদের যে সংখ্যা সেই অনুপাতে আপনাদের ডেনভারের অবস্থা অনেক ভালো। ডিনারের ডাক পড়ল। স্বয়ং আজিজ ইত্তেদার স্ত্রী এসে ডিনার রেডি হওয়ার কথা বললেন এবং ডিনারে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। স্বাভাবিক হিজাব পরিহিতা মহিলা। আমরা গিয়ে ডিনারে বসলাম। আজিজ ইত্তেদার স্ত্রী পরিবেশন করলেন। ডিনারে আমেরিকানের চেয়ে আরবীয় মেন্যুই বেশি। অনেক মেন্যু একদমই আমাদের অপরিচিত। বললাম, খাওয়ার চেয়ে মেন্যুই আমাদেরকে আনন্দিত করছে বেশি। যেসব খাবারের নামও শুনিনি তা চোখে দেখলাম। খাওয়া শেষে আবার এসে আমরা বসলাম। আবার কথা শুরু হলো, অনেক বিষয়ে কথা। তারা উদ্বেগ প্রকাশ করলেন তাদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে। বললেন, পারিবারিকভাবে যেটুকু ধর্ম শিক্ষা দেয়া যায় সেটুকুই ভরসা। আমি বললাম, সেকেন্ড জেনারেশনে গিয়ে সংকট তো আরো বেশি ঘনিভূত হবে। আপনারা যেটুকু ইসলামি বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারছেন সেকেন্ড জেনারেশন সেটুকুও করতে পারবে না। তারা বললেন, এটাই হবে বড় সংকট। আমি বললাম, পাবলিক স্কুলগুলোতে ধর্ম শিক্ষা না থাকা থেকেই এই সংকট। সংখ্যাগুরু খৃস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষে ধর্ম শিক্ষার প্রাইভেট স্কুল স্থাপন করে সংকটের মোকাবিলা করা সম্ভব। কিন্তু সংখ্যালঘুদের জন্য এই সুযোগের ব্যবস্থা করা অনেক জায়গাতেই সম্ভব নয়। তবুও এই চেষ্টাই করতে হবে। সানডে স্কুলের মতো কমিউনিটি স্কুল প্রতিষ্ঠাই সংকট মোকাবিলার উপায়। এ নিয়ে আরো আলোচনা হলো। এক সময় আমরা বিদায় নিতে চাইলাম। আবদুল আজিজ ইত্তেদা কষ্ট করে আসার জন্য আমাদের শুকরিয়া আদায় করলেন। আমরা সুন্দর ডিনার ও সুন্দর আলোচনার সুযোগ দেয়ার জন্য ধন্যবাদ দিলাম। হোটেলে পৌঁছতে আমাদের দশ'টা বেজে গেল।

ডেনভার আমাদের কছে ওয়াশিংটনের চেয়ে বেশি অপরিচিত লাগলো। ওয়াশিংটনে অবস্থান অনেকটা খোলামেলা ছিল। যেন আগে থেকেই চেনাজানা। ইরউইন কার্নেরও, মনে হলো, আমাদেরই মতো অবস্থা। তারও পরিচয়ের সীমা খুব বেশি নয়।

www.pathagar.com

ডেনভারে আমাদের দ্বিতীয় দিন। সকালের নাস্তা আমরা করলাম হোটেলের নীচতলায় হোটেলের রেস্টুরেন্টে। হালাল খুঁজতে যেয়ে আমরা আলু ডিম ও টোস্ট দিয়ে নাস্তা করলাম। সাড়ে দশটায় প্রোগ্রাম 'কলরাডো কাউন্সিল অব চার্চেস' এর সাথে। আবহাওয়াটা ভালো ছিল। আমরা ঠিক সাড়ে দশটায় কাউন্সিল অব চার্চেস অফিসে পৌঁছলাম। কাউন্সিল অব চার্চেস এর প্রধান রেভারেন্ড লুসিয়া গুজম্যান মনে হয় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে তার অফিসে বসালেন। তিনি নিজেই চেয়ার টেনে বসতে দিলেন। আবার নিজেই চা তৈরি করে এনে আমাদের পরিবেশন করলেন। অথচ পাশের রুমেই তার সহকর্মিরা কাজ করছেন। আমি বিস্মিত হলাম। দেশে দেশে মানুষে মানুষে কত পার্থক্য। আমাদের দেশে একজন সংস্থা প্রধানের আশে-পাশে লোকদের ঘুর ঘুর করতে হয়। অধস্তনদের সেবা পাওয়া তার যেনো অধিকার। অথচ এখানে একজন সংস্থা প্রধান নিজের হাতে চা করে এনে মেহমানদের খাওয়াচ্ছেন। এ দৃশ্য আমাদের দেশে অকল্পনীয়। অথচ এখানে আমি একটা সহজ দৃশ্য হিসাবে এটা দেখলাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরো অনেক জায়গায় আমি এটা দেখেছি। চায়ের পর আমাদের পরিচয় পর্ব শেষে আলোচনা শুরু হলো। রেভারেন্ড লুসিয়া গুজম্যান তার সংস্থার পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, একমাত্র ইভানজেলিক্যালরা ছাড়া ক্যাথলিকসহ সব চার্চই তার কাউন্সিলে ঐক্যবদ্ধ। তিনি বললেন, তার কাউন্সিল চার্চের সাধারণ কাজ ছাড়াও জেলের কয়েদি, বিভিন্ন অপরাধে যুক্ত লোকজন এবং অনগ্রসরদের মধ্যে বিশেষভাবে কাজ করছে। মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খুব ভালো। মুসলিম সংস্থা, সংগঠনের সাথে তাদের যোগাযোগ আছে। তিনি জানালেন, ওকলাহোমার ঘটনার পর যখন মুসলমানদের ওপর নানা রকম হুমকি আসছিলো, তখন তিনি নিজে মুসলিম নেতাদের বাসায় গেছেন। খৃস্টান নেতৃবৃন্দের সাথেও তিনি দেখা করেছেন এবং কোনো অপ্রীতিকর কিছু ডেনভারে না ঘটে এব্যাপারে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানালাম। সবাই যদি এভাবে শান্তি ও সমঝোতার জন্যে কাজ করেন, তাহলে কোনো ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে না। যারা অশান্তি ও বৈরিতা সৃষ্টি করতে চায় তাদেরকে চিহ্নিত করা এবং অন্যায় অশান্তির কাজ থেকে তাদের বিরত রাখা সহজ হয়।

তাদের কাউন্সিলের কাজ সম্বন্ধে তিনি আমাদের আরো জানালেন, তাদের চার্চগুলো প্রার্থনা এবং বিভিন্ন ধরনের স্কুল পরিচালনা করে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, চার্চ মেম্বারদের সংখ্যা কমছে এবং নন-রিলিজাস মানুষের সংখ্যা

www.pathagar.com

বাড়ছে। আরেকটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম শিক্ষা না থাকা এবং সেকুলারিজম কার্যত নানাভাবে সহায়তা পাওয়ার কারণে মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং সমাজে ধর্মের প্রভাব কমছে। আমি বললাম, এক হিসেবে বলা হয়েছে চার্চে যাওয়ার মানুষের সংখ্যা ১৯৯০ সালে ছিল শতকরা ছাপ্পান্ন, ১৯৯১ সালে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে শতকরা আটান্ন ভাগে। এতে দেখা যাচ্চে চার্চে যাওয়ার মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। তাছাড়া খৃস্ট এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী লোকের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের সংখ্যা বলা হয়েছে শতকরা চুরাশি। রেভারেন্ড গুজম্যান এ প্রসঙ্গে বললেন, মেইন লাইন চার্চের প্রতি মানুষের সমর্থন কমছে। তবে অন্যান্য কিছু চার্চের প্রতি সমর্থন বাড়ছে। কোনো চার্চের অধীন নয় এমন লোকের সংখ্যাও বাড়তে দেখা যাচ্ছে। চার্চ ও রাজনীতির সম্পর্ক নিয়েও কথা ওঠলো। তিনি বললেন, রাজনীতি একটি বাস্তবতা। তবে রাজনীতির সাথে চার্চের সম্পৃক্ত হবার ধরনটা সেকুলার রাজনীতিকের মতো হওয়া উচিত নয়।

রেভারেন্ড লুসিয়া গুজম্যান এর সারল্য ও ধার্মিকতায় খুব খুশি হলাম। চার্চের প্রভাব কমছে, চার্চ সমর্থন হারাচ্ছে একথা তিনি অকপটেই বললেন। তবে তিনি থার্ড মিলিনিয়ামের ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানালেন। তিনি বললেন, থার্ড মিলিনিয়ামে ধর্মের পুনরুত্থান ঘটতে যাচ্ছে।

এক সময় আলোচনার ইতি টানতে হলো। আমরা বিদায় চাইলাম। তিনি বিদায় দিলেন না। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তিনি নিজে ড্রাইভ করে আমাদেরকে ইসলামিক সেন্টারে পৌঁছে দিলেন। খুব খুশি হলাম আমরা। সেখানে ট্যাক্সি পাওয়া কঠিন ছিল। কঠিনটাকে তিনি সহজ করে দিলেন। আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম এই ডেনভার ইসলামিক সেন্টারেই।

ডেনভার ইসলামিক সেন্টারের অফিস বিল্ডিংটি বিরাট। অনেকটা বহুমুখী কমপ্লেক্সের মতো। এলাকাও বিশাল। কিন্তু আমরা হতাশ হলাম কাউকে না দেখে। কোথা দিয়ে কিভাবে অফিসে ঢুকবো সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। যার সাথে আমাদের অ্যাপোয়েন্টমেন্ট ছিল সেই জালালুদ্দিন খান পৌঁছলেন পনের মিনিট পর। তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, তার মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে গিয়েই এই বিপত্তিটা ঘটেছে। তিনি আমাদের তার সেন্টারের অফিসে নিয়ে বসালেন। তার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে অনেক কথা হলো। তিনি দেড় বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। পাকিস্তানের লোক তিনি। পিএইচডি করেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসে। সেন্টারের কাজ সম্পর্কে তিনি বললেন, একটা মসজিদ, একটা

www.pathagar.com

সানডে স্কুল এবং একটা লাইব্রেরি রয়েছে সেন্টারে। তিনি জানালেন, মুসলমানদের জন্য আরো একটা পূর্ণাঙ্গ স্কুল রয়েছে ডেনভারে। স্কুলটি নিজস্ব জমিতে। স্কুল বিল্ডিংটি তার নিজেরই করা। স্কুলের জন্য এক ব্যক্তি একাই দান করেছেন তিন লাখ ডলার। আমরা ভেবে খুশি হলাম যে ডেনভারের মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ, আগ্রহী ও নিজেদের ব্যাপারে খুব সচেতন না হলে এই এতো বড় কাজ তারা করতে পারতেন না। জালালুদ্দিন সাহেব খুবই সন্তোষ প্রকাশ করলেন যে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন, যা এমনকি অনেক মুসলিম দেশেও সম্ভব নয়। তিনি বললেন, গত চার-পাঁচ বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মের প্রভাব বাড়ছে।

কলরাডো মুসলিম সোসাইটি এই ইসলামিক সেন্টার ও স্কুল পরিচালনা করে থাকে। গত রাতে আমরা যার বাসায় ডিনার খেয়েছি, সেই মিঃ আজিজ ইত্তেদা কলরাডো মুসলিম সোসাইটির প্রেসিডেন্ট। আমাদের বিদায় নেয়ার সময় হলো। স্থানটা শহরের এক প্রান্তে বলে এখানে দেখলাম ট্যাক্সি পাওয়া মুসকিল। মিঃ ইরউইন কার্ন টেলিফোন করে একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলেন। আমরা বিদায় নিয়ে কলরাডো ইসলামিক সেন্টার থেকে চলে এলাম। ফেরার পথে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে মাছ ও ভাত মেশানো সালাদ খেয়ে লাঞ্চের কাজ সারলাম। হোটেলে খাওয়ার জন্য পানি ও জুস কিনে নিয়ে এলাম।

বিকালে কোনো প্রোগ্রাম ছিল না, ছিল ডিনারের একটা দাওয়াত। ফেরদৌস খানের ছেলে মুহাম্মদ এন খান আমাদের ডিনারের দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাদের বাড়ির পাশেই একটা রেস্টুরেন্টে ডিনারের ব্যবস্থা হয়েছিল। মিঃ খান এবং তার স্ত্রী সারোজ আই খান ডিনার অনুষ্ঠানে আমাদের স্বাগত জানালেন। মিঃ খান কলরাডো সরকারের একজন হাইড্রোলজিস্ট। এবং তার স্ত্রী সারোজ আই খান পিএইচডি করেছেন এবং এখন তিনি কলরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর এসিস্টেন্ট প্রফেসর। ডিনারের পর আমরা তাদের বাসায় গেলাম। সেখানে নামায পড়লাম। অন্তরঙ্গ পরিবেশে অনেক আলাপ আলোচনাও হলো। আবহাওয়াটা সেদিন খারাপ ছিল। আলোচনায় ছেদ টেনে তাড়াতাড়ি বের হতে হলো। বাইরে কুয়াশার মতো এক ধরনের বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যেই আমরা হোটেলে ফিরলাম।

একুশে মে কলরাডো এসেছি। আজ মে'র ২৩ তারিখ। এর মধ্যে আমাদের হোস্ট কর্তৃপক্ষের কারো সাথে আমাদের দেখা হয়নি। আমাদের হোস্ট

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন এর একটি অফিস ডেনভারে রয়েছে। আজ ঐ অফিস থেকে কেউ আসবেন এবং আমাদেরকে কলরাডো খৃস্টান ইউনিভার্সিটিতে নিয়ে যাবেন। ঠিক দশটার সময়ে ইনিস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন (IIE) এর প্রতিনিধি আমাদের হোটেলে এলেন। তার সঙ্গে পরিচয় হলো। তার স্বামী ডেনভারের একজন জাজ। কলরাডো খৃস্টান ইউনিভার্সিটিতে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডক্টর জেন মারলো তার অফিস করিডোরে আমাদের স্বাগত জানালেন। তার সাথে ছিলেন হিউম্যানিটিস, বিজ্ঞান ও দর্শনের ডিন ডক্টর স্ট্যান দায়েক, থিয়োলজি ও বাইব্লিক্যাল স্টাডিজ এর অধ্যাপক ডেভিড উইলিয়ামস এবং ডক্টর কাহীল। সবাই আমরা ডক্টর জেন মারলো'র অফিসে বসলাম। পরিচয়ের মধ্য দিয়ে আলোচনা শুরু হলো। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানলাম, বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রটেস্ট্যান্ট গ্রুপের। প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যেও অনেক গ্রুপ আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কোনো গ্রুপের নয়। আলোচনা প্রসঙ্গে আমি বললাম, এক সমীক্ষায় দেখেছি ৬৯% আমেরিকানরা চায় তাদের সন্তানরা ধর্ম শিক্ষা পাক। দেশের খৃস্টান বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল দেশের কত পার্সেন্ট শিক্ষার্থীর ধর্ম শিক্ষা দিতে পারছে, এই প্রশ্নের জবাবে তারা জানালেন, এই হিসাব তাদের জানা নেই। তবে সেটা খুব কম হবে এটা তারা স্বীকার করলেন। খৃস্টান সানডে স্কুল, কলেজ ইত্যাদির সাথে খৃস্টান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা এটা জানতে চাইলে কোনো সম্পর্ক নেই বলে তারা জানান। খৃস্টানদের ডে টুডে লাইফে খৃস্ট ধর্মের কোনো আচার-অনুষ্ঠানগত কোনো উপস্থিতি নেই, এই শূন্যতা দূর করার জন্য তারা চিন্তা ভাবনা শুরু করেছেন বলে জানালেন। তারা বললেন, ইসলাম ধর্মের মতো খৃস্টান ধর্মকেও খৃস্টানদের ডে টু ডে লাইফে আনার জন্য তারা চেষ্টা করছেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সিলেবাস নতুনভাবে বিন্যস্ত করাসহ প্রয়োজনীয় বইও তারা তৈরি করছেন। খৃস্টানরা এত দলে বিভক্ত যে (প্রায় দু'শতাধিক) ধর্মকে ভিত্তি করে একমুখী কোনো আইন তৈরি বা ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব নয়। এমন কোনো চেষ্টা আছে কি না জিজ্ঞাস করলে তারা জানালেন, এ ধরনের চেষ্টা নেই এবং চেষ্টা করা উচিতও নয়। প্রত্যেক গ্রুপই তার মত প্রকাশ করবে। এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। কোনো ঐক্য বা সমন্বয়ের নামে এই মত প্রকাশকে বন্ধ করা যাবে না। তারা বললেন, মুসলমানদের মধ্যেও অনৈক্য রয়েছে। আমি

www.pathagar.com

বললাম, মুসলমানদের অনৈক্যটা এত পরিমাণ নয় এবং মৌলিক ধরনের নয়। কুরআন ও সহীহ হাদীস সবাই মেনে চলে। এই কারণে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য থাকলেও ঐক্য এখানে সহজ এবং এমন ঐক্যের দৃষ্টান্তও আছে। ধর্মের সাথে ধর্মহীনতা ও সেকুলারিজমের সংঘাতের কথা ওঠলো। এই সংঘাতকে নিরুৎসাহিত করতে হবে বলে তারা জানালেন। তারা বললেন, ধর্মকে রাজনীতির সাথে ঐ সংঘাত পর্যন্ত নেয়া ঠিক হবে না। আমাদের প্রোগ্রামের জন্য সময় বরাদ্দ ছিল এক ঘন্টা। কখন যে সময় শেষ হয়ে গেল বুঝা গেল না। আমরা বিদায় নিলাম। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার জন্য তারা আমাদের ধন্যবাদ জানালেন। আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য এবং মূল্যবান আলোচনার জন্য তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানালাম আমরা। বিদায়ের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ আমাদেরকে দেখানো হলো। বিশ্ববিদ্যালয়টি ছোট কিন্তু খুবই সুন্দর। সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড। শিক্ষাদান ব্যবস্থাও সর্বাধুনিক।

খৃস্টান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা সেন্টার ফর জুদায়িক স্ট্যাডিজ এ গেলাম। এ সেন্টারটি ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা অংশ। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ে খৃস্টান স্টাডিজ নামে কোনো বিভাগ নেই। গোটা আমেরিকার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের জুদায়িক সেন্টার নেই বলে জানা গেল। এখানকার জুদায়িক স্টাডিজের একটা বিষয় হলো ইসলাম ও জুদায়িক স্টাডিজ।

সেন্টারের পরিচালক ডক্টর স্ট্যানলি এম ওয়াগনার তার অফিসে আমাদের স্বাগত জানালেন। তার সাথে ছিলেন সেন্টারের অধীন ইনিস্টিটিউট অব ইসলামিক জুদায়িক স্টাডিজ এর পরিচালক।

পরিচয় পর্বের পর তারা সেন্টারের কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের জানালেন। তারা বললেন, কোনো মুসলিম দেশ সাহায্য করলে, টাকা পেলে 'ইসলামিক স্টাডিজ' নামে একটা স্বতন্ত্র বিভাগ তারা খুলবে। আমি প্রশ্ন করলাম, যে ভাবে আমেরিকায় তাদের 'সেন্টার ফর জুদায়িক স্টাডিজ' গড়ে ওঠেছে সেভাবে অথবা আমেরিকানদের সাহায্যে ইসলামিক স্টাডিজ সেন্টার গড়ে ওঠতে পারে কি না। মিস্টার ওয়াগনার বললেন, আমেরিকান মুসলমানরা এগিয়ে আসে না। এরপরেই তিনি জানালেন, জুদায়িজম ও ইসলামের উপর বিশেষভাবে কাজ করছে তাদের সেন্টার। ইসলাম ও জুদায়িজম এর ওপর দু'খন্ডের একটা গ্রন্থও তারা প্রণয়ন করেছেন। প্রথম খণ্ড আমাদের উপহার দিলেন। ক্রমবর্ধমান ননরিলিজিওসিটি

www.pathagar.com

এর প্রেক্ষাপটে আগামী শতক কেমন হবে। এই প্রশ্নের জবাবে মিস্টার ওয়াগনার বললেন, 'সেক্যুলারিজম ও তথাকথিত হিউম্যানিজমের বিরুদ্ধে ধর্মকে লড়াই করতে হবে। সব ধর্মের তাই ঐক্য প্রয়োজন।' এই প্রশ্ন আমি আমেরিকা সফরকালে বিভিন্ন জায়গায় করেছি। কিন্তু কোনো খৃস্টান সংস্থা এমন জবাব দেয়নি। একটা বিষয় ছিল লক্ষণীয়, জুদাইক ষ্টাডিজ অফিস কক্ষেই যেমন তারা আমাদের স্বাগত জানিয়েছিলেন, তেমনি বিদায় জানাতেও তারা ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে আসেননি। অথচ সব খৃস্টানই এটা করেছে। আমরা জুদায়িক সেন্টার থেকে ফেরার পথে একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সেরে নিলাম। পরবর্তী প্রোগ্রামটা ছিল আমাদের জন্য বেশ আনন্দের। লাঞ্চের পর আইআইই'র ভদ্র মহিলা বললেন, আপনারা চাইলে আমরা ডেনভারের দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখতে পারি। আমাকে এই ধরনেরই বলা হয়েছে। বিকালে আপনাদের আর কোনো প্রোগ্রাম নেই। ডেনভারের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে ডেনভার বোটানিক গার্ডেন, ইন্ডিয়ান মার্কেট (রেড ইন্ডিয়ান), ডেনভার আর্ট মিউজিয়াম ইত্যাদি। আমরা খুবই খুশি হলাম এই দর্শনীয় স্থানগুলো দেখার সুযোগ পেয়ে।

আজ ২৪ মে। ডেনভার ছাড়ার দিন। যাচ্ছি আমরা লসএঞ্জেলেসে। সকালে ব্যাগ ব্যাগেজ বাধা শেষ করে ৮টায় গিয়ে রেস্টুরেন্টে নাস্তা সেরে এলাম। আলু ও ডিম হলো নাস্তা। তার সাথে টোস্ট ও জেলি। ক'দিন থেকে তিন বেলা এটাই খাচ্ছি। সাড়ে ন'টার দিকে ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে নেমে এলাম হোটেলের লবিতে। হোটেলের বিল পে করতে হলো একশ' একুশ ডলার।

ডেনভার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টের সাথে আবার দেখা হলো। সাড়ে বার'টায় প্লেন ছাড়লো লসএঞ্জেলেসের উদ্দেশে। ডেনভার থেকে লসএঞ্জেলেস ৮৫০ মাইলের সফর। আর ওয়াশিংটন থেকে ডেনভার আসতে হয়েছিল ১৪৮০ মাইল পাড়ি দিয়ে। আজ ডেনভারের আকাশ গত দু'দিনের মতো গাঢ় মেঘে ঢাকা। তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস। আগের দিন ছিল তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল থেকেই আমার মাথাটা টনটন করছে ব্যথায়। গতকাল সিনামিন খেয়েছি আজও খেলাম।

আসার দিন বরফ ঢাকা সৌন্দর্য দেখেছিলাম রকির। সে রকি পর্বতমালা দেখার জন্যে আজও চোখ মেলে ধরলাম প্লেনের জানালা দিয়ে। কিন্তু মেঘের জন্যে সে আশা পূরণ হলো না, দেখতে পেলাম না রকিকে। পঁচিশ/ত্রিশ মিনিট ফ্লাই করার পর নিচের মেঘ হালকা হয়ে গেল। রকি পর্বতমালার বরফ ঢাকা সুবিস্তীর্ণ অংশ

www.pathagar.com

চোখের সামনে ভেসে উঠল। কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্যে। তারপরেই শুরু হলো নিচে কালো পিঙ্গল রঙের দৃশ্যপট। আমার দু'চোখ তখন অস্থিরভাবে খুঁজছিল গ্রেট ক্যানিয়নের শিহরণ জাগানো দৃশ্য। ডেনভার থেকে ওঠে প্লেন ছুটছিল লসএঞ্জেলেসের দিকে। কলোরাডোর পর আরিজোনার যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্লেন যাচ্ছিল সেটা কলরাডো নদীর গতিপথ। এখানে এসেই কলরাডো নদী গ্রেট ক্যানিয়নের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। হঠাৎ করে আমার চোখ দু'টো আটকে গেল ভয়ঙ্কর এক গিরিখাদে। চোখের দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত তা বিলম্বিত। আমার মন বলে ওঠল, এটাই হবে সেই বিখ্যাত গ্রেট ক্যানিয়ন। গ্রেট ক্যানিয়নের গভীরতা আমার কাছে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো। আমার অজান্তেই আমার চোখ ভয়ঙ্কর সে দৃশ্য থেকে সরে এসেছিল। আমি অনুভব করেছিলাম আমাদের প্লেনটা যেন গ্রেট ক্যানিয়নের অন্ধকার গহ্বরের দিকে ছুটে যাচ্ছে। আল্লাহর এই বিস্ময়কর সৃষ্টি কলোরাডো নদীর অংশ। এখানে এসে কলোরাডো নদী গ্রেট ক্যানিয়নের গভীর তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। গ্রেট ক্যানিয়ন দুইশ' সাতাশ মাইল লম্বা। প্রস্থের দিক দিয়ে আঠার মাইল। ছয় হাজার ফিটের বেশি গভীর। পৃথিবীর জিওলজিক্যাল ইতিহাসের বিস্ময় এটা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৪

স্থানীয় সময় বেলা পৌনে দু'টার দিকে আমরা লসএঞ্জেলেস বিমানবন্দরে নামলাম। প্লেনে থাকতেই দেখলাম লসএঞ্জেলেসের বিমানবন্দর। ঝাঁকে ঝাঁকে প্লেন উঠছে আর নামছে। 'বড়', 'বিশাল' ধরনের কোনো শব্দ দিয়েই লসএঞ্জেলেসের বিমানবন্দরের বড়ত্বকে বুঝানো যাবে না। বিমান বন্দর নয়, যেন একটি বিমান প্রান্তর। কত যে স্থাপনা, বিমান ল্যান্ডিংয়ে কত যে গ্যাংওয়ে! এপথ সেপথ ঘুরে, এফ্লাইওভার ওফ্লাইওভার দিয়ে আমরা বিমান বন্দর থেকে বের হয়ে এলাম।

আমরা হোটেলে পৌঁছতে প্রায় পাঁচটা বেজে গেল। নাম হ্যান্টলি হোটেল। প্রায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে দাঁড়ানো হোটেলটি। এলাকাটা বিখ্যাত সান্তা মনিকা বীচ। হোটেলের জানালায় দাঁড়ালে প্রশান্ত মহাসাগরের শান্ত নীল জলরাশি এবং লসএঞ্জেলেসের দক্ষিণের পাহাড় দেখা যায়। সবকিছুই ছবির মতো সাজানো গোছানো সুন্দর। লসএঞ্জেলেসে এই প্রথম এলাম। কিন্তু লসএঞ্জেলেস শহরের সাথে আগে থেকেই পরিচিত। ছবিতে লসএঞ্জেলেস কত বার দেখেছি! লসএঞ্জেলেসের সব নামের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে সান্তা মনিকা নামটা আমার খুব ভালো লাগত। নামটা যেমন সুন্দর তেমনি এ নামের মধ্যে বাংলাদেশী একটা চরিত্র আছে। সান্তা ও মনিকা শব্দ দু'টি শুনতে আমার কাছে মিষ্টি দু'টি বাংলা ভাষার শব্দ মনে হয়।

হোটেলে এসে কাপড় ছেড়ে ফ্রেস হয়ে বসতেই টেলিফোন পেলাম মফিদ সাহেবের। পরেই টেলিফোন করলেন আশরাফ সাহেব। তারপরেই টেলিফোন এলো আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সাহেবের ভাই বাবুলের। বাবুল বললেন, রাতের খাবার ও সকালের নাস্তা নিয়ে রাত দশটার দিকে তিনি আসছেন। কিছুক্ষণ পরে আশরাফ সাহেব জানালেন, পরদিন তিনটায় তার বাসায় লাঞ্চ করতে হবে। মুজিব নামে একজন ছেলের টেলিফোন এই সময় এলো।

রাতে খাবার নিয়ে এলেন বাবুল ও রফি উদ্দিন নামে একটি ছেলে। প্রচুর খাবার। সবজি, মাছ, মুরগি, ভাত, পাউরুটি দুই রকমের জেলি এবং অনেক ফলমূল। আমরা সবজি ও মাছের কিছু অংশ খেলাম। গোশত রেখে দিলাম সকালের জন্য। অবশিষ্ট সবজি, মাছ, ভাত ফেরত নিয়ে যেতে হলো ওদের।

এর আগে বিকালে আমরা বেরিয়েছিলাম সান্তা মনিকার বীচ এলাকা দেখতে।

www.pathagar.com

প্রশান্ত মহাসাগরের পানির কিনারায় দাঁড়িয়ে শান্ত নীল জলরাশির ওপর দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম পশ্চিম দিগন্তে, দিগন্তের আরো ওপারে, এশিয়ার দিকে। মনে হয়েছিল এই জলরাশির একটা প্রান্ত গিয়ে স্পর্শ করছে আমাদের টেকনাফকে, চিটাগংকে। এইভাবে আমাদের পৃথিবীটা এক ও অখণ্ড। হাঁটু পানি পর্যন্ত সাগরে নেমেছিলাম। অঞ্জলি ভরে তুলে নিয়েছিলাম প্রশান্তের নীল পানি। আসলে সুন্দর নাম প্রশান্ত মহাসাগর। মহাসাগরের কোনটারই নাম এত সুন্দর নয়। প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব প্রান্ত উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার সন্নিহিত এলাকা অথবা বলা যায় প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব অংশ অপেক্ষাকৃত বেশি শান্ত। আর এই এলাকাটাই প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতম এলাকা। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-দক্ষিণে বিলম্বিত পশ্চিমভাগে দ্বীপের সমারোহ। বলা যায় সংখ্যাহীন দ্বীপের রাজ্য। কিন্তু পূর্বভাগে দ্বীপের কদাচিৎ দেখা মেলে। পূর্ব ভাগের এলাকা গভীর বলেই কি সাগর যেমন শান্ত তেমনি দ্বীপও নেই! প্রশান্ত মহাসাগরের চিত্র সামনে এলেই আমি এ কথাগুলো ভাবি। আজও এ ভাবনাটা আমার মনে প্রবল হলো। লসএঞ্জেলেসের সান্তা মনিকার এ বীচে এ পাথর থেকে সে পাথরে পা দিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। সান্তা মনিকার নাম যেমন সুন্দর, সান্তা মনিকার বীচ কিন্তু তেমন সুন্দর না। আমরা যে অংশ দিয়ে সাগরে নেমেছিলাম সেটা অনেকটাই খাড়া এবং ভঙ্গুর। তবে সুন্দর সাগর ও সুন্দর সান্তা মনিকার মাঝখানে এই বিচ্ছন্ন এই দৃশ্যটা মনে রাখার মত নয়। সান্তা মনিকা বীচ থেকে ফেরার পথে আমরা কিছু জুস, পানি, আলুর চিপস নিয়ে এসেছিলাম।

সান্তা মনিকায় আমাদের প্রথম সকাল। দিনটা মে'র ২৫ তারিখ। আজ আমাদের নাস্তার কোনো চিন্তা ছিল না। নাস্তা করলাম আমরা বাবুল সাহেবের দিয়ে যাওয়া গোশত ও পাউরুটি দিয়ে। ফলও খেলাম আমরা নানা রকমের। ইরউইন কার্নকেও আমরা কলা, আপেল, আঙ্গুর ও চেরি ফল দিলাম। নাস্তার পরে আজকের প্রোগ্রাম নিয়ে কথা বললাম আমরা ইরউইন কার্ন এর সাথে। কার্ন জানালেন, আজ দেড়টার প্রোগ্রামের সাথে লাঞ্চও আছে। ইরউইন কার্নের দেয়া লাঞ্চের খবর আমাদের বিপদে ফেলে দিল। গত রাতেই আমরা আশরাফ সাহেবের লাঞ্চের দাওয়াত গ্রহণ করেছি। আশরাফ সাহেবের লাঞ্চের দাওয়াত বাতিল করা ছাড়া কোনো উপায় থাকলো না। সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন করলাম। টেলিফোন ধরলেন আমাদের কাঞ্চনের ভাই দোলন। আশরাফ সাহেবকে না পেয়ে তাকেই বিষয়টি জানালাম। কিছুপরেই দোলন টেলিফোন করে জানালো আশরাফ সাহেবকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। দোলন আমাকে আরো বললো,

www.pathagar.com

আপনি বাইরে বা বাড়িতে টেলিফোন করতে হলে আমার এখানে এসে করবেন। তাকে ধন্যবাদ দিলাম আমি।

ক্যালিফোর্নিয়ার গার্ডেন গ্রোভে আজ আমাদের প্রোগ্রাম ক্রিস্টাল ক্যাথেড্রাল এর সাথে। লসএঞ্জেলসের সান্তা মনিকা থেকে গার্ডেন গ্রোভ অনেক দূরে, লং বীচ এলাকায়। লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে আমরা সাড়ে দশ'টার দিকে ক্রিস্টাল ক্যাথেড্রাল পৌঁছলাম। ক্রিস্টাল ক্যাথেড্রাল এর গেটে 'খৃস্টান-মুসলিম ফর পিচ সেন্টারের'('Christiane Muslim for Peace Center') পরিচালক মিস্টার ইউলিয়াম বাকের আমাদের স্বাগতম জানালেন। সেন্টারটি ক্রিস্টাল ক্যাথেড্রাল এর একটি অংশ। এই সেন্টার খৃস্টান-মুসলিম সম্পর্ক, সমঝোতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ করে।

ক্রিস্টাল ক্যাথেড্রাল এর বিল্ডিংটি সুন্দর একটি স্থাপনা। মনে হলো প্রায় বিশ তালার মতো, উচ্চতায় খুব বেশি নয়। কিন্তু ডিজাইন ও বহির্দৃশ্য দেখার মত। ইস্পাতের প্যানেলে চারদিকের দেয়ালটা স্বচ্ছ কোনো ফাইবার দিয়ে তৈরি। সূর্যের আলো ভিতরে প্রবেশ করে স্বচ্ছ আলোর বন্যা সৃষ্টি করেছে। বিল্ডিংটা একটা গির্জা। এই গির্জার প্রধান রেভারেন্ড রবার্ট শুলার এই বিল্ডিং থেকে নিয়মিত এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় টেলিভিশন প্রোগ্রাম প্রচার করে থাকেন। যার মধ্যে রয়েছে সমবেত সঙ্গীত এবং গুরুত্বপূর্ণ সব সাক্ষাৎকার এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানমালা প্রচার। আমাদেরকে বিল্ডিং এর সর্বোচ্চ তলায় মিস্টার রেভারেন্ড রবার্ট শুলারের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো। তার অফিস কক্ষের সামনের দিকটা স্বচ্ছ ফাইবারে ঘেরা এবং স্বচ্ছ আলোয় প্লাবিত। লাউঞ্জে আমরা পৌঁছতেই অফিস কক্ষ থেকে বের হয়ে এসে রেভারেন্ড রবার্ট শুলার আমাদের স্বাগত জানালেন। তাকে মনে হলো বিনয়ের অবতার। আমাদের এত প্রশংসা করলেন যে আমার খুবই লজ্জাবোধ হলো, খারাপও লাগলো। অথচ বিলিয়োন বিলিয়োন ডলার মূল্যের প্রতিষ্ঠানের মালিক তিনি। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলাম নামেও ক্রিস্টাল ক্যাথেড্রাল কাজেও ক্রিস্টাল। বিল্ডিং স্ফটিক এর মতোই। মূল টাওয়ারটি সম্পূর্ণ স্টিলের। মূল প্রার্থনা কক্ষের অদ্ভূত ডিজাইন, অদ্ভূত স্বচ্ছতা ও উন্মুক্ততা। এই প্রার্থনা কক্ষে দু'হাজার লোক এক সাথে চেয়ারে বসতে পারে। মজার ব্যাপার হলো শুধু মিস্টার শুলারই নয়, আমার মনে হলো প্রতিষ্ঠানের সকলেই যেনো কতদিন ধরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। মিস্টার রেভারেন্ড শুলারের সাথে অনেক কথা হলো। কথা হলো মানে কথা আমরা শুনলামই শুধু। বলা যায় শতকরা নিরানব্বই ভাগ কথা তিনিই বললেন। আমি এক ফাঁকে সুযোগ করে নিয়ে বললাম, তার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমি কিছু জানতে চাই। আমার কথা তিনি

www.pathagar.com

এড়িয়ে গেলেন। তবে এটুকু বললেন জানানো হবে। মিস্টার বাকের ও অন্যান্যরা আমাদেরকে ক্রিস্টাল স্পটিক টাওয়ার, প্রেয়ার হল, প্রশাসন বিভাগ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ঘুরে ঘুরে দেখালেন। অনেকগুলো টিভি স্টুডিও, শত শত কম্পিউটার, অডিও ভিডিও সংগ্রহশালা আমরা দেখলাম। বিয়াল্লিশটি দেশে তাদের প্রোগ্রাম প্রচার হয়। কিছু কথা আমার ভিতরে ঘোরপাক খাচ্ছিল। কিন্তু বলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর একটা সমীক্ষায় দেখেছি রবার্ট শুলারের যে টিলিভিশন নেটওয়ার্ক তার দর্শক হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৮৬ সালে যার সংখ্যা ছিল বিশ লাখ সেই সংখ্যা ১৯৮৮ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১২ লাখ। এই হ্রাসটা কেন এটা ওদের কাছ থেকে জানা হলো না। তবে একটা জিনিস আমার কাছে খুবই বড় মনে হলো সেটা ওদের প্রচারের প্রয়াস। একজন প্রচারক (Preacher) হিসাবে বিশ্বে রবার্ট শুলারের একটা নাম আছে। আর এ কথা সত্য যে, 'A Preacher far ahead of the teacher'। সবশেষে গেলাম আমরা ক্রিস্টাল কাথেড্রালেরই একটা অংশ মিস্টার বাকেরের 'Christian Muslim for Peace Center'এ। বিস্মিত হলাম মিস্টার বাকেরের অফিসে তার কাজ ও ক্যালেকশন দেখে। কাশ্মির ও ফিলিস্তিনের ওপর লেখা তার বই এবং কাশ্মিরে মুসলিম নির্যাতনের ওপর তার ফটো এলবাম দেখে মনে হলো তিনি এইক্ষেত্রে আমাদের মতো মুসলমানদের ছাড়িয়ে গেছেন। মিস্টার বাকের জানালেন, ইসলাম সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝি দূর করা আমাদের একটি বড় কাজ। এই কাজ আমরা করে থাকি বিভিন্ন সেমিনার ও বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প আয়োজনের মাধ্যমে। তিনি ক্যাম্প ও সেমিনারের কাগজ-পত্র দেখালেন। তাদের কাগজ-পত্রের মান ও কাজের ধরন দেখে খুশি হলাম। পত্র-পত্রিকার কাটিং, বই এবং আরো কিছু কাগজ-পত্র তিনি আমাদের দিলেন। তার বিনয় ও আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হলাম। ক্রিস্ট্রাল কাথেড্রালের অনেকটা বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। গোটা প্রতিষ্ঠানে প্রায় পাঁচশ'র মতো কর্মচারী। মিস্টার শুলার, মিস্টার বাকের এবং অন্যান্য কর্মী-কর্মচারীদের মধ্যেকার সম্পর্ক, পারস্পরিক আচার-আচরন ও কথা-বার্তায় সকলকে এক অপরের বন্ধু বলে মনে হয়েছে। তারা কেউ বড় কেউ ছোট কেউ বস কেউ অধীন কর্মচারী এমন যেন নয়। যেনো হাসিখুসিতে ভরা বন্ধুদের এক সমাবেশ এই অফিস। এই দৃশ্য সত্যি আমাদের মুগ্ধ করেছে। যারা মিশনারী, যারা মানুষের জন্যে মেসেজ নিয়ে কাজ করে, যারা মানুষের হৃদয়ে পৌছার অভিলাষী হন, তারা, তাদের চরিত্র এমনই হওয়া উচিত।

www.pathagar.com

ঘন্টা খানিকের মধ্যে আমরা ক্রিস্টাল ক্যাথেড্রাল থেকে বেরিয়ে এলাম। এরপর আমাদের প্রোগ্রাম ফাউন্টেন ভ্যালিতে, কাউন্সিল অন ইসলামিক এডুকেশনের সাথে। আমরা সাড়ে বার'টার দিকে কাউন্সিল অফিসে পৌঁছলাম। সময়ের আগেই আমরা পৌঁছে গেলাম। 'কাউন্সিল অন ইসলামিক এডুকেশন' এর প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর সাব্বির মনসুরের সাথে আমাদের সাক্ষাতের কথা। তিনি অফিসে ছিলেন না। না থাকারই কথা। আমাদের এখানে আসার সময় ছিল দেড়'টায়। আমরা এক ঘন্টা আগেই এসেছি। কিছুটা লজ্জিত হলাম। রক্ষা যে আমাদের পরিচয় পেয়ে সাব্বির মনসুরের ছোট ভাই আমাদেরকে নিয়ে ভিতরে বসালেন। তার সাথে আমাদের কিছু আলাপ হলো। তার কাছে জানলাম, কাউন্সিলের বয়স খুব বেশি নয়। মাত্র তিন বছর। তিনি জানালেন, কাউন্সিলের কাজ হলো মার্কিন পাবলিশার, সরকারের শিক্ষা দফতরের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল, লেখক প্রমুখকে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা। আমাদের কথাবার্তার মধ্যেই কাউন্সিলের পরিচালক সাব্বির মনসুর এসে পড়লেন। সালাম পরিচয় হলো। খুব খোলা মেলা ভদ্রলোক। প্রাণ খোলা হাসিতে তিনি আমাদের গ্রহণ করলেন। জানলাম তিনি ভারতের হায়দ্রাবাদের লোক। হায়দ্রাবাদ থেকে তিনি পরিবার সমেত এসেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পর তিনি কথা বললেন তার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে। জানালেন, 'কাউন্সিল অন ইসলমিক এডুকেশন' প্রতিষ্ঠার পিছনে মজার একটা ঘটনা আছে। একদিন আমার স্কুল পড়ুয়া মেয়ে ঘরে বসে পড়ছিল। পাশের ঘরে আমি। মেয়ের সব কথাই আমার কানে আসছিল। মেয়ে মুসলমান কাকে বলে পড়ছিল। আমি মেয়ের মুখে মুসলমানের পরিচয় শুনে অবাক। যারা এইভাবে রুকু করে, এইভাবে সেজদা দেয়, এইভাবে দাঁড়ায় তারাই নাকি মুসলমান। আমি মেয়ের কাছে গেলাম। বললাম, মুসলমানের কি পরিচয় তুমি পড়ছো ? মেয়ে বললো, বাবা আমার পাঠ্য বইতে এটাই লেখা আছে। আমি বিব্রত হয়ে পড়লাম। স্কুলের একটা পাঠ্য বইতে একটা জাতির পরিচয় এইভাবে লেখা হয় কি করে এবং তা পড়ানো হয় কিভাবে। আমি পরদিনই স্কুলে গেলাম। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে দেখা করলাম। পুরো ঘটনা তাকে জানিয়ে বললাম, বইতে যা লেখা আছে মুসলমানদের পরিচয় সেটা নয়। মুসলমানদের একটি প্রার্থনা পদ্ধতির কয়েকটা অংশ মাত্র। প্রধান শিক্ষকের সাথে বৈঠকে আরো কয়েকজন শিক্ষক ছিলেন। তারাও শুনলেন বিষয়টা। মনে হলো তারাও অবাক হলেন। প্রধান শিক্ষক বললেন, বিষয়টা আমরা শুনলাম আমাদেরও বিস্ময় লাগছে। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। আপনি যদি এর বিহিত করতে চান, যদি এর

www.pathagar.com

সংশোধন চান, সত্যিকার পরিচয় পাঠ্য বইতে লেখা হোক চান তাহলে আপনাকে শিক্ষা দফতর ও পাবলিশার্সের সাথে কথা বলতে হবে। তারা জানালেন, ক্যালিফোর্নিয়ায় গভর্মেন্ট স্কুলের পাঠ্য বই 'বেসরকারি স্কুলেও পড়ানো হয়' এবং পাঠ্য বই তৈরির নিয়ম হলো স্টেট গভর্মেন্টের শিক্ষা দফতর পাঠ্য বই, 'ইতিহাস, ভূগোল, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি' তৈরির জন্যে সংক্ষিপ্ত গাইড লাইন প্রকাশ করে। সেই গাইড লাইন অনুসারে প্রকাশকরা পাঠ্যবই লেখা এবং প্রকাশ করে। শিক্ষা দফতর বইগুলো অনুমোদন করে। প্রকাশিত বইয়ের যে কোনো একটি স্কুল তার পাঠদানের জন্য গ্রহণ করে। সাব্বির মনসুর জানালেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষের পরামর্শে আমি শিক্ষা দফতরের সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের সাথে দেখা করলাম এবং পাবলিসার্সদের সাথেও কথা বললাম। আমার বক্তব্য তারা আন্তরিকভাবে শুনলেন এবং যৌক্তিকতা তারা গ্রহণও করলেন। তারা বললেন, পরবর্তী সংস্করণে তারা বইটি সংশোধন করবেন। সেই সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষ আরো জানালেন, পরবর্তী সাত বছরের জন্য শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারিত হতে যাচ্ছে। এবং সমাজবিজ্ঞানের সব শাখার জন্যে একটা করে গাইড লাইন তৈরি হতে যাচ্ছে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা কোনো পরিবর্তন যদি চাই, তাহলে শিক্ষা দফতর ও পাবলিসার্সের সাথে আমাকে যোগাযোগের পরামর্শ দিলেন। আমি তাদের পরামর্শ অনুসারে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং সেই সিদ্ধান্তের অপরিহার্য প্রয়োজন থেকেই 'কাউন্সিল অন ইসলমিক এডুকেশন' এর জন্ম হলো।

জনাব সাব্বির মনসুর তার কাজের ধরন সম্পর্কে বললেন, একটা গণতান্ত্রিক সমাজে একটা পক্ষ হিসাবে কনফ্রোন্টেশন বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করা যায়। আবার প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে শামিল করে সহযোগিতা দেয়া এবং সহযোগিতা নেয়ার মাধ্যমেও নিজের মতের প্রতিফলন ঘটানো ও ভিতর থেকেই বাঞ্ছিত পরিবর্তন আনা যায়। সাব্বির মনসুর জানালেন, তিনি দ্বিতীয় পথ ধরে কাজ করছেন এবং প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি জানালেন, এই অবস্থায় পৌঁছতে তার অনেক সময় লেগেছে। প্রথম দিকে পাবলিসার্স ও সরকারি কর্তৃপক্ষ কেউ তাকে বিশ্বাস করতে চায়নি। তারা মনে করছিলেন আমি বোধ হয় সংকীর্ণ স্বার্থে কোনো মতলব হাসিলের জন্যে কাজ করছি। কিন্তু তারা যখন বুঝলেন আমি একজন মার্কিন নাগরিক হিসাবে মুসলিম নাগরিকদের নায্য অধিকারের কথা বলছি তখন আমাকে তারা বিশ্বাস করেছেন এবং সহযোগিতা দিয়েছেন। এখন পাবলিসার্স এবং শিক্ষা দফতর মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে আমার মতামতকে মর্যাদা দেয় এবং মতামত গ্রহণ করে থাকে।

www.pathagar.com

সাব্বির মনসুর সাহেব বললেন, আগামী সাত বছরের জন্য পাঠ্য বই তৈরির লক্ষে যে গাইডলাইন তৈরি হচ্ছে এবং যার খসড়া সরকার প্রকাশ করেছে তাতে মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট পাঠ্য বিষয়গুলো ইসলামিক দৃষ্টিকোণ থেকে সংশোধনের ব্যাপারে সাব্বির মনসুর যে সব বই পুস্তক ও ডকুমেন্টারি তৈরি করেছেন তা আমাদের গিফট করলেন। বই ও ডকুমেন্টগুলোতে রয়েছে বহু সেমিনার বহু ওয়ার্কসপের বিস্তারিত সুপারিশমালা। এই সুপারিশমালা তৈরি করতে দীর্ঘ সময় ও অপরিসীম পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছে। সাব্বির মনসুর জানালেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও বিশ্বের অন্যান্য স্থান হতে তাকে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে অভিজ্ঞ মুসলিম বিশেষজ্ঞদের এনে সেমিনার সিমপোজিয়াম ও ওয়ার্কসপ করতে হয়েছে। আল্লাহ'র ইচ্ছায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে স্থানীয় পাঠ্যবইয়ের মুসলিম বিষয়গুলো সংশোধনের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা দাঁড় করানো সম্ভব হয়েছে।

দীর্ঘ আলোচনা হলো। তিনি অফিসেই আমাদেরকে লাঞ্চ করালেন। একটি সরকারি স্কুলের একটি অংশ ভাড়া নিয়ে তিনি এই অফিস করেছেন। বিভিন্ন আলোচনায় তার কাজ সম্পর্কে তিনি আরো জানালেন, সরকারি স্কুলে যে সব অমুসলিম শিক্ষক সমাজবিজ্ঞান (যার মধ্যে মুসলমানদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় রয়েছে, মুসলমানদের ইতিহাস ও বিশ্বাস সম্বন্ধীয় বিষয় রয়েছে) পড়ায় তাদের ট্রেনিংয়ের তিনি ব্যবস্থা করেছেন। সে ট্রেনিংএ পাঠ্য বইয়ের মুসলিম সংক্রান্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে তথ্য-উপাত্যসহ তাদের জানানো হয়। এবং যতটা সম্ভব সংশ্লিষ্ট রেফারেন্স বইয়ের সাথে তাদের পরিচিত করানো হয়। শিক্ষকরা এই সহযোগিতা পেয়ে খুশি হন এবং স্বাভাবিকভাবে পাঠদান কালে এ সবকে তারা কাজে লাগান। সাব্বির মনসুর বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে প্রতিষ্ঠানের অনুমতি নিয়ে ছাত্রদের সামনে বক্তৃতাও করেন। এছাড়া তিনি মুসলিম ছাত্রদের গ্রুপ আকারে তার অফিসে আমন্ত্রণ করেন। তাদের সাথে তাদের শিক্ষা বিষয়ে কথা বলেন এবং মুসলিম জীবনের ওপর বিভিন্ন পোস্টার, ছবি ইত্যাদি তাদের দেখান। পরে তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের লিখিত উত্তর তিনি রেকর্ড ও সংরক্ষণ করেন। সে সব রেকর্ডের কিছু আমাদের তিনি দেখালেন। তাদের উত্তরপত্রে দেখা গেল অধিকাংশ ছাত্রের মুসলমান ও ইসলাম সম্পর্কে তাদের অনেক ভুল বুঝাবুঝির অবসান হয়েছে, তারা অনেক কিছু জেনেছে। সাব্বির মনসুর বললেন, তিনি যে নতুন ও কঠিন কাজ করে যাচ্ছেন সেকাজে তিনি খৃস্টান, অখৃস্টান, সরকার সকলের কাছ থেকেই আন্তরিক সহযোগিতা ও পরামর্শ পাচ্ছেন। তিনি একটা মজার ঘটনার কথা বললেন, গত বছর তিনি ভারতে গিয়েছিলেন সংখ্যালঘু

www.pathagar.com

সম্পর্কিত একটা কনফারেন্সে। তার আলোচনার বিষয় ছিল ভারতে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম সংখ্যালঘুদের তুলনামুলক অবস্থা। তিনি সে কনফারেন্সে বলেছিলেন, মুসলিম সংখ্যালঘু হিসাবে মাতৃভূমি ও জন্মভূমি ভারতে আমি যা বলতে পারি না, করতে পারি না, তার চেয়ে অনেক বেশি বলতে পারছি, করতে পারছি আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

আমরা খুব খুশি হলাম সাব্বির মনসুর সাহেবের এখানে এসে এবং তার সাথে কথা বলে। আমরা কখনো চিন্তাও করিনি, এমন সব বিষয় সম্পর্কে তার কাছ থেকে জানলাম, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবতার অদৃশ্য একটা অধ্যায় আমাদের সামনে উন্মোচিত হলো। তার কাছ থেকে বিদায় নিতে আমাদের কষ্ট হচ্ছিল। বিদায়ের সময় তিনি ২৭ মে তারিখে আর একটি দাওয়াত দিলেন। আমরা খুশি হলাম, তবে দাওয়াতে আসতে পারবো এটা বলতে পারলাম না। আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। হোটেলে ফিরতে পাঁচ'টা বেজে গেল। দিনটা আমাদের সুন্দর ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে কাটলো। আমরা হোটেলে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম এই সময় আশরাফ ও মুজিব সাহেব এলেন। তখন বাজে সন্ধ্যা সাত'টা। আগেই কথা ছিল তারা আসবেন। তাদের সাথে আমরা ঘুরতে বের হবো। অতএব উপায় নাই উঠতে হলো। তাদের গাড়িতে আমরা ঘুরে বেড়ালাম বিশাল লসএঞ্জেলসের অনেক জায়গায়। ফেরার পথে বাঙ্গালী একটা রেস্টুরেন্টে তারা আমাদের ডিনার করালেন। রাত এগার'টা বেজে গেল হোটেলে ফিরতে।

সেদিন শুক্রবার। ২৬ মে। আজকের সবচেয়ে বড় প্রোগ্রাম লসএঞ্জেলসের বেলাল মসজিদে জুমুআর নামায পড়া। সেই সাথে লসএঞ্জেলসে আফ্রিকান আমেরিকান মুসলিমদের সবচেয়ে বড় প্রোজেক্ট বেলাল কমপ্লেক্স দেখা। আজ আরো একটি বড় প্রোগ্রাম আছে সেটি হলো সান গাব্রিয়েল ভ্যালির ইসলামিক সেন্টারে যাওয়া। বেলাল মসজিদে যাওয়ার পথে হলিউড দেখে যাওয়ার প্রোগ্রামও আমাদের রয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি নাস্তা সেরে সকাল আট'টার দিকে বের হলাম। হলিউড লসএঞ্জেলসের একটা অংশ। আবার ভিন্ন একটা সিটিও বলা যায়। হলিউড যাবার পথে আমরা লসএঞ্জেলসের 'গুলশান' এলাকার মধ্যে দিয়ে গেলাম। এলাকাটার নাম কিন্তু গুলশান নয়। আভিজাত্য বুঝাবার জন্য নামটা আমি ব্যবহার করলাম। ঢাকার অভিজাত এলাকা যেমন গুলশান তেমনি লসএঞ্জেলসের এই এলাকা আমেরিকা এবং আমেরিকার বাইরের অতি টাকাওয়ালার অভিজাত বাসস্থান। সবুজ পাহাড় ও উপত্যকায় সজ্জিত 'বেলায়ার' এবং 'বিভারলি হিল' আমরা দেখলাম। একে নাকি টাকাওয়ালাদের স্বর্গ বলা

www.pathagar.com

হয়। চার দেয়ালের ভিতর স্বর্গ থাকলে তা কেমন আমি জানি না। তবে পাহাড় উপত্যকায় আকাঁবাঁকা পথ ধরে যাবার সময় স্বতৃষ্ণ চোখে যা দেখলাম তাহলো সবুজ পাহাড় সুন্দর উপত্যকায় সবুজের আড়ালে লুকানো বিভিন্ন ডিজাইনের বাড়ি এবং অখন্ড শান্তিদায়ক এক নীরবতা। এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমেরিকা এবং দুনিয়ার অনেক জায়গারই সাধারণ দৃশ্য। তবুও আমি 'বেলায়ার' এবং 'বিভারলি হিল'কে ধনীদের স্বর্গভূমি বলবো। কারণ নামও দাম সৃষ্টি করে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের স্বর্গ সম্পর্কে যাদের ধারণা নেই তাদের কাছে সুখের হলেই তা স্বর্গ হয়ে দাঁড়ায়। তবে দুনিয়ায় এমন কোনো সুখ-স্বর্গ তৈরি হয়নি যাকে অতৃপ্তির অস্বস্তি এবং বেদনার তপ্ত অশ্রু স্পর্শ করে না।

সময় যেহেতু আমাদের কম সেজন্য আমরা হলিউডের প্রধান সড়কেই প্রথম প্রবেশ করলাম। এই সড়কেই রয়েছে হলিউডের প্রধান স্টুডিওগুলো। একটা স্টুডিওর সামনে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। চাইনিজ ঐতিহ্যে তৈরি স্টুডিওটি। এই স্টুডিওটির সামনে বিশাল চত্বর। এখানেই মানুষের ভিড় বেশি। চত্বর মূল্যবান পাথরে তৈরি। একেকটি পাথরে একেকজন নায়ক নায়িকা ও প্রযোজকের হস্তাক্ষর ও হাতের ছাপ খোদাই করা। বিখ্যাত কয়েকজন অভিনেতা অভিনেত্রীর হাতের ছাপ ও হস্তাক্ষর দেখলাম। এরপর আমরা হলিউড সিটি প্রতিষ্ঠার স্মৃতি স্তম্ভ দেখলাম। আসলে হলিউড শব্দটা ছিল এলাকাটা উন্নয়নের জন্যে গঠিত একটি প্রতিষ্ঠানের নাম। সেই নামটা এখন একটা শহর ও সিনেমা শিল্পের সাথে একাত্ম হয়ে গেছে। এখন হলিউড বললেই আমেরিকান সিনেমার বিষয় সামনে আসে। আমরা হলিউড পাহাড়ে যাবার সময় একটা অখ্যাত রাস্তার বাড়ির ভিড়ে দাঁড়ানো হলিউড প্রতিষ্ঠাতার বাড়িটিও দেখলাম। হলিউড পাহাড়টি ঘুরে আমরা চলে এলাম আমাদের আজকের বড় প্রোগ্রামের জায়গায় বেলাল মসজিদে। বেলাল মসজিদে আমি ও ড. মোস্তাফিজ গেলাম, ইরউইন কার্ন যাননি।

লসএঞ্জেলসের এই এলাকা আমাদের একেবারে অজানা। বেলাল মসজিদের লোকেশন সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। আমরা মনে করেছিলাম বেলাল মসজিদ বিরাট একটি দর্শনীয় স্থাপনা হবে। অনেক খুঁজে অবশেষে বেলাল মসজিদের সাইনবোর্ডটি পেয়ে গেলাম। কিন্তু তার পিছনে দর্শনীয় কোনো স্থাপনা দেখলাম না। সাইনবোর্ডের পিছনে আমরা একতলা অস্থায়ী মতো একটি স্থাপনা পেয়ে গেলাম। জানলাম এটাই বেলাল মসজিদ। আমরা পরিচয় দিলাম।

www.pathagar.com

বেলাল মসজিদের ইমাম আবদুল করিম হাসান আমাদের স্বাগতম জানালেন। এবং মসজিদের অফিসে নিয়ে গেলেন। মসজিদের অফিস থেকেই বেলাল মসজিদ কমপ্লেক্সের বিশাল এলাকা আমরা দেখতে পেলাম। লসএঞ্জেলেস শহরের মাঝখানে প্রায় দেড় দুই একর জুড়ে বেলাল মসজিদ কমপ্লেক্স গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। সবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে এবং বিল্ডিং তৈরির জন্য গোটা এলাকা কয়েক গজ গভীর করে কাটা হয়েছে। কনস্ট্রাকশনের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। পরে আমরা মসজিদের সাইটে নেমেছিলাম। কর্তৃপক্ষ ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখালেন কোথায় কি হবে।

মসজিদের ইমাম আবদুল করিম হাসান একজন আফ্রিকান আমেরিকান মুসলিম। তাদের পরিবার আগে খৃস্টান ছিল। পরিবারের সবাই মুসলমান হয়েছে। মসজিদের অফিসে ও মসজিদে আরো যাদের দেখলাম সবাই কৃষ্ণাঙ্গ - সবাই আফ্রিকান আমেরিকান। জানলাম আফ্রিকান আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটি এই মসজিদ গড়ে তুলছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান আমেরিকান মুসলিমদের সংখ্যা ২০ লাখেরও বেশি। এই আফ্রিকান আমেরিকান মুসলিমরা প্রথমে এলিজা মোহাম্মদ আলীর অনুসারী ছিল। আমি আগেই বলেছি এলিজা মোহাম্মদ আলী ছিলেন একজন বিভ্রান্ত মুসলমান। তার মতাদর্শের সাথে ইসলামী আকিদার মিল ছিল না। পরে এলিজা মোহাম্মদ আলীর ছেলে ওয়ারেস বিন মোহাম্মদ সৌদি আরবে পড়াশুনা এবং সৌদি আলেমদের সংস্পর্শে আসার পর পিতার ভুল বুঝতে পারেন এবং ইসলামে ফিরে আসেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে তিনি পিতার সংগঠন ত্যাগ করে নতুন সংগঠন দাঁড় করান। আফ্রিকান আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটি এখন ওয়ারেস মোহাম্মদকেই নেতা মানেন।

বেলাল মসজিদের অফিসে বসে মসজিদের ইমাম আবদুল করিম হাসানের সাথে তাদের কাজ, সুবিধা-অসুবিধা, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। তিনি বেলাল মসজিদের প্রকল্প সম্পর্কে জানালেন, একটি বড় আকারের মসজিদ ছাড়াও এখানে স্কুল হবে, প্লে গ্রাউন্ড থাকবে, সমৃদ্ধ পাঠাগার তৈরি হবে। মসজিদটিকে মুসলিম কমিউনিটির কেন্দ্রে পরিণত করা হবে। সব কমিউনিটির জন্যে আমাদের কমিউনিটি সেন্টার উন্মুক্ত থাকবে। তিনি বললেন, বেলাল মসজিদ কমপ্লেক্স এলাকা শুধু মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র নয়, সব ধর্মের লোকের জন্যে হবে একটি নিরাপদ আশ্রয় (Safe Haven) কেন্দ্র। ইমাম আবদুল করিম হাসান তাদের ধর্মীয় জীবন সম্পর্কেও নানা তথ্য দিলেন। বললেন, তারা

www.pathagar.com

আফ্রিকান আমেরিকানরা চার ইমামের কোনো এক মাযহাব নয় বরং কুরআন হাদিসের অনুসরণে শরিয়ত পালন করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আফ্রিকান আমেরিকান কমিউনিটির যত ইমাম আছে তারা মাঝেমাঝেই এক সাথে বৈঠক করেন। সেখানে নানা সমস্যা নানা প্রশ্ন ও করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। এ ধরনের একটা বৈঠক খুব শিগগিরই জর্জিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। এই সাথে তিনি জানালেন অন্যান্য মুসলিম কমিউনিটির সাথেও তারা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করেন। ইসনা ও ইকনাসহ (ISNA, ICNA) আমেরিকান সকল মুসলিম সংগঠনের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। একমাত্র কাদিয়ানি ও এলিজার গ্রুপ ছাড়া অন্য সকল মুসলিম সংগঠনকে তারা আপন বলে মনে করে। ইমাম আবদুল করিম হাসান জানালেন, বেলাল মসজিদের সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রায় লক্ষাধিক মুসলিম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। তিনি আনন্দের সাথে বললেন, আমেরিকা একটি মুক্ত সমাজ। এখানে তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছেন। প্রকাশ্যে ও উচ্চ কণ্ঠের আজানে এখানে কোনো বাধা নেই। তবে যে এলাকায় ব্যাপক অমুসলিম বসতি, সেরকম এলাকার কোথাও কোথাও অমুসলিমদের অসুবিধার কথা চিন্তা করে মাইকে উচ্চকণ্ঠে আজান দেয়া হয় না। ইমাম আবদুল করিম বললেন, প্রয়োজনের তুলনায় আমেরিকায় মসজিদের অভাব রয়েছে। এই অভাব থেকেই আমেরিকায় মসজিদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ইসলামের প্রচার এবং মুসলমানদের ইমেজ নিয়ে কথা উঠলো। এই প্রসঙ্গে ইমাম আবদুল করিম হাসান তার একটা উদ্বেগের কথা জানালেন। বললেন, আমেরিকা ও মুসলিম দেশগুলোতে চরমপন্থীদের সন্ত্রাসমূলক কাজকে তারা খুব ভয় করেন। এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটলেই বুকে দারুণ একটা আঘাত লাগে। মুসলমানদের দ্বারা সন্ত্রাসের ঘটনা তাদের খুব ক্ষতি করে। তাদের লজ্জিত করে, আহত করে। এ ধরনের ঘটনায় তাদের প্রচার কাজ ব্যহত হয় এবং সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। তিনি বললেন, এ ধরনের কাজকে ইসলাম সমর্থন করে না। যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সে চেষ্টা সবাইকে করা উচিত। তিনি বললেন, ইসলাম শান্তির এবং প্রচারমূলক ধর্ম। অমুসলিমদের সাথে মিশে নিজেদের কাজ ও চরিত্র দ্বারা অন্যদের কিভাবে আকর্ষণ করা যায় সেদিকেই আমাদের মনোযোগ বেশি দেয়া দরকার। দাওয়া কাজের সাফল্যের জন্যে মানুষের কাছাকাছি পৌঁছতে পারাই সবচেয়ে বড় কথা। আমেরিকায় খৃস্টানরা মুসলমানদের বেশি ঘনিষ্ঠ। তিনি তাদের আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটির সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে বললেন, অফিস-

www.pathagar.com

আদালতে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অমুসলিম আফ্রিকান-আমেরিকানরা তাদেরকে বিশেষ সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। স্থানীয় নির্বাচনে অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমানরা ব্যালান্স অব পাওয়ার। আমরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করি। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় নির্বাচনে মুসলমানরা নির্বাচিত হয়। তিনি আরো একটা মজার কথা জানালেন, আমেরিকান কনজারভেটিভ রাজনীতিকরা বাইরের মুসলিম দেশগুলোর জন্যে হয়তো ভালো, কিন্তু আমেরিকান মুসলমানরা লিবারেল রাজনীতিকদের বেশি পছন্দ করে। এই প্রসঙ্গে আরো বললেন, আমেরিকান সরকার সেক্যুলার থাকুক এবং সরকারিভাবে স্কুলে ধর্ম শিক্ষা না হোক এটা আমেরিকান মুসলমানরা চায়। ইমাম আবদুল করিম এক সময় ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন, খুবই দুঃখের কথা যে বিভিন্ন দেশ থেকে যেসব মুসলিম ইমিগ্রান্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসে তারা সুবিধা নেয়ার জন্য খৃস্টান নাম গ্রহণ করে। অথচ আমরা যারা খৃস্টান ধর্ম থেকে ইসলাম গ্রহণ করেছি তারা গর্বের সাথে মুসলিম নাম গ্রহণ করেছি। সুবিধা বা স্বার্থের দিকে আমরা তাকাইনি। এ প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ইহুদীরা নাম পরিচয় গোপন করে নির্বাচন করে থাকে সুবিধা পাওয়ার জন্যে। কিন্তু আমরা পরিচয় গোপন করি না। ধর্মান্তর সম্পর্কে একটা প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খৃস্টান পরিবার থেকে কেউ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে পরিবার ছাড়তে হয় না। বরং পরিবারে তারা বেশি সম্মানিত হয়। দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া এটাই সাধারণ দৃশ্য। তাদের সানডে ও অন্যান্য স্কুলগুলো শুধু কি মুসলমানদের জন্যে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, খৃস্টান মার্কিনীরা, অনেকক্ষেত্রে ইহুদীরাও তাদের ছেলে-মেয়েকে আগ্রহ করে মুসলিম স্কুলে পাঠান ভালো চরিত্র তৈরি হবে বলে। তারা মুসলমানদের সংযমী জীবন ও পরিবার ব্যবস্থাকে পছন্দ করে। আরো একটা তথ্য তার কাছ থেকে জানলাম, আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিম নেতা ওয়ারেস দীন মুহাম্মদ সিনেটে বক্তৃতা করার সুযোগ পান।

জুমার নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের এ আলোচনা চললো। জুমুআর নামায পড়লাম আমরা বেলাল মসজিদে। হাজির মুসল্লিদের মধ্যে পঞ্চাশজনের মতো পুরুষ এবং পনরজনের মত মহিলা। আমরা দু'জন এবং অপর তিনজন এশিয়ান ছাড়া সবাই আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিম। নামায শেষে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। উপস্থিত সবাই সম্মিলিত তকবির দিয়ে আমাদের স্বাগত জানালেন। আমাদের সাথে কোলাকুলি করলেন সবাই।

www.pathagar.com

আমাদের নামাজ শেষ করেই তাড়াহুড়া করে বের হতে হলো বেলাল মসজিদ থেকে। 'সানগাব্রিয়েল ভ্যালি'র ইসলামিক সেন্টারে আমরা দু'টার মধ্যেই পৌঁছবো কথা দেয়া আছে। মসজিদ থেকে বেরিয়ে দেখলাম ইরউইন কার্ন গাড়ি নিয়ে হাজির। আমরা গাড়িতে উঠলাম। দেখলাম ইরউইন কার্ন নাস্তার জন্য পাউরুটি বার্গার কিনে এনেছেন। আমরা সেটা খেয়ে হালকা নাস্তার কাজ সারলাম।

ঠিক দু'টাতেই আমরা গাব্রিয়েল ভ্যালি ইসলামিক সেন্টারে পৌঁছলাম। সেন্টারের পরিচালক আসলাম আব্দুল্লাহ আমাদের খোশ আমদেদ জানালেন। তিনি দিল্লীর লোক। আমেরিকায় তার নতুন বসতি। তিনি আমাকে দেখেই চিনতে পারলেন। ১৯৮৫ সালে ঢাকার ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এক প্রোগ্রামে তার সাথে আমার দেখা হয়। দশ বছর পর আবার দেখা হওয়ায় আমরা খুশি হলাম। তার সাথে ছিলেন আরো তিনজন পাকিস্তানী। তারা লাঞ্চের জন্য আমাদেরকে একটি চাইনিজ মুসলিম রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন। খেতে খেতেই ইসলামিক সেন্টার নিয়ে কিছু কথা হলো। সানগাব্রিয়েল ভেলি ইসলামিক সেন্টার 'মিনারেট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে দেখলাম বেলাল মসজিদ কর্তৃপক্ষের মত তারাও পাবলিক স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষার বিপক্ষে। প্রশ্ন তুললাম তাহলে তাদের সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা কিভাবে হবে। বর্তমান অবস্থায় তারা হয়তো ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে অনেক বেশি জানেন, এখন হয়তো সন্তানদের ধর্মীয় শিক্ষা বড় কোনো সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু সেকেন্ড জেনারেশনের সময়ে ধর্মীয় শিক্ষা দান এবং ধর্মীয় আইডেন্টিটি রক্ষার ব্যাপারে যে সংকটের সৃষ্টি হবে তার মোকাবিলা তারা কিভাবে করবেন। এমন সংকট যে সৃষ্টি হবে তা তারা স্বীকার করলেন। তবে বললেন, মুসলিম কমিউনিটির ঐক্য ও চেষ্টার মাধ্যমে এই সংকটের মোকাবিলা করতে হবে। লাঞ্চ শেষে আমরা আরো কিছু আলাপ করলাম তাদের ঘরোয়া ও সামাজিক কিছু সমস্যা নিয়ে।

বিদায়ের সময় তারা আমাদের কিছু বই ও পত্রিকা উপহার দিলেন। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। বিকাল ছয়'টা পর্যন্ত হোটেলে বিরাট একটা রেস্ট হলো আমাদের। ঠিক ছয়'টায় মুজিব ও আশরাফ সাহেব এলেন। আমরা সি বীচে গেলাম তাদের সাথে। বীচে আমরা অনেক ঘুরে বেড়ালাম। তারপর প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে কিছু ছবি তুললাম আমরা। সী বীচ থেকে আমরা গেলাম বার্কলে'র অবজারভেটরি দেখতে। লসএঞ্জেলসের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়

www.pathagar.com

শীর্ষে এই অবজারভেটরি। গাড়ি নিয়ে ওঠা যায় অবজারভেটরিতে পাহাড়ের আকাঁবাকাঁ পথে। অবজারভেটরির সামনে পার্কিং এর জায়গায় আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। অবজারভেটরিতে ঢুকে যা শুনলাম তাতে হতাশ হলাম আমরা। অবজারভেটরির টেলিস্কোপ আজ বন্ধ। বহু আশা করে এসেছিলাম আকাশ দেখব বলে সেটা হলো না। প্লেনোটরিয়ামে কিছু দৃশ্যাবলী আমরা দেখলাম। অবজারভেটরির সুভেনির সপ থেকে চাবির রিং এবং দু'টি বই কিনলাম। বেরিয়ে এলাম অবজারভেটরি ভবন থেকে। গিয়ে দাঁড়ালাম পাহাড়ের কিনারায়। পাহাড় থেকে লসএঞ্জেলসের দৃশ্য দেখার জন্যে। দেখলাম নতুন রুপে লসএঞ্জেলস্‌কে। শহরটা যে কত বড় অবজারভেটরির মতো অত উঁচু জায়গা থেকে দেখেও তা ঠিক করা গেল না। টেলিস্কোপে আকাশ দেখতে না পারলেও পাহাড় থেকে লসএঞ্জেলস দেখার সুযোগ পাওয়ায় ক্ষতিটা কিছু পূরণ হলো। পাহাড় বেয়ে এত উঁচুতে উঠেছিলাম তায়েফের পাহাড়ে, পবিত্র মক্কা থেকে পুরানো পার্বত্য পথে তায়েফ যাওয়ার সময়। পরে উঠেছিলাম মালয়েশিয়ার গেন্টিং হাইল্যান্ডে। আরেকবার নেপালের কাটমুন্ডুতে পাহাড় শীর্ষের এক মন্দিরে। এই চারের মধ্যে আমার মনে হয় তায়েফের পার্বত্য পথই সবচেয়ে উঁচু। সেখানে উঠার সময় বাসে বসে অনেক নিচু থেকে আমি মেঘ উঠে আসতে দেখেছি। এখন যারা পবিত্র মক্কা থেকে তায়েফ যান, তারা এই দৃশ্য দেখার সুযোগ পান না। পবিত্র মক্কা থেকে তায়েফ যাওয়ার জন্যে মরু অঞ্চল দিয়ে নতুন পথ তৈরি হয়েছে। ১৯৮১ সালে তায়েফে অনুষ্ঠিত ওআইসি'র তৃতীয় শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেয়া কালে আমি পাহাড়ী পথে মক্কা-তায়েফ যাতায়াত করেছি।

অবজারভেটরি থেকে নেমে আমরা মফিজ সাহেবের কারি (Curry House) হাউজে গেলাম। সেখানে সবাই মিলে ডিনার করে আশরাফ সাহেবের বাসায় গেলাম। আশরাফ সাহেব বাসায় পৌছে কাজে চলে গেলেন। তার দেরি হয়ে গেছে। গতকালও তার কাজে যেতে দেরি হয়েছিল আমাদের জন্য। সেখান থেকে ঢাকায় আমার অফিস ও বাসায় টেলিফোন করলাম। পরে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আমাদের যেতে হলো মুজিব সাহেবের বাসায়। তারা প্রচুর ফলমূল আমাদের চাপিয়ে দিলো। এই ফলের ভার নিয়ে রাত বার'টায় পৌছলাম আমরা হোটেলে।

মে ২৭ তারিখ শনিবার। ঘুম থেকে উঠলাম হালকা মন নিয়ে। আজ ভারি কোনো প্রোগ্রাম নেই। বরং আনন্দ আছে ডিজনিল্যান্ডে যাবার। ডিজনিল্যান্ড সম্পর্কে

www.pathagar.com

অনেক শুনেছি। সাত'টি কল্পনাসঞ্জাত থিম নিয়ে ডিজনিল্যান্ড তৈরি। ডিজনিল্যান্ডে মানব জাতির অতীত এবং ভবিষ্যতের অভিযাত্রার কাল্পনিক দৃশ্যকে মূর্তিমান করে তোলা হয়েছে। ওয়ালটার ডিজনি তার এই কল্পনার জগৎ তৈরি করার আগে পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য সব বিনোদন পার্ক পরিদর্শন করেন। এসব থেকে তিল তিল করে সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে তিনি তার ডিজনিল্যান্ডে আরো সুন্দর করে রূপায়িত করেছেন। ডিজনিল্যান্ডে গেলে পৃথিবীর অনেক দেশের দুর্লভ দৃশ্যকে তার স্বরূপে দেখা যায়। ডিজনিল্যান্ড তার দৃশ্যাবলীতে পৃথিবীর বিভিন্ন সময়কেও ধরে রেখেছে। ডিজনিল্যান্ড দেখার পর এই অনুভূতিগুলো আমার হয়েছে। ১৯৫৪ সালে একশ ষাট একর জমির ওপর ডিজনিল্যান্ড তৈরির কাজ শুরু হয়। লসএঞ্জেলসের প্রায় উপকণ্ঠে একটা বিশাল এলাকা বেছে নেন ওয়াল্টার ডিজনি তার স্বপ্নের রাজ্য তৈরির জন্য। ডিজনিল্যান্ড তৈরি শেষ হয় ১৯৫৫ সালের জুলাইতে। কিন্তু এরপরও ডিজনিল্যান্ড সম্প্রসারিত হয়েছে কয়েকবার, ১৯৬৬, ১৯৭২, ১৯৯৩ সালে। ডিজনিল্যান্ড তৈরিতে খরচ হয় সতের মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রায় ২৫ হাজারের মতো কর্মকর্তা-কর্মচারি কাজ করে এই ডিজনিল্যান্ডে। ডিজনিল্যান্ড তৈরির পর এ পর্যন্ত ছয়শ পঞ্চাশ মিলিয়ন মানুষ ওয়ালটার ডিজনির এই স্বপ্নরাজ্য পরিদর্শন করে।

আমরা আট'টার মধ্যে ডিজনিল্যান্ডের জন্য হোটেলরুম থেকে লবিতে বের হয়ে এলাম। আমি অন্যান্য দিনের প্রোগ্রামের মতোই পোশাক পরে ছিলাম। লবিতে নামলে ইরউইন কার্ন আমাকে বললেন, মিস্টার আবুল আসাদ আমরা ফরম্যাল কোনো অনুষ্ঠানে যাচ্ছি না। প্লিজ আপনি পোশাক পাল্টান। আমি রুমে গিয়ে সার্ট ও সোয়েটার পরে এলাম। তাড়াহুড়ার কারণে সার্টের একটা কলার সোয়েটারের মধ্যে ঢুকে ছিল। এ ব্যাপারে কেউ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। আমিও বুঝতে পারিনি। ইরউইন কার্ন এর কাছ থেকে ছবি পাওয়ার পরই ব্যাপারটা আমার নজরে পড়ে।

আমরা ডিজনিল্যান্ডে যাওয়ার পথে প্রথমে গেলাম পোস্ট অফিসে। ডেনভার এবং লসএঞ্জেলসে যে বই ও কাগজ-পত্র পেয়েছিলাম তা দেশে পোস্ট করার জন্য। সার্ফেস মেলে পাঠাতে আমার লাগলো সাড়ে সাত ডলার, ওয়াশিংটন থেকে পাঠাতে লেগেছিল সাড়ে ছয় ডলার। ডিজনিল্যান্ডে আমরা প্রবেশ করলাম সকাল দশ'টায়।

www.pathagar.com

যাকে বলে 'বার্ড আই ভিউ', সেভাবে ডিজনিল্যান্ড দেখতেই আমাদের সময় লেগে গেল তিন ঘন্টা। আমরা এক'টায় বের হয়ে এলাম ডিজনিল্যান্ড থেকে। বেশ কিছু অংশ দেখা বাকি রয়ে গেল।

ডিজনিল্যান্ড শুধু আনন্দের নয়, শিক্ষারও। শুধু মার্কিন ইতিহাস নয় বিশ্বের ইতিহাস-চিত্রের দর্শন মিলে এখানে। আমাদের গ্রামীণ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী কুঁড়েঘর ডিজনিল্যান্ডের এক কৃত্রিম নদীর তীরে আমি দেখেছি। এইভাবে ডিজনিল্যান্ডের বিভিন্ন থিমে, বিভিন্ন দেশের, পৃথিবীর বিভিন্ন সময়ের কাহিনী, দৃশ্য ও দৃশ্যপট আমি দেখেছি। তিন ঘন্টা ডিজনিল্যান্ড পরিদর্শনের সবশেষে দেখলাম 'A Great Moment with Abraham Lincoln'। দেখে মনে হলো শেষ কথাটাই যেন সব কথা। ডিজনিল্যান্ডের দীর্ঘ চিত্র-বিচিত্র কাহিনীমালা ও দৃশ্যাবলী দেখানোর পর পরিশেষে মার্কিন ছেলেমেয়েদের একজন সম্পূর্ণ আমেরিকান, সম্পূর্ণ দেশপ্রেমিক করে ছেড়ে দেয়া হচ্ছে। আনন্দ-বিনোদনকেও যে তারা এমন শিক্ষণীয় করে তুলেছে দেখে নিজের দেশের কথা ভেবে দুঃখ হলো। আমরা আমাদের জাতীয় পরিচয় নিয়েই বিতর্ক শেষ করতে পারিনি। আমাদের জাতীয় নেতাদেরকে এখনো বিতর্কমুক্ত করতে পারিনি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের শুরুটাও যেন এখনো চিহ্নিত হয়নি। ওরা আব্রাহাম লিঙ্কনকে দিয়ে ডিজনিল্যান্ড শো'-এর সমাপ্তি টেনেছে। আমরা কাকে দিয়ে শেষ করবো। এটাও যেন আমাদের চিহ্নিত নয়। ডিজনিল্যান্ড থেকে ফেরার পথে আমরা এক জায়গায় লাঞ্চ সারলাম। যাকে ব্রেকফাস্ট এর চেয়ে খারাপ বলা যায় না। আমরা হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন ২৮ মে ছিল লসএঞ্জেলসে আমাদের শেষ দিন। দুপুর বার'টার দিকে বিদায় নেয়ার প্লেন। কিন্তু তার আগে সকালে আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে। বাংলাদেশী কয়েকজন সকালে গেট টুগেদারের ব্যবস্থা করেছেন। সকাল সোয়া ছয়'টার দিকে দোলন ও মুজিব এলো আমাকে নিয়ে যেতে। আমি তৈরি ছিলাম। গেট টুগেদারের ভেনুটা একটা মেস। আমরা পৌঁছে দেখলাম যারা আসার কথা সবাই হাজির। প্রোগ্রাম শুরু হলো সাড়ে সাত'টায়। প্রোগ্রাম আর কি, আলোচনা। আমি আলোচনা করলাম বাংলাদেশের পরিস্থিতি, বিশ্বের অবস্থা এবং মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে। আমি দেখলাম বাংলাদেশের যারা আমেরিকায় কিংবা এই ধরনের বাইরের দেশে থাকেন তারা বাংলাদেশ নিয়ে খুব ভাবেন। সেই সাথে মুসলমানদের অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে দারুণ আগ্রহী। আমি

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সম্পর্কে বললাম, বাংলাদেশের গণতন্ত্র নিয়ে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেকার সংঘাত নিয়ে হতাশ হবার কিছু নেই। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্রের বয়স খুব বেশি নয়। যেসব দেশ এখন গণতন্ত্রের পাদপীঠ, যেমন আমেরিকা, বৃটেন, ইউরোপীয় দেশ ইত্যাদি, সেসব দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল হতে অনেক সময় লেগেছে। আমেরিকায় জাতীয় সংহতি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজকের অবস্থায় পৌঁছতে সিভিল ওয়ারের মতো একটা ভয়াবহ অধ্যায় অতিক্রম করতে হয়েছে। বৃটেনের পার্লামেন্টে রক্তারক্তির ঘটনাও ঘটেছে। সেসব রক্তারক্তির ইতিহাস পাড়ি দেয়ার পর বৃটেন গণতন্ত্রের স্থিতিশীল মুখ দেখতে পেয়েছে। সেই হিসেবে আমরা খুব হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় নেই। আমাদের স্বাধীনতার বয়স ২৫ বছর, এমন একটা সংক্ষিপ্ত সময়ে কোনো দেশ নিরুপদ্রব গণতন্ত্রে পৌঁছতে পেরেছে, তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আরো একটি বিষয়, আজকের বিশ্বে কোনো দেশই নানা রকম বৈদেশিক সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষার মধ্যে যেমন কল্যাণ আছে তেমনি অকল্যাণও আছে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। বড় দেশগুলো বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশ যদি বড় হয় এবং সম্পর্ক যদি দ্বান্দিক হয়, তাহলে ছোট প্রতিবেশীকে অনেক সময় রাজনৈতিক সংকটে পড়তে হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিও এ ধরনের সংকটের মধ্যে রয়েছে। তার কুফল সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের চেয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রকে আহত করে বেশি। আমাদের গণতন্ত্রের স্থিতিশীলতার পথে এটাও একটা বড় বাধা। বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়েও কিছু কথা বলতে হলো। এক্ষেত্রেও আমি বললাম, আজকের দুনিয়ায় বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোতে মুসলমানদের যে সংকট চলছে, তা যেন আমাদেরকে হতাশ না করে। মুসলিম জনগণ যদি স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশের সুযোগ পেত তাহলে হয়তো মুসলমানদের আদর্শিক সংকট অনেকটাই মিটে যেত এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাও যুক্তিসঙ্গত পর্যায় থাকত। কিন্তু তা হয়নি, তা হতে পারছে না। তার কারণ দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসনের কুফল। বিশ শতকের চল্লিশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যে অধিকাংশ মুসলিম দেশ স্বাধীন হয়ে যায় বটে, কিন্তু ঔপনিবেশিকদের তৈরি মন মানসিকতার অধীনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে। এই সমস্যা সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকটেরও জন্ম দেয়। মুসলিম দেশগুলোতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বকীয়তা অর্জন সম্ভব হয়নি, গণতন্ত্রও

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৫

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্তর-দক্ষিণে মানসিক যে বিভাগ, সেই বিভাগ অনুসারে টিনেসি দক্ষিণ ভাগের রাজ্য। বলা হয় যে, উত্তরের রাষ্ট্রগুলো ধর্মের ব্যাপারে অনেকটাই খোলামেলা। আর দক্ষিণের রাজ্যগুলো ধর্মীয় ব্যাপারে রক্ষণশীল। সেই অনুসারে টিনেসি রক্ষণশীল ভাগের মধ্যে পড়ে। আমি জানি না এই বিভাগের মধ্যে কতোটা সত্য আছে। টিনেসির রাজধানী নেসভিল যেমন খুব সুন্দর শহর তেমনি গুরুত্বের দিক দিয়ে নেসভিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ করে দক্ষিণের রাজ্যগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। নেসভিলকে 'ওয়াল স্ট্রিট অব দ্য সাউথ' বলা হয়। নেসভিলে রয়েছে শিল্প ও ব্যবসায়ের অসংখ্য ইউনিট। বাণিজ্যিক, শিল্প, কৃষি ও রসায়ন পণ্যের বড় একটি কেন্দ্র নেসভিল। এই নেসভিল জ্বালানি এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এর 'Oak Ridge National Laboratories দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নেসভিলকে 'এথেনস অব সাউথ'ও বলা হয়। নেসভিল শিক্ষা সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ পাদপীঠ। এখানে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নামকরা অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখানে রয়েছে স্বনামধন্য শক্তিশালী প্রকাশনা কেন্দ্র। এখানকার ধর্মীয় প্রকাশনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশের উল্লেখযোগ্য সব রেকর্ডিং কোম্পানি নেসভিলে রয়েছে। নেসভিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নগরগুলোর একটি। ১৭৭৯ সালে জেমস রবার্টসন এই নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে এটা ছিল নেসবুরো দুর্গ। জেনারেল ফ্রান্সিস নেস এর নাম অনুসারে এই দুর্গের নামকরণ করা হয়। টিনেসি ষোড়শ অঙ্গ রাজ্য হিসাবে ১৭৯৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়। ১৮৪৩ সালে নেসভিল টিনেসির স্থায়ী রাজধানীতে পরিণত হয়। নেসভিলকে আমাদের সফরের একটি স্থান হিসাবে বাছাই করায় আমরা খুশি হলাম। আসলে ইচ্ছা ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিপ সাউথের কোনো একটি অঙ্গরাজ্য সফরের সুযোগ পাওয়া। সেই সুযোগ পাওয়ায় এবং সেটা টিনেসি হওয়ায় আরো বেশি খুশি হয়েছিলাম। লসএঞ্জেলেস থেকে

www.pathagar.com

টিনেসি প্রায় বার'শ মাইলের সফর। আমাদের সফর পথ হবে কানসাস, মিসৌরি ও আরকানসাসের ওপর দিয়ে।

খুশি হলাম জানালার কাছে সিট পেয়ে। মিস্টার ইরউইন কার্ন বরাবরই চেষ্টা করেন প্লেনে জানালার পাশে আমাদের বসাতে, যাতে চলার পথে আমেরিকাকে আমরা দেখতে পাই। আজকের বসাটাও হয়তো তার চেষ্টারই ফল হতে পারে। কিন্তু খুব লাভ হলো না জানালার পাশে বসে। নিচে শুধু মেঘ আর মেঘ। মেঘের ফাঁকে কদাচিৎ দেখা যায় পর্বতের সারি এবং পার্বত্যভূমি। সোয়া ঘণ্টার মতো চলার পরে নিচে পরিষ্কার সবুজ সমভূমির সাক্ষাৎ পেলাম। অবশ্য সে ভূমিকেও মনে হলো পার্বত্য উপত্যকা। সব শেষে নজরে এলো দিগন্ত প্রসারিত সবুজ বনভূমি। মনে হলো এটাই টিনেসি, নদী পানি আর সবুজের দেশ। আমরা নেসভিলে ল্যান্ড করলাম বিকাল ছয়'টায়। ট্যাক্সি আমাদেরকে নিয়ে চললো হোটেলে। আমরা পৌঁছলাম ক্লাব হাউজ ইন-এ। এই হোটেলে আমরা থাকবো কয়েকদিন। পাঁচ তলায় আমাদের রুম। ওয়াশিংটনে ছিলাম দশ তলায়, ডেনভারে তের, লসএঞ্জেলেসে আট এবং এখন নেসভিলে পাঁচ তলায়।

হোটেল লবিতে দেখা হলো নেসভিলে আমাদের হোস্ট 'নেসভিল কাউন্সিল অব ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস' এর নির্বাহী পরিচালক মিস কাথেরিন স্টুয়ার্টের সাথে। লবিতে বসে তার সাথে কথা হলো। পরের দিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মেমোরিয়াল ডে'। ছুটির দিন। কোনো প্রোগ্রাম এ দিন ছিল না। লোকাল হোস্ট মিস কাথেরিন স্টুয়ার্ট আমাদের দাওয়াত দিলেন তার ফ্যামিলি পিকনিকে। তিনি তার পরিবারের পরিচয়ও দিলেন। এক ছেলে, ছেলের বউ ও নাতি নিয়ে তার সংসার। তিনি বললেন, তার নাতির চেয়ে ভালো নাতি আর কোথায় নেই। কে একজন বললেন, সব গ্রান্ডমাদারের কাছে তার নাতি এরকমই হয়। সবাই মিলে হাসা হলো।

কাউন্টার থেকে টিকিট নিয়ে হোটেলের রেস্টুরেন্টে গিয়ে জুস খেলাম। আমাদের তিনজনকে চারটি করে টিকিট দেয়া হলো চারদিনের ব্রেকফাস্টের জন্য। এরপর হোটেল রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ভালো ঘুম হলো। রাত এগার'টায় ঘুম থেকে উঠলাম। পাশের একটি রেস্টুরেন্টে কার্ন আমাদের নিয়ে গেলেন। ডিনারের চিন্তা বাদ দিয়ে হালকা নাস্তা করে আমরা রুমে ফিরে আসলাম। লম্বা একটা ঘুম আমাদের হয়েছে। টিভি খুললাম লোকাল প্রোগ্রাম কেমন তা দেখার জন্য। টিভিট্রিনিটি ব্রডকাস্টিং এর প্রোগ্রাম দেখলাম আমরা অনেকক্ষণ ধরে। এই

www.pathagar.com

চ্যানেল টিনেসির একটি জনপ্রিয় ধর্মীয় চ্যানেল। খৃস্ট ধর্মের ওপর দু'টো আবেগপূর্ণ বক্তৃতা শুনলাম। দক্ষিণের অঙ্গরাজ্য টিনেসি তাহলে উত্তর থেকে কিছুটা আলাদাই।

নেসভিলের প্রথম সকাল ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ালো। ঘুম থেকে উঠতে সকাল সাত'টা বেজে গেল। নামায ঠিক সময় হলো না। সফরে আসার পর আজই প্রথম এমনটা ঘটলো। ড. মুস্তাফিজ আমারও পরে ওঠলেন। নামায পড়লাম সোয়া সাত'টায়। ছুটির দিন বলে আট'টায় হোটেলের রেস্টুরেন্টে নাস্তা করে আবার হোটেলরুমে ফিরে এলাম। প্রোগ্রামের মধ্যে সুযোগ পেলেই আমি টিভি খুলে লোকাল প্রোগ্রামগুলো দেখতে চেষ্টা করি। আজ ছুটির দিন, অবারিত সুযোগ। আজও টিনেসিতে পপুলার ট্রিনিটি ব্রোডকাস্টিং নেটওয়ার্ক (TBN) এর চ্যানেল খুলে বসে গেলাম। দেখলাম খুব আবেগপূর্ণ একটা বক্তৃতা হচ্ছে। একজন তরুণ আমেরিকান বক্তা। তিনি চার্চের কিংবা কোনো চার্চ আন্দোলনের লোক কিনা তা বলতে পারছি না। কারণ শুরুটা আমি দেখিনি। তিনি বলছিলেন, বিশ বছর আগেও যে আমেরিকা বিশ্বের সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ ছিল সেই আমেরিকা আজ ঋণে জর্জরিত কেন। কেনোর উত্তর দিতে গিয়ে তিনি প্রথমত ইহুদীদের দায়ী করলেন, দ্বিতীয়ত দায়ী করলেন ঈশ্বর ও খৃস্ট থেকে দূরে সরে যাওয়াকে। একজন তরুণ আমেরিকানের বক্তব্য আমাকে বিস্মিত করলো। টিভি দেখার মধ্যেই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে জাগলাম টিভির শব্দেই, দেখলাম অরলিংটন জাতীয় সমাধিক্ষেত্রে মোমোরিয়াল ডে পালনের দৃশ্য। দৃশ্যটা একটা জাতীয় উৎসবের মতো। সেখানে প্রেসিডেন্ট এসেছেন, এসেছেন মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর সব বিভাগের প্রতিনিধি, অবসরপ্রাপ্তরা এবং জনগণ। অনুষ্ঠানে কথা বলা হলো সশস্ত্রবাহিনীর বর্তমান ও সাবেকদের পক্ষ হতে। কথা বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সব কথার সারাংশ হলো, স্বাধীনতা এবং শান্তি মূল্য ছাড়া পাওয়া যায় না। মূল্য হিসাবে তাদের কুরবানি দিতে হয়েছে তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। আমেরিকানদের জীবন তাদের স্বাধীনতা তাদের শক্তি ও শান্তি ঐ পূর্বসূরীদের ত্যাগের ফল। মানুষের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধে তারা যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেই ত্যাগ স্বীকার যেন আমেরিকানরা শান্তির জন্যও করতে পারেন। সবশেষে তারা বললেন, "ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সাহায্য করুন।" দৃশ্য দেখার সময় আমার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেছিল দেশের প্রতি, ঐতিহ্যের প্রতি, অতীতের প্রতি, অতীত নেতৃত্বের প্রতি তাদের আবেগ ও

www.pathagar.com

ভালোবাসা দেখে। দুঃখ হচ্ছিল নিজেদের জন্য। বর্তমান নিয়ে কথা বলতে গেলে আমরা অতীতকে, অতীত নেতৃত্বকে, আমাদের ঐতিহ্যকে দোষ না দিয়ে, নিন্দা না করে, বিতর্ক না তুলে, আমরা কিছুই বলতে পারি না। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, স্বাধীনতার ঘোষণা, স্বাধীনতার যুদ্ধ, স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেছেন, যুদ্ধোত্তর দেশকে যারা গঠন করেছেন, দেশকে যারা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন এসব কোনো বিষয়ই এখন আমাদের বিতর্কের বাইরে না। ইতিহাসের ধারাবাহিকতাও নির্দয় উপেক্ষার শিকার।

টিভি দেখে আমরা সময় কাটালাম প্রায় সাড়ে বার'টা পর্যন্ত। তারপর গোসল করে আমরা তৈরি হলাম পিকনিকে যাবার জন্য। মিস কাথেলিন স্টুয়ার্ট গত রাতেই তার পারিবারিক পিকনিকে আমাদের দাওয়াত দিয়ে রেখেছেন। বেলা সাড়ে বার'টার দিকে মিস ক্যাথেলিন হোটেলে এলেন। আমরা তার সাথে চললাম পিকনিকে। পিকনিকের স্থানটা নেসভিল শহর থেকে বেশ একটু দূরে, ওয়ারনার পার্কে। আমরা মিস ক্যাথেলিনের সাথে ওয়ারনার পার্কে পৌঁছলাম। পিকনিকের অন্যান্যরা তখনও ওখানে পৌঁছেনি। অল্প কিছুক্ষনের মধ্যেই মিস ক্যাথেলিনের ছেলে টিম ও টিমের স্ত্রী তাদের ছেলে বেঞ্জামিনকে নিয়ে পৌঁছলেন পার্কে। তারা খাবারও নিয়ে এলেন। আমাদের পরিচয় হলো সবার সাথে।

পার্কটি খুব বড় নয় তবে খুব সুন্দর। আমেরিকার পার্কগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেচারাল। খুব বেশি সাজগোজ করে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় না। এটাও তেমনি এক নেচারাল পার্ক। পার্কের এক জায়গায় আমরা পলিথিন ও চাদর বিছিয়ে সবাই বসলাম। খেতে খেতে কথা শুরু হলো আমাদের। আমি মিস ক্যাথেলিনের ছেলে টিমকে বললাম, আমেরিকার এভারেজ পরিবারে প্রতিদিন জীবন শুরু হয় কিভাবে। সে বলল, সকালে আমাদের জীবন শুরুর প্রথম কাজ হলো ব্রেকফাস্ট। আমরা বাংলাদেশে কিভাবে জীবন শুরু করি সেটাও সে জানতে চাইলো। আমি বললাম, সাধারণভাবে প্রার্থনার মাধ্যমে আমাদের দিনের যাত্রা শুরু হয়। সূর্য ওঠার আগেই প্রার্থনা শেষ করতে হয়। টিম এবং অন্য সবাই প্রার্থনা দিয়ে দিন শুরুর বিষয়টাকে প্রশংসা করলেন। বললেন খৃস্টান সমাজে প্রতিদিন প্রার্থনার এমন আনুষ্ঠানিকতা নেই। আমি টিমের কাছে আরও একটি বিষয় জানতে চাইলাম। বললাম, আমি মার্কিনীদের জীবন সম্পর্কে দুই ধরনের কথা পড়েছি। কোথায় বলা হয়েছে, আমেরিকানরা আত্মমুখী (Self Centered), কোথায় আবার পড়েছি আমেরিকানরা খুব সমাজসেবী। তাদের

www.pathagar.com

শুধু রেজিস্টার্ড ভোলান্টিয়ারের সংখ্যাই ষাট মিলিয়োন। টিম তার জবাবে আমেরিকার ব্যক্তি ও সমাজ সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। যার সারাংশ হলো, আত্মমুখীতা সব সময় দোষের নয়। যখন তা অন্যের ক্ষতি করে শুধু তখনই তা দোষণীয় হয়ে দাঁড়ায়। ভালো মন্দ মিলিয়ে সমাজ। তবে আমেরিকানরা সাধারণভাবে সমাজসেবী।' এক পর্যায়ে আমি আরেকটা বিষয় জানতে চাইলাম, পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে, এটা ঠিক কি না। টিমই জবাব দিলেন। পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন এটা তিনি স্বীকার করলেন এবং সেই সাথে কারণও বললেন। তার মতে পিতা-মাতারা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, ছেলে-মেয়েদের তারা সময় দিতে পারেন না। ছেলে-মেয়েরা মানুষ হয় ডে-কেয়ার সেন্টারে, না হয় রাস্তায়। আমি হেসে বললাম, আপনাদের বেঞ্জামিন কিভাবে মানুষ হবে। টিম খুশি হলেন। উৎসাহের সাথে বললেন, আমার ছেলে অল্প সময় ডে-কেয়ার সেন্টারে থাকে। আমার স্ত্রী ছেলের জন্য সময় দেন। আমার মা সময় দেন। চিন্তা করছি ভবিষ্যতে আমিও ছেলেকে বেশি বেশি সময় দিব।

কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই আমাদের খাওয়াদাওয়া শেষ হয়ে গেল। আমরা পিকনিকের জিনিসপত্র গোছগাছ করে উঠে দাঁড়ালাম। পার্কের পরেই বিশাল জঙ্গল শুরু। মিস ক্যাথেলিন জানালেন, এ জঙ্গলের দৈর্ঘ্য প্রায় তিনশ কিলোমিটারের মতো হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের জঙ্গল আরো বেশ কয়েকটি রয়েছে। আমরা সবাই জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। দু'ধারে গভীর জঙ্গল তার মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা, খুব প্রশস্ত নয়। আমরা জঙ্গলের মধ্যে একটা পাহাড়ের চারদিকে ঘুরলাম। এতেই সময় গেল দু'ঘণ্টারও বেশি।

পিকনিক প্রোগ্রাম আমাদের সাঙ্গ হলো। টিম ও অন্যান্যদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মিস ক্যাথেলিনই আমাদের হোটেলে পৌছে দিলেন, বিকেল সাড়ে চারটার দিকে।

এ বেলায় আর আমাদের কোনো প্রোগ্রাম নেই। সময়টা আরাম করে কাটানো যাবে। মোস্তাফিজ সাহেব টিভি খুললেন। আমি তখন আধা শোয়া অবস্থায় কিছু একটা নোট করার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এক সময় তিনি আমাকে তার দেখা একটা টিভি সাক্ষাৎকারের কথা জানালেন। একজন আমেরিকান খৃস্টান একটিভিস্ট বলেছেন, ইহুদীদের পিতৃভূমি এখানে নয়। তারা আমাদের জেসাসকে হত্যা করেছে। তারা খৃস্টান বিরোধী। ড. মুস্তাফিজ সাহেবের এ কথা

www.pathagar.com

শুনে সকালের দেখা টিভি সাক্ষাৎকারের কথা তাকে জানালাম। একজন খৃস্টান তরুণ বক্তা অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলছিলেন, বিশ বছর আগে যে আমেরিকা সম্মানিত ও সম্পদশালী ছিল সেই আমেরিকা আজ ঋণগ্রস্ত, নানা সমস্যায় আক্রান্ত। এজন্য দায়ী ইহুদীরা। ড. মুস্তাফিজ সাহেব বললেন যে, এ সাক্ষাৎকার তিনিও দেখেছেন। তার কথা শুনে আমি নিশ্চিত হলাম যে আমি তাহলে ভুল শুনিনি। মার্কিন টিভি সাক্ষাৎকারের এ বক্তব্য দু'টি আমেরিকার বর্তমান বাস্তবতায় অস্বাভাবিক বলে বোধ হয় আমি ভুলতে পারিনি। ঢাকায় আসার পর এক অনুষ্ঠানে আমেরিকান কূটনীতিকের সাথে দেখা হলে আমি সাক্ষাৎকারের ঐ দু'টি বক্তব্যের কথা আমি তাকে বলেছিলাম। তাকে জিজ্ঞাস করেছিলাম এ ধরনের কথা ও চিন্তা মার্কিন সমাজে সত্যই আছে কি না? তিনি বলেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত সমাজে সকলের কথা বলা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। এ ধরনের কথা কেউ তার মত হিসাবে বলতেও পারে এবং এ ধরনের চিন্তা কারো মনে থাকতেও পারে। তবে এদের সংখ্যা খুবই নগন্য। মার্কিন সমাজে এদের কথা ও চিন্তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না।

৩০ মে মঙ্গলবার ছিল আমাদের জন্য এক ব্যস্ত সকাল। সকালে উঠেই প্রথমে হোটেলরুম পরিবর্তন করতে হলো। রুমের বাথটাবে সমস্যা হওয়ায় ৫৩২ নং রুম থেকে ৫৩০ নং রুমে চলে এলাম। সাড়ে নয়টাতে ট্রিনিটি ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক (TBN)এর সাথে আমাদের প্রোগ্রাম। রুম পরিবর্তন শেষ করে আটটায় গেলাম হোটেলের রেস্টুরেন্টে। নাস্তার মেনু আমাদের একই রকম। আলু, ডিম, পাউরুটি ও বাটার দিয়ে নাস্তা সারলাম। তাড়াহুড়া হলেও নাস্তা ভালো হলো। হোটেলরুমে ফিরে এসে তৈরি হয়ে প্রোগ্রামে যাবার জন্য হোটেল লবিতে নেমে এলাম। দেখলাম ইরউইন কার্ন এসে বসে আছেন। মিস্টার কার্ন সত্যিই দায়িত্বশীল। তাকে কোনো দিন দেরি করতে দেখিনি।

আমরা ঠিক নয়টা ত্রিশ মিনিটে TBN অফিসে পৌঁছলাম। বিশাল এলাকা নিয়ে ট্রিনিটি ব্রডকাস্টিং নেটওয়াকের অফিস। নাম দিয়েছে তারা ট্রিনিটি সিটি। নেসভিল শহরের বেশ বাইরে। আমি আশ্চর্য হলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই ছোট নয়। কোথাও তা বিশাল এলাকা নিয়ে, আবার কোথাও বহুতল বিল্ডিং তাদের অফিস। তাদের ফান্ডও পিলে চমকে দেবার মতো।

TBN অফিসে ট্রিনিটি ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্কের এডমিনিস্ট্রেটর ডগলাস মার্স এর সাথে দেখা হলো। তিনি আমাদের স্বাগত জানালেন। তার অফিসে বসে আমরা কথা বললাম। তার সাথে আরেক জন মহিলা ছিলেন। তার নাম এখন আমি

www.pathagar.com

ভুলে গেছি। ট্রিনিটি ব্রডকাস্টিং নেটওয়াক নিয়েই আমরা কথা বললাম। মিস্টার ডগলাস মার্স ট্রিনিটি ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্কের কার্যক্রম সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানালেন, হেডকোয়ার্টারসহ পাঁচশ কেন্দ্র থেকে TBN এর প্রোগ্রাম প্রচার হয়। তিনি আরো জানালেন, TBN পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য সরকার কিংবা অন্য কারো কাছ থেকে তারা টাকা নেন না। তারা দর্শকদের ডোনেশনের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাকেন। এ ডোনেশন ইচ্ছাধীন। দর্শকরা মাসে পাঁচ ডলারের কম কেউ দেয় না। কেউ কেউ বেশিও দেয়। এক প্রশ্নের জবাবে মিস্টার ডগলাস মার্স বললেন, TBN রাজনীতি এড়িলে চলে। খৃস্টানদের ধর্মীয় জীবনে দু'টি দিক আছে। একটা ব্যক্তিগত, অন্যটা সামাজিক। তারা ব্যক্তিগত বিষয়ের ওপর অনুষ্ঠান প্রচার করে থাকেন। এড়িয়ে চলেন সামাজিক বিষয়। সামাজিক বিষয়কে গুরুত্ব দিতে গেলে রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। TBN এটা চায় না। TBN এর জনপ্রিয়তার বিষয় আলোচনায় এলে মিস্টার ডগলাস মার্স একটি তথ্য দিলেন। আশির দশকের শেষ দিকে খৃস্টান ব্রডকাস্টিং প্রোগ্রামগুলোর দর্শক সংখ্যা হঠাৎ কমে যায়। সে সময়ও TBN এর দর্শক সংখ্যা কমেনি। TBN এর দর্শক সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। তবে সেটা কত সে ব্যাপারে আপটুডেট তথ্য এই মুহূর্তে তার হাতে নেই জানালেন। খৃস্ট ধর্মের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। দুই শতেরও বেশি। এই অবস্থায় তারা কিভাবে খৃস্ট ধর্ম বিষয়ে প্রোগ্রাম প্রচার করেন, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, কোনো অসুবিধা হয় না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকলের মতামতকেই সম্মান করতে হয়। আমরা তাই করে থাকি। তিনি এ প্রসঙ্গে বললেন, খৃস্টান ধর্মের এই বহুত্ব তার কোনো দুর্বলতা নয়। বরং, শক্তির প্রতীক।

আমরা ক্রিস্টাল ক্যাথেডাল দেখেছি, TBNও আমি দেখলাম। আমার মনে হলো TBN উন্মুক্ত ও বাস্তববাদী এবং ক্রিস্টাল ক্যাথেডাল কিছুটা পোশাকী ও রহস্যপূর্ণ।

বেলা এগারটার দিকে আমরা TBN থেকে বিদায় নিলাম। একটায় আমাদের অন্য আরেকটি প্রোগ্রাম। প্রোগ্রামটি বিখ্যাত ভেন্ডার বিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্রিডম ফোরাম ফর ফাস্ট অ্যামেনমেন্ড সেন্টারের সাথে। আমরা সাড়ে এগারটার দিকে ভেন্ডার বিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছে গেলাম। প্রোগ্রামের তখনও দেড় ঘণ্টা বাকি। ভেন্ডার বিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়টি বেসরকারি মালিকানাধীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা সংস্কৃতিতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভূমিকা আছে। ছাত্র সংখ্যাও প্রচুর। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর পরিবেশে ঘুরে-ফিরে সময় কাটিয়ে দিলাম। বেলা একটার

www.pathagar.com

দিকে আমরা ফার্স্ট অ্যামেনমেন্ড সেন্টার অব ফ্রিডোম ফোরামে গেলাম। রিসেপসনিস্ট আমাদের স্বাগত জানিয়ে বসতে দিলেন। কফি খেতে দিলেন। আমি চা কফি খেতে অভ্যস্ত নই তবুও খেলাম। সব জায়গাতেই এটা ঘটেছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রফেসর গ্লেসী ক্যাম্পবেল এসে গেলেন। কফি সমেত আমাদের নিয়ে গেলেন তার অফিস কক্ষে। ভদ্রলোক খুব চটপটে এবং খুব হাসিখুশি। আমরা জেনেছিলাম ফার্স্ট অ্যামেনমেন্ড সেন্টারের দায়িত্ব পালন ছাড়াও তিনি চার্চের তৎপর একজন সামাজিক কর্মী। তিনি অনেক সময় ধরে তার সেন্টারের ইতিহাস ও কাজের বর্ণনা দিলেন। তিনি বললেন, ফার্স্ট অ্যামেনমেন্ডের মূল বিষয় হলো ধর্ম, সংবিধান ও বাক স্বাধীনতার সংরক্ষণ। তাদের ফার্স্ট অ্যামেনমেন্ড সেন্টারের দেখার বিষয় হলো স্বাধীনতাগুলো যাতে হরণ করা না হয়, আবার এ স্বাধীনতাগুলো সংরক্ষণ করতে গিয়ে বাড়াবাড়িও না হয়। আমি মুক্ত সমাজের প্রশ্ন তুলে বললাম, ফার্স্ট অ্যামেনমেন্ড যেমন ঐ সব স্বাধীনতা সংরক্ষণ করে, তেমনি আবার ঐ সব বিষয়ে সিনেট ও আইন প্রণয়নের অধিকার খর্ব করে মানুষের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে কি না। তিনি উত্তরে বললেন, না তা করা হয়নি। অধিকারগুলো সংরক্ষণ এবং তা নিয়ে বাড়াবাড়ি উভয় দিকেই লক্ষ করা হয়। আর এমন বিধান অনেক দেশের গণতান্ত্রিক সংবিধানে রয়েছে, যেমন বৃটেন। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বললেন, অধিকারগুলো সংরক্ষণ এবং এ নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে কি না তা দেখা সুপ্রিম কোর্টেরও দায়িত্ব এবং সুপ্রিম কোর্ট তা দেখে থাকে। আমি এক পর্যায়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, পাবলিক স্কুলে প্রার্থনার প্রবর্তনকে 'ধর্ম প্রতিষ্ঠা' বলা যাবে কি না। তিনি এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললেন, পাবলিক স্কুলে প্রার্থনা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। এত ধর্ম এবং ধর্মের এত বিধান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে যে প্রার্থনার প্রবর্তনকে সমর্থন দেয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে কোনো এক ধর্মের পক্ষে সরকার যেতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আমি আবার বললাম, পাবলিক স্কুলে ধর্ম শিক্ষা নেই, প্রাইভেট স্কুলে আছে। এইভাবে জাতিতো দুইভাবে গড়ে উঠছে। তিনি বললেন, হাঁ এটা হচ্ছে। পাশাপাশি দুইটা ধারা বা ধরন গড়ে উঠছে। কিন্তু মানুষেরই ইচ্ছায় তা হচ্ছে। গণতন্ত্রে এ অধিকার আছে। দীর্ঘ আলোচনার পর আমাদের বিদায়ের সময় হওয়ায় আলোচনায় ছেদ টানতে হলো। তার সেন্টারের পক্ষ থেকে বেশ কিছু বই তিনি আমাদের উপহার দিলেন। আমাদের বিদায় না দিয়ে তিনিও আমাদের সাথে উঠলেন। ভারি বইগুলো গাড়িতে নিতে তিনিও আমাদের সাহায্য করলেন। তার গাড়িতে তিনি আমাদের হোটেলে পৌঁছে দিলেন। হোটেলে গিয়েও গাড়ি থেকে বইগুলো তিনিও আমাদের সাথে নামালেন। আমরা

www.pathagar.com

তার ব্যবহারে সত্যিই মুগ্ধ হলাম। এ ধরনের মানুষ এবং এ ধরনের ব্যবহার আমরা খুব কমই পেয়েছি।

হোটেলে পৌঁছে কিছুক্ষণ রেস্ট নিবার পর আমরা মার্কেট দেখতে বের হলাম। উদ্দেশ্য দুইটি। একটি হলো, নেসভিলের মার্কেট দেখা, দ্বিতীয়, সুভেনীর হিসেবে টুকিটাকি কিছু কেনা। মার্কেটে ঘুরাফেরা করলাম। ঘড়ি কিনলাম। গিফট হিসেবে কয়েকটা টাই কিনলাম। আসলে আমেরিকার বাজারটা হলো যারা ডলার ইনকাম করে তাদের জন্য। আমাদের টাকার সাথে তুলনা করলে কিছুই কিনা যাবে না। একটা ছোট চিরুনী আমাদের দেশে দাম দু' টাকা চার টাকা। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ডলারে কিনলে সেটা পড়বে সত্তর থেকে আশি টাকা। যে ঘড়িটা কিনলাম বাংলাদেশী টাকায় সেটা চারটা ঘড়ির দাম। তবুও সুভেনীর হিসেবে কিছু কিনতেই হয়। অনেক জিনিস আছে যেটা বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। যা হোক মার্কেটে এসে আমাদের একটা বাড়তি লাভ হলো। মার্কেটের রেস্টুরেন্টে নাস্তা খাওয়া হয়ে গেল। সাতটার আগে আমরা হোটেলে ফিরলাম।

শুয়ে রেস্ট নিচ্ছিলাম। রুমের টেলিফোনটা বেজে উঠল। টেলিফোন ধরলাম। ও প্রান্ত থেকে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় একজন কথা বললেন। নাম বললেন, ডা. মুহাম্মদ আবদুল মালেক। পেশায় ডাক্তার। আমেরিকার এক মেডিকেল কলেজের শিক্ষক ছিলেন। এখন ডাক্তারী করেন। আমেরিকায় আছেন এক দশক ধরে। এসব কথা তিনিই আমাকে জানালেন।

আমেরিকার মেডিকেল কলেজের একজন বাঙালি শিক্ষক ও ডাক্তারের টেলিফোন পেয়ে খুবই বিস্মিত হলাম। ধরেই নিয়েছিলাম নেসভিলে কোনো বাংলাদেশী নেই। নেসভিলের একটি ইসলামিক সেন্টার ও একটি মসজিদের টেলিফোন নাম্বার পেয়েছিলাম। কিন্তু নেসভিলে এসে টেলিফোন করে সেখান থেকে কোনো সাড়া পাইনি। পরে জেনেছিলাম নামাজের সময় ছাড়া ওয়ার্কিং ডেতে কাউকে মসজিদে এবং সেন্টারে পাওয়া মুশকিল। পরে অবশ্য জেনেছিলাম ডা. মুহাম্মদ আবদুল মালেকই ঐ ইসলামিক সেন্টারের প্রধান। ডা. মুহাম্মদ আবদুল মালেক জানালেন, তিনি আমাদের নেসভিলে আসার খবর লসএঞ্জেলেসের অধ্যাপক আবদুল আউয়াল সাহেবের কাছ থেকে জেনেছেন। আজ বিকালে তিনি এটা জানতে পেরেছেন। সেই থেকে তিনি চেষ্টা করছেন টেলিফোনে পাওয়ার জন্য। ডা. মুহাম্মদ আবদুল মালেক বললেন, এখনই আপনাদের হোটেলে আসছি। আমি আপনাদের আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসব। আপনারা আজ রাতে আমার

www.pathagar.com

বাড়িতে ডাল ভাত খাবেন। নেসভিলে যেসব বাঙালি পরিবার রয়েছে আমি তাদেরও দাওয়াত করেছি। এলে তাদের সাথেও দেখা হবে।

আমরা রাজি হলাম। যদিও আমার পেটের অবস্থা ভালো ছিলো না। দুপুরে চিংড়ি মাছ ও আলু খেয়েছিলাম। সেই থেকে পেটটা ভার। সর্দি এলার্জিও বেড়েছে। ডাক্তার আবদুল মালেক যথাসময়ে এলেন। তার গাড়িতে আমরা তার বাসায় গেলাম। অন্যান্য বাঙালি পরিবারগুলো দেখলাম আগেই এসে গেছেন। শুনলাম নেসভিলে আটাশটি বাঙালি পরিবার রয়েছে। সবাই আমেরিকান নাগরিক এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। সবাই বড় বড় চাকরি করেন। তাদের মধ্যে যাদের কথা আমার এখন মনে পড়ছে তাদের মধ্যে রয়েছেন টিনেসি স্টেট ইউনিভার্সিটির এসোসিয়েট প্রফেসর আবু এন এন ওয়াহিদ পিএইচডি, ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের এসিসটেন্ট প্রফেসর মুহাম্মদ বদরুদ্দোজা পিএইচডি, ডাক্তার এ কে এম ফকরুদ্দিন এমডি, মুহাম্মদ এন খান পিএইচডি এবং ড. আবদুল্লাহ খৌজ। ড. আবদুল্লাহ খৌজ নেসভিল ইসলামিক সেন্টারের এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর এবং সভাপতি মুহাম্মদ আবদুল মালেক পিএইচডি, আমাদের হোস্ট। সবাই মিলে আনন্দ ও গল্পগুজবের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া হলো। কয়েকদিন পর সবজি, মুরগির দেশীয় তরকারি, ডাল ইত্যাদি আমাদের বাংলাদেশী রসনায় অমৃত বলে মনে হলো।

খাওয়ার পরই ডক্টর মুস্তাফিজ সাহেব হোটেলে ফিরে গেলেন। ডাক্তারের সাথে তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে রাত এগারটায়। দশটার মধ্যে তাকে হোটেলে পৌঁছতে হবে। খাওয়া শেষে আমরা ড. আবদুল মালেকের বিশাল ড্রইং রুমে বসলাম। কথাবার্তা শুরু হলো। মনে হলো ওনারা আমাদের কাছে পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছেন। কত প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসার মুখোমুখি যে হলাম! অধিকাংশ প্রশ্নই ছিল খুব মজার রকমের। প্রথমেই তারা জানতে চাইলেন বাংলাদেশের রাজনীতি কোন দিকে যাচ্ছে। আমি বললাম, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন এখন বাংলাদেশের মুখ্য রাজনীতি। ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে, যদিও সংবিধানে ছিল না, জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়েছিল। এখন তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থাকে সংবিধানে সংযুক্ত করারই আন্দোলন চলছে। আমার ধারণা অবশেষে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন করার ব্যবস্থা সংবিধানে সংযুক্ত হয়ে যাবে। যদি তা হয় তাহলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধীরে ধীরে সুস্থতা ফিরে আসতে পারে।' একজন জানতে চাইলেন, বাংলাদেশে সব দলই এক বা একাধিকবার ক্ষমতায় গেছে। জামায়াতে ইসলামী একটি পুরনো দল।

www.pathagar.com

এই দলটি বরাবর রাজনৈতিক আন্দোলনেও আছে। কিন্তু ক্ষমতায় যেতে পারেছে না কেন? আমি বললাম, এমন প্রশ্ন জামায়াতে ইসলামীর কোনো দায়িত্বশীলকে করলে তিনি সঠিক জবাব দিতে পারতেন। আমি যেটা মনে করি সেটা অবশ্য আমি বলতে পারি। আমি বললাম, জামায়াতে ইসলামী আসলে ইসলামী আন্দোলন, অন্যান্য দলের মতো নিছক রাজনৈতিক দল নয়। যে কর্মসূচি নিয়ে জামায়াতে ইসলামী কাজ করে নির্বাচনী রাজনীতি তার একটা অংশ মাত্র। জামায়াতে ইসলামীর মূল কাজ হলো কুরআন হাদীসের শিক্ষানুসারী ও চরিত্রবান লোক তৈরি করা। যারা দেশকে ভালোবাসবে এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসবে। যারা মানুষের ইহজীবনকে সুন্দর করার চেষ্টার সাথে সাথে পরকালীন জীবনকেও সুন্দর করার চেষ্টা করবে। এরা রাজনীতিও করবে, বেশিরভাগ জনগণের সমর্থন পেলে সরকারও গঠন করবে। মূল কাজ না করে যেনতেনভাবে ক্ষমতায় যাবার লক্ষ জামায়াতে ইসলামীর নেই। এই কারণেই জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় যায়নি বা যেতে পারেনি। ক্ষমতায় যেতে না পারলেও জামায়াতের ইসলাম ভিত্তিক রাজনীতি একদিকে ইসলামী জীবন পদ্ধতিকে মানুষের মধ্যে পরিচিত এবং এর বিকাশে সহায়তা করছে। অন্যদিকে দেশে ইসলামী রাজনীতির মধ্যপন্থী ধারা সৃষ্টি করছে, যা নিজ আদর্শ ও মতের শান্তিপূর্ণ প্রচার এবং গণতন্ত্র ও সহনশীলতা, সহঅবস্থানের ওপর ভিত্তিশীল।

কয়েকজন জানতে চাইলেন, আমরা যারা বিদেশে অমুসলিম পরিবেশে থাকি তারা মুসলমান ও ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। অধিকাংশ মুসলিম সংখ্যাগুরু ভূখণ্ড মুসলিম দেশ হিসেবে স্বাধীন। কিন্তু স্বাধীনতার পরও সেসব দেশে মুসলমানরা শান্তিতে নেই। ইসলামের অবস্থাও ভালো নয়। অন্যদিকে, গোটা দুনিয়ায় মুসলমানদের দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। স্বাধীন হওয়ার পরে মুসলিম দেশগুলো ঐক্যবদ্ধ হবে ইসলাম ও মুসলামানদের উন্নতি হবে এই আশাবাদ তো সফল হয়নি, উপরন্তু মুসলিম দেশগুলো এবং মুসলমানরা নানা ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার। মানুষের আশাবাদ কেন ব্যর্থ হলো ? আমি বললাম, এটা একটা জটিল জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা আজ শুধু এখানে নয়, সর্বত্র। দু'চার কথায় এর জবাবও বোধ হয় সম্ভব নয়। অল্প কথায় যা আমি বলতে পারি তা হলো, নিছক স্বাধীন সরকার গঠনের স্বাধীনতা কোনো জাতি বা কোনো দেশের সমস্যার সমাধান নয়। স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো দেশ বা জাতি যদি স্বাধীন শক্তির অধিকারী না হয়, তাহলে তার অর্থনীতি তার সংস্কৃতি, তার আদর্শ কোনো কিছুই আর স্বাধীন

www.pathagar.com

থাকে না। মুসলিম দুনিয়ায় এটাই ঘটেছে। মুসলিম দেশগুলো আজ স্বাধীন বটে, কিন্তু তাদের এই স্বাধীনতা পরনির্ভরশীল। বিশাল দেশ মিসর ছোট দেশ ইসরাইলের হাতে মার খেয়েছে কেন? মার খেয়েছে এই কারণে যে, মিসরের স্বাধীনতা রক্ষার শক্তি ছিল পরনির্ভরশীল। উপযুক্ত সময়ে সে যেমন সমরাস্ত্রের সরবরাহ পায়নি, তেমনি বাইরের ডিকটেশন মেনে তাকে চলতে হয়েছে। মুসলিম দেশগুলোর স্বাধীনতা রক্ষার শক্তিতে স্বাবলম্বী হবার একটা সোনালী সময় ছিল ১৯৪৫ থেকে ১৯৯০ - পঁয়তাল্লিশ বছরের দীর্ঘ সময়কাল। এই সময় দুই বৃহৎ শক্তি জোট, ন্যাটো এবং ওয়ারস, ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। মুসলিম দেশগুলো এই সময় স্বাধীনতা রক্ষার শক্তিতে স্বাবলম্বী হবার সীমাহীন সুযোগ পেয়েছিল। দ্বন্দ্বমান দুই পক্ষের কাছ থেকে তাদের সাহায্য আদায়ের সুযোগ ছিল। প্রয়োজনীয় টেকনোলজি করায়ত্ত করে স্বাধীনতা রক্ষার শক্তিতে তারা স্বনির্ভর হতে পারতো। আল্লাহ এই সময় মুসলমান দেশগুলোকে এই জন্য অঢেল নিয়ামতও দিয়েছিলেন। এই সময় মুসলমানরা যেমন স্বাধীন হয়, তেমনি মুসলমানরা অর্থনৈতিক শক্তিতে বলীয়ানও হয় এবং উভয় জোটের কাছ থেকে যা প্রয়োজন তেমন সহযোগিতা লাভের সুযোগও আল্লাহ সৃষ্টি করেছিলেন।

আল্লাহর দেয়া এই তিন নেয়ামতের সৎ ব্যবহার মুসলিম দেশগুলো করেনি। মুসলমানদের আজ দুর্ভোগ-দুর্দশার বড় কারণ এটাও। স্বাধীনতা রক্ষার শক্তিতে স্বাবলম্বী হবার মানসিকতা যদি তাদের থাকতো তাহলে শিক্ষা সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও তারা স্বাবলম্বী হবার এবং স্বকীয়তা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের চেষ্টা করত। কিন্তু কোনটাই হয়নি। এই না হওয়াই আমাদের বহুমুখী দুর্দশা ডেকে এনেছে। আমাদের এই আলোচনা চলল রাত এগারটা পর্যন্ত। অবশেষে আমাদের আলোচনা সভা ভাঙল। বিদায় নিলাম আমরা একে অপরের কাছ থেকে। সাক্ষাৎটা সব সময় আনন্দের হয়, বিদায়টা হয়ে থাকে বিষাদের। এখানে যাদের সঙ্গে আমি কয়েক ঘণ্টা ধরে আনন্দ ও কথাবার্তার মধ্যে থাকলাম, এদের সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতের সম্ভবনা আছে আমরা কেউ বলতে পারি না। জীবন-পথটা একমুখী পথের মতোই। এই পথে শুধু সামনে এগোনো যায় পিছনে ফেরা যায় না। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। রাত তখন সাড়ে এগারটা।

পরদিন সকালে উঠলাম পেটের ভালো অবস্থা নিয়ে নয়। খুব অস্বস্তি লাগছে। জানলাম মুস্তাফিজ সাহেবের পেটের অবস্থাও খারাপ। গতকালের চিংড়ি দু'জনেরই ক্ষতি করেছে। টেবিলে অনেক খাবার জিনিস পড়ে আছে। পাউরুটি,

www.pathagar.com

জেলি, জুস, বাদাম, ফিসবার্গার, আলুর চিপস ইত্যাদি। কিছুই খাওয়ার ইচ্ছা হলো না। হোটেলের রেস্টুরেন্টে সকালের খাবার ফ্রি পাওয়া যায়। গেলাম রেস্টুরেন্টে নতুন কিছুর সন্ধানে। এদিন আমাদের সাথে মিস্টার কার্ন ছিলেন না। হোটেলে আমাদের নাস্তার জন্য নতুন যা দেখলাম তার মধ্যে আলুর ফ্রাই ও ফিরনির মতো জিনিস পছন্দ হলো। মনে হলো পেটের জন্য খারাপ হবে না। খাবার জন্য আমরা এ দু'টি নিয়ে টেবিলে এলাম। মুস্তাফিজ সাহেব শুধু ফিরনির মতো জিনিসটাই নিলেন। আমরা সবে খাওয়া শুরু করেছি। ভালোই লাগছে। এ সময় মিস্টার কার্ন এসে পৌঁছলেন। আমাদের প্লেটে ফিরনি দেখেই তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, ফিরনি খাবেন না। ফিরনিতে শূকুরের চর্বি এবং শূকুরের গোস্তের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা দেয়া থাকে। ফিরনি খাওয়া আমাদের হলো না। পেটের ভিতরটা যেন পাক দিয়ে উঠলো। আলুর ফ্রাইটুকু এবং এক গ্লাস পানি খেয়ে উঠে পড়লাম। মুস্তাফিজসাহেবের কিছুই খাওয়া হলো না।

আজ আমাদের শিকাগো যাবার দিন। আমরা নাস্তা সেরে হোটেলে পৌঁছে ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে হোটেলের লবিতে নেমে এলাম। শিকাগোর প্লেন বারটা দশ মিনিটে। তার আগেই সাড়ে ন'টায় আমাদের একটা প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট আছে 'দৈনিক টিনিসিয়ান' এর ধর্ম বিষয়ক সম্পাদকের সাথে। আমরা লবিতে নেমে হোটেল লবিতে আমাদের ল্যাগেজগুলো রাখলাম। পরে তাড়াহুড়ো হতে পারে এ আশংকায় হোটেলের বিলও আমরা পরিশোধ করলাম। তারপর ছুটলাম পত্রিকা অফিসে। 'দৈনিক টিনিসিয়ান' এর অফিসে মিস্টার রে ওয়াডেল আমাদের স্বাগত জানালেন। তিনি এ পত্রিকার ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক। তার অফিসেই আমরা বসলাম। দেখলাম তিনি আমাদের বিষয়ে সব কিছুই জানেন। তার মানে তিনি আমাদের বায়োডাটা এবং সফর সংক্রান্ত কাগজপত্র আগেই পেয়েছেন। আলোচনা শুরু হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংখ্যাগুরুর বিশ্বাস খৃস্টধর্ম নিয়ে। খৃস্টধর্মের প্রচার ও প্র্যাকটিস বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল খৃস্টান গ্রুপগুলোর প্রতি তার ধারণা ভালো নয়। বিশেষ করে খৃস্টান ব্রডকাস্টিং প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে তার ধারণা খুবই খারাপ। তার মতে এসব প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ খরচ করে সে পরিমাণ উপকার খৃস্টান ধর্মাবলম্বীরা পায় না। তিনি বললেন, মার্কিন সমাজে ধর্মের প্রভাব বাড়ছে, চার্চ সদস্যের সংখ্যা বেশি হচ্ছে, মার্কিন ধর্ম বিশ্বাসীর সংখ্যা নব্বই ভাগ- এসব পরিসংখ্যানে তার আস্থা নেই। তার বক্তব্য হলো, ধর্ম কোথায়ও দেখি না। তিনি অনেকটা আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে বললেন, 'খৃস্টান ধর্মীয় গ্রুপগুলোর ঐক্য বিধান সম্ভব নয়। অনৈক্যের মূল সূত্র বাইবেলেই। বাইবেল নিয়ে যে বিতর্ক, তা আপনাদের ধর্মগ্রন্থ কুরআন

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৬

শিকাগো শহরের নামটা অনেকের মতই সেই শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই আমার কাছে পরিচিত। আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস 'মে দিবস' এর সূত্রপাত এই শিকাগোর হে মার্কেটের একটা ঘটনা থেকে। শিকাগো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ শহরগুলোর একটি। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। এই নগরীর অবস্থান অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার এই সীমান্ত শত শত মাইল বিস্তৃত বিশাল কয়েকটি হ্রদের সমষ্টি। এর মধ্যে শিকাগো শহরটি ইলিনয় স্টেটের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে, লেক মিসিগানের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। অন্যান্য বড় হ্রদের মধ্যে রয়েছে লেক সুপিরিয়োর, লেক হুরন ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিঠা পানির সর্ববৃহৎ উৎস এটাই। বর্তমানে শিকাগো উত্তর-মধ্য আমেরিকায় পণ্য সরবরাহের প্রধান বন্দর। সেন্ট লরেন্স সমুদ্র পথের মাধ্যমে এই পণ্য সরবরাহ হয়ে থাকে। শিকাগো বহু বিলিয়ন ডলারের পণ্য ব্যবসায় সম্পাদন করে থাকে। বিশ্ব বিখ্যাত ফরচুন ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় শিকাগো থেকে। বিশ্বের পাঁচশ সর্ব বৃহৎ কর্পোরেশনের মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি শিকাগোতে অবস্থিত। শিকাগো শহর ১৮৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু ১৮৭১ সালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গোটা শহর ধ্বংস হয়ে যায়। পরবর্তীতে গড়ে ওঠে আরো সুন্দর নগরী হিসেবে। এর কতকগুলো স্থাপনা বিশ্ব বিখ্যাত। টাইম লাইফ বিল্ডিং, শিকাগো সিভিক সেন্টার, ফার্স্ট ন্যাশনাল ব্যাংক বিল্ডিং, দি স্টেট অব ইলেনয় সেন্টার, জন হেনকফ বিল্ডিং– এগুলো শিকাগোর পরিচয়-চিহ্ন। শিকাগোকে বলা হয় আকাশচুম্বী বিল্ডিং এর জন্মভূমি। শিকাগোর একশ' দশ তলা 'সিইয়ার্স টাওয়ার' এই সেদিন পর্যন্ত ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ বিল্ডিং। শিকাগো শিল্প বাণিজ্যের মতোই শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র। ত্রিশটি উল্লেখযোগ্য কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে শিকাগো এলাকায়। ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো ১৮৯০ সালে প্রতিষ্ঠিত। শিকাগোর মিউজিয়াম অব কনটেমপরারি আর্ট, মিউজিয়াম অব সায়েন্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, মিউজিয়াম অব নেচারাল হিস্ট্রি, দি এডলার প্লেনেটেরিয়াম, অরিএন্টাল

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউট অ্যাট দি ইউনিভার্সিটি অব শিকাগো, ইত্যাদি সবগুলোই বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান। সব মিলিয়েই শিকাগো আমেরিকায় আমার আকর্ষণের একটি বড় কেন্দ্র। একটি লেক সিটি, পৃথিবীর উচ্চতম সিয়ারস টাওয়ারের নগরী, মুষ্টিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলীর শহর হিসাবে শিকাগো অনেকের কাছে স্বপ্নের শহর। আমরা ন্যাসভিল থেকে যাত্রা করেছিলাম দুপুর সাড়ে বারটার দিকে। চারশ' মাইল পথ অতিক্রম করে স্থানীয় সময় দু'টায় আমরা পৌঁছলাম শিকাগোতে। ল্যান্ড করার সময় আকাশ থেকে শিকাগোকে দেখলাম, শিকাগোর লেককে দেখলাম। মনে হলো দিগন্ত প্রসারিত সমুদ্র বক্ষ থেকে ওঠে এসেছে শিকাগোর আকাশ ছোঁয়া বিল্ডিংগুলো।

আমরা এয়ারপোর্ট থেকে পৌঁছলাম অ্যামবাসেডর ইস্ট হোটেলে। হোটেলটি নর্থস্টেট পার্কওয়েতে অবস্থিত। শিকাগোতে আমাদের হোস্ট ছিলেন 'ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটরস সেন্টার অব শিকাগো'। তারাই আমাদের হোটেলরুম রিজার্ভ করে রেখেছেন। আমরা হোটেল রুমে পৌঁছার পর পরই ড. মুস্তাফিজ সাহেবের ভাতিজা আব্দুল ফাত্তাহ সাহেবের টেলিফোন পেলাম। তিনি জানালেন, তিনি খাবার নিয়ে আসছেন। খুশি হলাম আমাদের লাঞ্চের সমাধানটা হয়ে গেল বলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচুর খাবার নিয়ে এলেন তিনি। তার একটা অংশ মাত্র আমরা খেতে পারলাম। অবশিষ্ট খাবার ফেরত দিতে হলো। তিনি বিদায় নিয়ে যাবার সময় বললেন, আমি রাতেও খাবার নিয়ে আসবো। এরপর পরই আমি টেলিফোন পেলাম জনাব শামছুর রহমানের ছেলে ডা. লাবলুর। সেও বলল, সন্ধ্যার দিকে আসবে। শামছুর রহমান সাহেব বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর (তখন ছিলেন)। রাত ন'টার দিকে খাবার নিয়ে এলেন আবদুল ফাত্তাহ সাহেব। পর পরই এলেন লাবলু এবং তার চার বন্ধু। আগেই প্রোগ্রাম ছিল তারা এলে আমরা বেরুবো। আমরা তৈরি ছিলাম। সবাই আমরা বেরুলাম, গেলাম লেক মিসিগানে। লেকের ভিতরে প্ল্যানেটোরিয়াম। সেখানেই ছিয়ানব্বই তলা হেসকোক বিল্ডিং। এই বিল্ডিংয়ের চুরানব্বই তলায় অবজারভেটরি। আমরা চুরানব্বই তলার অবজারভেটরিতে উঠলাম। সেখান থেকে দেখলাম শিকাগো শহরকে। এর চেয়ে বড় উচ্চতায় উঠেছি, কিন্তু সেটা পাহাড়ের উচ্চতা। মক্কা মোকাররমা থেকে পাহাড়ের পথে তায়েফ যাবার পুরনো যে পথ ছিল সে পথে আমি তায়েফ গেছি। আমার মনে হয় তার চেয়ে বেশি উচ্চতার কোনো পার্বত্য পথে উঠিনি। চুরানব্বই তলার মত এতো উঁচু বিল্ডিং-এ উঠা আমার জন্য প্রথম

www.pathagar.com

ঘটনা। এখানে দাঁড়িয়ে নীচের শহর দেখার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে। সেই রোমাঞ্চের প্রথম অনুভূতি আমি পেলাম। হোটেলে ফিরে এলাম রাত এগারটায়। সন্ধ্যার এই প্রোগ্রামটা আমার খুব ভালো লাগল। শিকাগোতে আমাদের ফরম্যাল প্রোগ্রাম শুরুর আগেই সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হয়ে গেল।

শিকাগোতে আমাদের প্রথম সকাল ছিল ১লা জুন বৃহস্পতিবার। সকালেই আমাদের প্রোগ্রাম আছে। আমরা হোটেল রেস্টুরেন্টে নাস্তা সারলাম। বেছে বেছে কর্ণফ্লেক্স আর দুধ দিয়ে নাস্তা করলাম। নাস্তার আইটেম বহু। কিন্তু কোন্‌টা খাওয়া যাবে, কোন্‌টা খাওয়া যাবে না এটাই সমস্যা। মিস্টার ইরউইন কার্নও আমাদের ভালো কোনো আইটেম সাজেস্ট করতে পারলেন না। অবশেষে পরিচিত খাবার দিয়েই আমাদের নাস্তা শেষ হলো।

মুসলিম জার্নালের সম্পাদিকা মিসেস আয়শা মোস্তফার সাথে আমাদের প্রোগ্রাম সকাল সাড়ে ন'টায়। পত্রিকা অফিসে মিসেস আয়শা মোস্তফাই আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তার অফিসে বসেই আমরা কথাবার্তা বললাম। তাদের জার্নাল নিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু হলো। পত্রিকাটির জন্ম এলিজা মোহাম্মদের হাতে। এখন পত্রিকাটির পরিচালক এলিজার ছেলে ওয়ারেস দীন মুহাম্মদ। তার হাতে পত্রিকা আসার পর পত্রিকাটি ইসলামের সঠিক সার্ভিস আনজাম দিতে পারছে। তিনি জানালেন, এই পত্রিকাটির পরিচালক এবং আমাদের আফ্রিকান-আমেরিকান কমিউনিটির নেতা ওয়ারেস দীন মুহাম্মদ মিশনারী কাজে এখন আটলান্টায়। তার কথাবার্তায় আরও জানলাম, আফ্রিকান-আমেরিকান মুসলিম কমিউনিটি দীন মুহাম্মদকে খুবই ভালোবাসে এবং তাদের নেতা হিসাবে মানে। জার্নালের সম্পাদিকা মিসেস আয়শা মোস্তফার সঙ্গে কথা বলে ভালোই লাগলো। ছোটখাট মহিলা। শ্যামলা। মনে হলো আফ্রিকান অরিজিন। খুবই বুদ্ধিদীপ্ত। ইসলাম, সমাজ সমস্যা, আমেরিকান সোসাইটি, আমেরিকান সংবিধান এবং আমেরিকান হিসাবে দায়িত্ব ইত্যাদি সব বিষয়ে খুবই সচেতন। স্বচ্ছ ধারণা রাখেন ধর্মীয় ও আর্থ-সামাজিক নানা বিষয়ে। আমেরিকান সমাজে কিভাবে আল্লাহর দীন প্রচার করতে হবে সে বিষয়ে তিনি যা বললেন খুবই ভাল লাগল। কথাবার্তার পর মিসেস আয়শা মোস্তফা তার পত্রিকা অফিস ঘুরে ঘুরে দেখালেন। এই পত্রিকা অফিসে আফ্রিকান আমেরিকান মুসলমানদের নেতা ওয়ারেস দীন মুহাম্মদের মেয়েও কাজ করেন। আয়েশা মোস্তফা তার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা বললাম, তার বাবার সাথে সাক্ষাতের

www.pathagar.com

খুব ইচ্ছা ছিল আমাদের। তিনি বললেন, এ ধরনের সাক্ষাতে বাবাও খুব খুশি হন। তারপর মেয়েটি আমাদের না জানিয়ে তার আব্বার সাথে যোগাযোগ করে টেলিফোনটা আমাদের দিলেন। আমরা খুব খুশি হলাম। আমরা পরিচয় দিয়ে তার সাথে কথা বললাম। আমেরিকান-আফ্রিকান কমিউনিটিকে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য আমরা তাকে ধন্যবাদ জানালাম। আমন্ত্রণ জানালাম আমাদের ছোট বাংলাদেশ সফরের। তিনি খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর দীন প্রচারই তার সব সময়ের কাজ। যে কোনো দেশের সফরই তার জন্য আনন্দের। মুসলিম জার্নালের ডিজাইনার আর্টিস্ট মাহমুদের সাথে পরিচয় হলো। তিনি পাকিস্তানি। তিনি জানালেন, ছাত্র জীবনে তিনি তার সামরিক অফিসার ভাইয়ের সাথে বাংলাদেশে কিছুদিন ছিলেন। তিনি আমাদের সাথে একটা ছবি তুললেন। আমরা ছবি তুললাম সম্পাদিকা মিসেস আয়শা মোস্তফার সাথেও।

মুসলিম জার্নাল অফিস থেকে আমরা বের হলাম সকাল এগার'টায়। এরপর আমাদের সাক্ষাৎ ক্যাথলিক লেখক ও কলামিস্ট টিম আনসওয়ার্থ এর সাথে। তার বাড়ির ঠিকানা লোকেশন আগেই নেয়া ছিল। লেক মিসিগানের তীরে তার বাড়ি। আমরা পৌঁছে গেলাম। তার বাড়ি লেক মিসিগানের একেবারে তীর ঘেঁষে। বাড়িটি দাঁড়িয়ে লেক মিসিগানের দিকে মুখ করে। সামনে তার লেক মিসিগানের শান্ত অথই জলরাশি। দৃষ্টির শেষ সীমায় আকাশের নীল এবং লেক মিসিগানের নীল এক সাথে মিশে গেছে। একজন লেখকের কল্পনা পাখা মেলার মতো এক অপূর্ব পরিবেশ। বাড়ির গেটে মিস্টার টিম এবং মিসেস টিম আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তাদের ড্রইং রুমে নিয়ে আমাদের বসালেন। ড্রইং রুম থেকে লেক মিসিগানের পুরো দৃশ্য আমরা দেখতে পেলাম। মিস্টার টিম আনসওয়ার্থের বাড়িটা একটা মিউজিয়ামের মতো। বই-পত্র, স্যুভেনির, শোপিস, এনটিকস এবং নানা রকম ডেকোরেশনে ঠাসা। দম্পতির কোনো ছেলেমেয়ে নেই। স্ত্রী আর্ট কলেজের প্রফেসর এবং তিনি নিজেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। দু'জনেই রিটায়ার করেছেন। আলাপ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে আলোচনা শুরু হলো। লেখা এবং লেখার বিষয় নিয়ে আমরা কথা বললাম। তবে বেশি কথা হলো ক্যাথলিক ধর্মের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। খৃস্টান, ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট সবাই, শুধু ধর্মের ব্যক্তিগত দিক নিয়ে মাথা ঘামায়। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক সমাজে প্রতিটি ব্যক্তি রাষ্ট্র ও সমাজের সব বিষয়ের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই অবস্থায় সামাজিক ও রাজনৈতিকি বিষয়ে ধর্মও জড়িয়ে পড়ছে কি না, এই

www.pathagar.com

আলোচনায় একপর্যায়ে তিনি বললেন, ক্যাথলিকদের কাছে সামাজিক বিষয় বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আর ইভানজেলিস্টরা প্রায় শুরু থেকেই সোসাল ইস্যুর দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। সুতরাং তার মতে, একই ধরনের ইস্যুতে খৃস্টানদের মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে ওঠতে পারে। তবে তাদের ইস্যু এবং ক্যাথলিকদের ইস্যু এক নয়। কথা ওঠলো এইভাবে খৃস্টানরা সামাজিক ইস্যুতে জড়িয়ে পড়ার মাধ্যমে রাজনীতিতেও জড়িয়ে পড়বে কি না। এই আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, মানুষ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রোয়োগের ক্ষেত্রে এমন কিছু ভাবতেও পারে। তবে বিষয়টা অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল। বিশেষ করে সবার গণতান্ত্রিক অধিকার যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনীতি বিশেষ কোনো একদিকে ঝুঁকে পড়তে পারে না। ইসলাম সম্পর্কেও মিস্টার টিম এবং মিসেস টিম কিছু কথা বললেন। বিশেষ করে ফটো ও মূর্তি রাখা বিষয়ে তারা জানতে চাইলেন। আমি বললাম, অতীতে বিখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তিদের স্মৃতি ধরে রাখার নামে ফটো ও মূর্তি গড়ার প্রবণতা সম্মানিত লোকদের আদর্শ ও শিক্ষা অনুসরণের চাইতে মানুষকে মূর্তি পূজার দিকে নিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত মূর্তিকে অতি প্রাকৃতিক শক্তির অবস্থানে বসিয়েছে। এটা সত্য ও স্বাভাবিকতার পরিপন্থী বলেই ইসলাম এই অভ্যাসটির মূলোৎপাটন করতে চেয়েছে।

এই আলোচনার মধ্যেই মিসেস টিম সকলের জন্য নাস্তা পরিবেশন করলেন। মিসেস টিমসহ আমরা সকলে একসঙ্গে নাস্তা করলাম। নাস্তার পরই আমরা বিদায় চাইলাম। আমাদের আরেকটি প্রোগ্রামের কথা বললাম। মিস্টার টিম জানতে চাইলেন আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রামটা কোথায়। জানালাম, আমেরিকান ইসলমিক কলেজে। তিনি বললেন, আমি ওটা চিনি। চলুন আমি আপনাদের পৌঁছে দিব। আমরা কিছুটা বিব্রত হলাম। কিন্তু তিনি যাবার জন্য ওঠে দাঁড়িয়েছেন। আমরাও ওঠলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে আমেরিকান ইসলামিক কলেজের গেটে পৌঁছলেন। তিনি গাড়ি থেকে নামলেন আমরাও নামলাম। সামনেই আমেরিকান ইসলামিক কলেজের বিশাল বিল্ডিং। আমরা সেদিকে তাকালাম, তারও দৃষ্টি সেদিকে। বিশাল এলাকা জুড়ে আমেরিকান ইসলামিক কলেজ। অনেকগুলো নানা রকম স্থাপনা। মিস্টার টিম আমাদের মুখোমুখি হলেন। বললেন, জানেন এটা আগে কি ছিল, কাদের ছিল? প্রশ্ন করে তিনিই আবার উত্তর দিলেন। বললেন, ক্যাথলিকরাই এর মালিক ছিল। এখানে ক্যাথলিকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ কিছু স্থাপনা ছিল। কিন্তু সে সব মানুষের খুব

www.pathagar.com

কাজে আসছিল না। সেজন্য আমরা এটা বিক্রি করে দিয়েছি, আপনারা এটা কিনে নিয়েছেন। আমেরিকায় ইসলামের যে বিস্তার ঘটছে এটা তার একটা প্রমাণ।'

এসব কথার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমি বিস্ময়ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। তার ক্যাথলিক সমাজ এই বিশাল স্থাপনা শুধু আমাদের কাছে বিক্রি করেনি, তার মতো একজন বয়োবৃদ্ধ লেখক ও শিক্ষাবিদ তার নিজের গাড়িতে নিজে ড্রাইভ করে আমাদের এখানে পৌঁছে দিলেন। বিন্দুমাত্র ক্ষোভ-ঈর্ষা থাকলে তিনি এটা করতেন না। আমেরিকার কোনো মুসলিম প্রতিষ্ঠান ও মুসলিম ব্যক্তিত্ব এ পর্যন্ত আমাদের প্রতি এই সৌজন্য দেখাননি।

আমরা আমেরিকান ইসলামিক কলেজে প্রবেশ করলাম। কলেজের ভাইস প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ সিদ্দিকী আমাদেরকে রিসিভ করলেন। তিনি ভারতের লোক। আগেই তার সাথে বাংলাদেশে আমার একবার পরিচয় হয়েছিল। আমরা একটা মিটিং রুমে বসলাম। কলেজের পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ কয়েকজন প্রোফেসরও এলেন। এখানে আমাদের লাঞ্চের দাওয়াতই ছিল মুখ্য বিষয়। লাঞ্চের মধ্যেই আমাদের কথা-বার্তা চললো। আমাদের পারস্পরিক পরিচয় হলো এর মধ্যে। কলেজ বিষয়ে বেশি কথা হলো। জানা গেল শহীদ ইসমাঈল ফারুকীর উদ্যোগে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়, ওআইসি'র একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে। ওআইসি'র টাকাতেই জমিসহ কলেজ বিল্ডিংটি কেনা হয়। এই আশাব্যঞ্জক কথার সাথে আমরা হতাশার কথাও শুনলাম। পরবর্তীকালে ওআইসি এই কলেজের ব্যাপারে তেমন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ফলে কলেজ যে রকম হওয়ার কথা ছিল সেরকম হতে পারেনি। এখন কলেজ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ বিশাল কলেজের কয়েকটি অংশ ভাড়া দিয়ে কলেজটিকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। দু'টি অংশ ইতিমধ্যে ভাড়া হয়েছে। তা থেকে বছরে এক লাখ ডলার পাওয়া যাবে।

কলেজের এই কাহিনী শুনে খুবই দুঃখ হলো। মনে পড়লো ওআইসি'র আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের দুর্দশার কথা। ওআইসি'র সেই রকমই একটি প্রতিষ্ঠান হলো ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক নিউজ এজেন্সি (আইআইএনএ)। এই প্রতিষ্ঠানটি শুরু হয়েছিল জাঁকজমকের সাথে। মুসলিম বিশ্বের রাজধানীগুলোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্পটগুলোতে সংবাদদাতা নিয়োগ করা হয়েছিল। পত্রিকার লোক

www.pathagar.com

হিসাবে আমি জানি প্রথম দিকে আমরা প্রতিদিন নিউজ ডেসপাস পেয়েছি আইআইএনএ থেকে। পরবর্তীকালে উন্নতির বদলে অবনতি ঘটতে থাকে। এক পর্যায়ে দেখা গেল আমাদের দেশের রাজধানীতে তাদের যে সংবাদদাতা আছে, তার কাজও নেই, বেতনও নেই। আশির দশকের সমাপ্তির দিকে সৌদিআরব সফরের সময় জেদ্দায় আইআইএনএ'র হেডঅফিসে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছিল। দেখলাম বিশাল বিল্ডিংএ সংবাদ সংস্থাটির অফিস ঠিকই আছে কিন্তু সেখানে প্রাণচাঞ্চল্য নেই। একটা ডুবন্ত তরীর মতো সবার মধ্যে বিষাদময় একটা অবস্থা। পরিচয় দেবার পর তারা আগ্রহের সাথে আলোচনা করেছিলেন। সংবাদ সংস্থার এ অবস্থা কেন এই জিজ্ঞাসার উত্তরে জেনেছিলাম, এই সংবাদ সংস্থার জন্য ওআইসি'র সদস্য দেশগুলো নিয়মিত চাঁদা দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু এই ওয়াদা কোনো দেশই রাখেনি। একমাত্র সৌদিআরব টাকা দিয়ে সংস্থাটি চালিয়ে এসেছে। কিন্তু তাদেরও আগ্রহ কমে গেছে। কারণ একক সাহায্যে তাকে যদি এই সংস্থা চালাতে হয় তাহলে ওআইসি'র নামে এটা চলবে কেন। সে তার অর্থে নিজস্ব একটা সংবাদ সংস্থা গড়ে তুলতে পারে। শিকাগোর আমেরিকান ইসলামিক কলেজটিও এই পরিণতির মুখোমুখি হয়েছে বলে আমার মনে হলো। তবে আমি আশাবাদী যে, একটা নিউজ এজেন্সির তুলনায় কলেজের পরিসর যেমন সীমিত তার খরচও সীমিত এবং কলেজের নিজস্ব ইনকামেরও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। অতএব আমি মনে করি আমেরিকান ইসলামিক কলেজটি টিকে থাকা উচিত এবং টিকে যাবে ইনশাআল্লাহ। কলেজে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজের ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। কলেজের শিক্ষার মানও খুব উন্নত। গোটা আমেরিকা এবং বিদেশ থেকেও কলেজটির মুসলিম ছাত্র পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কলেজটি যেন তা পায়, মনে মনে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করলাম। আমরা কলেজের অধ্যাপক এবং পরিচালনা কর্তৃপক্ষ সবার সাথে বসে একসঙ্গে লাঞ্চ সারলাম। লাঞ্চ শেষে সবার কাছে বিদায় নিয়ে তাড়াহুড়া করে বের হতে হলো। পরবর্তী প্রোগ্রাম আমাদের বিকেল তিনটায়। বেশ অনেকটা পথ আমাদের যেতে হবে।

ইউনাইটেড চার্চ পরিচালিত 'কমিউনিটি রিনিউয়াল সোসাইটি' অফিসে আমরা পৌঁছলাম তিনটার মধ্যে। সোসাইটির পরিচালক মিসেস পেট ইগোলস্টন আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমাদের আলোচনার শুরুতেই মিসেস পেট ইগোলস্টন তার সংস্থার কাজের বিশদ বিবরণ দিলেন। চার্চ এক সময় ব্যক্তি

www.pathagar.com

জীবনের ধর্মীয় দিক ছাড়া সামাজিক কোনো দায়িত্ব পালন করতো না। কিন্তু চার্চ এখন সমাজ ও সামাজিক বিষয়সমূহকে গুরুত্ব দিচ্ছে। 'কমিউনিটি রিনিউয়াল সোসাইটি'র কাজ তারই একটা প্রমাণ। তাদের গোটা অফিস তিনি আমাদের ঘুরিয়ে দেখালেন। অনেকের সাথে দেখা হলো, কথাও বললাম কয়েকজনের সাথে। 'কমিউনিটি রিনিউয়াল সোসাইটি'র অফিস এবং তাদের কাজকর্ম দেখে ও কথা বলে আমার নিশ্চিত মনে হলো খৃস্টান ধর্মীয় সংস্থাগুলো সর্বাধুনিক জ্ঞান ও সুযোগ সুবিধায় সজ্জিত। মিসেস পেট ইগোলস্টনের সাথে কথা বলে তার জ্ঞান ও উপস্থাপনায় চমৎকৃত হলাম। ওরা ওদের কাজের জন্য যোগ্য লোক তৈরি করেছে। অন্যান্য অনেক খৃস্টান সংস্থায় যেমনটা দেখেছি এখানে তাই দেখলাম। অফিসে পদ-নির্বিশেষে সকলের সাথে সকলের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং আচরণও সেই রকম। বুঝার উপায় নেই যে অফিসে কে বড় পদে কে ছোট পদে। একঘন্টা সময় কখন যেন আমাদের কেটে গেলো। মিসেস পেট ইগোলস্টোনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চারটার দিকে বেরিয়ে এলাম সোসাইটি অফিস থেকে। সাড়ে চার'টার দিকে হোটেলে ফিরলাম।

হোটেলে এসে শুয়ে পড়েছিলাম। আজ পরপর চারটা প্রোগ্রাম করেছি। প্রোগ্রামের সবগুলোই ভারি। শুয়ে শুয়ে আমি সে সব নিয়ে ভাবছিলাম। যা দেখলাম, যা শুনলাম, যা বুঝলাম, তা মাথায় গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। এই সময় টেলিফোন এলো। লাবলুর টেলিফোন। সে জানালো, আবদুল মালেক আগামীকাল চলে যাবে। সে আগ্রহ প্রকাশ করেছে আমি যেন তার ওখানে যাই, গল্পও হবে রাতের খাবারও হবে। আমি তার সাথে পরিচিত নই, কিন্তু নাম শুনেছি। লাবলুকে জানালাম, এ সময় আমার কোনো প্রোগ্রাম নেই, যাওয়ার ব্যবস্থা হলে আমি যেতে পারি। লাবলু বললো, ঠিক আছে আমি তার সাথে আলোচনা করে আপনাকে জানাচ্ছি। কিন্তু জানানোর বদলে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে লাবলু হাজির আবদুল মালেক সাহেবকে নিয়ে আমার হোটেলে । কিছু কথা হলো। তারপর আমরা বের হরাম। ড. মুস্তাফিজ সাহেবের অন্য প্রোগ্রাম ছিল। আমাদের সাথে তিনি যেতে পারলেন না। আমরা ওরলিনস রোডে একটা হোটেলে বসলাম। হোটেলটি পাকিস্তানিরা পরিচালনা করে। আবদুল মালেক সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হলো। তার সঙ্গে আগে কখনো আলাপ হয়নি। দেখলাম দেশ-বিদেশের পরিস্থিতি নিয়ে তিনি ভাবেন। এই বিষয়ে পড়াশুনাও আছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হলো। এক পর্যায়ে তিনি আমেরিকায় মুসলিম উম্মাহ ও ইকনা (ICNA) সংগঠন নিয়ে কথা তুললেন।

www.pathagar.com

দেখলাম মুসলিম উম্মাহ গঠন তিনি সমর্থন করেন না। 'মুসলিম উম্মাহ' নামে সংগঠনটি নতুন। কয়েক বছর ধরে আমেরিকায় কাজ করছে। বাংলাদেশী যারা আমেরিকায় চাকরি কিংবা পড়াশুনার জন্য রয়েছেন তাদেরই কিছু লোক এ সংগঠনটি গড়েছে। এর লক্ষ হলো নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা এবং সুযোগ ও সামর্থ্য অনুসারে দেশের জন্য কাজ করা। বাংলাদেশ অনেকটাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত দেশ। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন ইত্যাদি ধরনের দুর্যোগ প্রায় লেগেই থাকে। এ সব দুর্যোগে প্রবাসে থেকেও অনেক কিছুই করা সম্ভব, যদি ঐক্য থাকে। অন্যদিকে ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা একটি পুরানো সংগঠন। আমেরিকার বাইরে থেকে আসা স্থায়িভাবে আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলিম আমেরিকানদের এই সংগঠন। তবে এই সংগঠনে সদস্যদের মধ্যে উপমহাদেশের লোকদের সংখ্যাই বেশি। আমি আবদুল মালেক সাহেবের কথার উত্তরে বললাম, দুই সংগঠন গঠন ও কাজের দিক দিয়ে একদমই আলাদা। এ অবস্থায় দুই সংগঠনকেই আমি প্রয়োজনীয় মনে করি। একটি অপরটির প্রতিদ্বন্দ্বী নয় বরং পরিপূরক হতে পারে। সমসাময়িক অনেক বিষয় নিয়ে তার সাথে আরো কথা হলো। বিশেষ করে নব্বই এর দশকে এসে বিশ্বে ইসলামের বিরুদ্ধে বৈরিতা বেড়েছে। আজ ইসলামকে গণতন্ত্র ও উদারনৈতিক সভ্যতার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবা হচ্ছে। আমি বললাম, আসলেই ইসলাম আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর আগে গণতান্ত্রিক, উদারনৈতিক, নারী-পুরুষের নায্য অধিকার ভিত্তিক, সহনশীল, শান্তি ও সহাবস্থানমূলক এবং জ্ঞান ও যুক্তিভিত্তিক সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করে। ইসলামের এই সভ্যতা ইউরোপের অন্ধকারে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করে। পরবর্তীকালে মুসলামানদের রাজনৈতিক পতন, নব্য ইউরোপের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক উত্থান এবং এক চোখা নব্য ইতিহাসবিদদের বৈরিতা- এইসব কারণে ইসলামিক সভ্যতার শিক্ষা সংস্কৃতি ও আদর্শের বিস্তারিত সুস্পষ্ট রূপ আজ বিশ্বের মানুষের সামনে নেই। অন্যদিকে নিজেদেরকে সঠিকভাবে তুলে ধরার মতো বুদ্ধিভিত্তিক যোগ্যতার অভাব ও প্রচার দুর্বলতার কারণে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে আনা অমূলক অভিযোগের জবাব দিতে পারছে না। এটাই প্রকৃত সমস্যা। তবে দিন কারো সমান যায় না। মুসলমানদেরও যাবে না। প্রমাণ হবে ইসলামই সহনশীল ও সহাবস্থানমূলক সমাজ গড়ে তুলতে পারে। আবদুল মালেক সাহেবও এই আশাবাদ ব্যক্ত করলেন। আমেরিকান সমাজ ও সুশাসন নিয়েও কথা হলো। আমেরিকা প্রকৃতই মাল্টিন্যাশনাল ডেমক্রেসির একটা মডেল হতে যাচ্ছে। এই

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের মূল কথাই হলো সহনশীলতা ও সহাবস্থান। আমেরিকান সংবিধান এর নিশ্চয়তা দেয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘোর জাতীয়তাবাদী অন্তঃসলিলা স্রোত সক্রিয় রয়েছে।

কথায় কথায় আমাদের অনেক রাত হয়ে গেল। আমরা উঠলাম। হোটেলে পৌঁছতে রাত দশটা বেজে গেল। পরদিন সকালে নামায পড়ে আবার ঘুমিয়েছিলাম। ড. মুস্তাফিজ সাহেবের ভাতিজা আবদুল ফাত্তাহ এসে আমাদের ডেকে তুললেন। সে গাড়ি নিয়ে এসেছে। কথা আছে আজকের নির্ধারিত প্রোগ্রামের আগে তাকে নিয়ে আমরা শিকাগোর কয়েকটি দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়াবো। আমরা তৈরি হয়ে নিচে হোটেলের রেস্টুরেন্টে গেলাম। আবদুল ফাত্তাহসহ নাস্তা করে তার গাড়িতে আমরা বের হলাম। প্রথমে আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিল্ডিং সিয়ার্স টাওয়ারে গেলাম। দাঁড়ালাম গিয়ে সিয়ার্স টাওয়ারের নিচে। উপরে তাকিয়ে একনজর দেখলাম বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থাপনাটিকে। মাথায় টুপি থাকলে সত্যি তা খুলে পড়ে যেত। বিল্ডিং এর একশ তিন তলায় অবজারভেটরী। দর্শনার্থিরা ওখানে দাঁড়িয়ে শিকাগো শহর এবং চারদিকটা দেখে। আমরা ওঠলাম একশ তিন তলার অবজারভেটরীতে। যেদিন আমরা শিকাগোতে আসি সেদিনই সন্ধ্যার পরে লেক মিসিগানের তীরে ছিয়ানব্বই তলার হেসকোক বিল্ডিং এ চুরানব্বই তলায় অবস্থিত অবজারভেটরিতে ওঠেছিলাম। তার চেয়ে এটা আরো নয়তলা বেশি। একশ তিন তলায় ওঠে রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। ভয় যে লাগেনি তা নয়, অবজারভেটরির প্রান্তে দাঁড়িয়ে নিচের শহর এবং চারদিকটা দেখতে সত্যই ভয় করছিলো। এই ভয়ের কারণেই একশ' তিন তলা থেকে নিচের পৃথিবীটা দেখার আমার আনন্দ নির্মল হতে পারেনি। সেদিন হেসকক বিল্ডিং থেকে দেখেছিলাম রাতের শিকাগোকে। আজ দেখলাম দিনের শিকাগোকে। সিয়ার্স বিল্ডিং-এর টপ থেকে নেমে এলাম। যেখানে লিফট থেকে নামলাম তার পাশেই একটা কক্ষ। সেখানে দেখলাম একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি তার সাথে একটা প্লেট, কিছু ইংরেজি লেখা। ব্রোঞ্জ মূর্তিটির নিচে ব্রোঞ্জের অক্ষরে লেখা নামঃ ফজলুর রহমান খান। সবাই আমরা তার নাম জানি। তিনি বাংলাদেশের একজন স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার। বাংলাদেশে তিনি কাজ না পেয়ে চলে আসেন আমেরিকায়। এই সিয়ার্স টাওয়ারের স্ট্রাকচারাল ডিজাইন তিনিই করেছেন। পাশের প্লেটে ব্রোঞ্জ লিপিতে এর স্বীকৃতি রয়েছে। এই লিপিতে তাকে 'গ্রেটেস্ট ইঞ্জিনিয়ার অব দ্য টাইম' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্লেটে লেখা

www.pathagar.com

ইংরেজি লিপিটা এই 'The Structural Engineers Association of Illenoi'recognises Fazlur Rahman Khan as the greatest engineer of the time'

প্লেটে লেখাটা পড়ে বুকটা গর্বে ভরে ওঠলো। ধন্যবাদ দিলাম মার্কিনীদের। তারা প্রতিভার কদরই শুধু করেনি, তারা দ্বিধাহীনভাবে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। এই সাথে দুঃখ পেলাম যে, এই স্বীকৃতি ফজলুর রহমান খান নিজের দেশে পাননি। ভাতের উপযুক্ত সংস্থান না পেয়ে, প্রতিভার কোনো কদর না দেখে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। সাত সাগর তের নদী পেরিয়ে এসে তার সে প্রতিভার কদর পেয়েছেন কাজ পেয়েছেন। আমরা এই আত্মঘাতি আচরণ শুধু তার সাথেই করিনি। অনেক প্রতিভার সাথেই করেছি এবং করছি। আমাদের কাছে প্রতিভা ও যোগ্যতার চেয়ে স্বজনপ্রীতি বড়, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতাই অগ্রগণ্য। আমাদের দুর্নীতি ও দুর্ব্যবহারের শিকার হয়ে অনেক প্রতিভা অপমৃত্যুবরণ করেছে। যারা সুযোগ পাচ্ছেন তারা দেশ ত্যাগ করছেন। যে আনন্দ নিয়ে আমরা সিয়ার্স বিল্ডিং এ ওঠেছিলাম ততটাই নিরানন্দ আমাকে ঘিরে ধরলো। এর মধ্যেও যে সান্ত্বনাটুকু আমার মনে উঁকি দিল সেটা হলো এই আকাশস্পর্শী বিল্ডিং এর সাথে আমাদের দুর্ভাগা দেশের নামটি এবং তার একজন সন্তানের নাম জুড়িয়ে আছে।

সিয়ার্স বিল্ডিং থেকে বের হয়ে আমরা এখানে সেখানে ঘুরে আবুল ফাত্তাহ সাহেবের বাড়ি গেলাম। দিনটা ছিল শুক্রবার। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, আমরা আবদুল ফাত্তাহ সাহেবের বাসায় লাঞ্চ করে তার এলাকায় একটা বড় মসজিদ আছে সেখানে জুমুআর নামায আদায় করব। আমরা ফাত্তাহ সাহেবের বাসায় লাঞ্চ সেরে এলাকার বায়তুন নূর মসজিদে জুমুআর নামায পড়লাম। বাইরে থেকে মসজিদটিকে মসজিদ বলে মনে হয় না। এখানকার আইন অনুসারে কোনো স্থাপনার ডিজাইন পরিবর্তন করা যায় না। গেলেও সেটা অনেক সময় ও চেষ্টা সাপেক্ষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরকম অনেক মসজিদে নামায পড়েছি যেটা বাইরে থেকে মসজিদ বলে বুঝা যায় না। বাড়ি কিনে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন কি গির্জাকেও কিনে মসজিদ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু মসজিদের আকার দেয়া যায়নি, শুধু ক্রসকে সরিয়ে দেয়া ছাড়া।

হোটেলে ফিরে একটু রেস্ট নিয়ে আমাদের আবার বেরোতে হলো। 'শিকাগো খৃস্টান ইন্ডাস্ট্রিয়াল লীগ' অফিসে আমাদের যেতে হবে তিনটায়। প্রতিষ্ঠানের নামটা আমার কাছে নতুন ধরনের মনে হয়েছে। এ ধরনের নাম আমি এ পর্যন্ত

www.pathagar.com

কোথাও পাইনি। নামটা দেখে মনে হয় এটা ট্রেড ইউনিয়নের মতো কিছু। ইন্ডাস্ট্রির শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়ে লীগ গঠন করা হয়েছে, এমন একটা ভাব আছে নামের মধ্যে। কিন্তু গিয়ে দেখলাম ব্যাপারটা উলটো। অফিসের গেটে পৌঁছেই আমরা মিস্টার ভ্যান্স আইজম্যান-এর দেখা পেলাম। তিনি তার পরিচয় দিলেন। ক্রিশ্চিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল লীগের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা তিনি। বয়সে একেবারে তরুণ। আমাদের নিয়ে তিনি তার অফিসে বসালেন। পরিচয় পর্ব দিয়ে আমাদের কথাবার্তা শুরু হলো। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের কাজ সম্পর্কে আমাদের জানালেন। বললেন, আমাদের সংস্থার নামের সাথে যদিও খৃস্টান শব্দটি আছে তবুও আমাদের কাজ কিন্তু ধর্ম প্রচারমূলক নয়, একেবারেই সেবামূলক। বললাম, সেবাকেও ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাইরে থেকে আসা কর্মরত এনজিওদের কিছু সেবার নামে ধর্ম প্রচার করে থাকে। সেবা তাদের লক্ষ নয়, উপলক্ষ। মিস্টার ভ্যান্স আইজম্যান বললেন, সেবা মানব সেবার উদ্দেশ্যেই হওয়া উচিত, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে নয়। আমরাও তা করি না। আমরা সমাজে শহরে ঘুরে বেড়ানো গৃহহীন, মদ্যপ, মাতাল যারা রাস্তায় থাকে, তাদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করি। তাদের গোসল করানো হয়, খাবার দেয়া হয়। মাতাল, সন্ত্রাসী ও বখে যাওয়া তরুণদের আমরা ভালো ব্যবহার ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের কেন্দ্রে এনে থাকি। তাদের বাইবেল শিক্ষা দেয়া হয়। যাতে তাদের মধ্যে ধর্মভাব জাগ্রত হয় এবং সংশোধিত হবার সুযোগ পায়। এইভাবে যাদেরকে আমরা আমাদের কেন্দ্রে নিয়ে আসি তাদের সকলকেই যে আমরা ধরে রাখতে পারি তা না। অনেকেই তাদের অভ্যাসগত কারণেই আবার রাস্তায় ফিরে যায়। সুযোগ পেলেই আবার আমরা তাদেরকে রাত্রি যাপন, গোসল ও খাবার জন্য কেন্দ্রে নিয়ে আসি। যাদেরকে আমরা কেন্দ্রে ধরে রাখতে পারি তাদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসন করা হয়। এই কাজের জন্য আমরা সমাজের অনেকের কাছ থেকে সাহায্য পাই। বিশেষ করে সরকার এবং চার্চ আমাদের সাহায্য করে। সরকারি সাহায্য আসে ধর্মীয় কোনো উদ্দেশ্যে নয়, এই সাহায্যের উদ্দেশ্য মানুষের সেবা করা।

অল্পবয়সী ভ্যান্স আইজম্যানকে আমার খুবই ধর্মভীরু বলে মনে হলো। শান্তভাবে নরম সুরে কথা বলে। চোখে-মুখে কোনো অহংকারের প্রকাশ নেই, যা বড় বড় সেবামূলক কাজ যারা করেন তাদের অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। তাদের এ

www.pathagar.com

সুন্দর ব্যবহারের সাথে সাথে তারা দেখলাম যোগ্যও। তাদের গোটা প্রতিষ্ঠান ঘুরে দেখার সময় আরো যাদের সাথে কথা বললাম এবং যা দেখলাম তার মধ্যে যোগ্যতার স্বাক্ষর আছে। বিশেষ করে রাস্তার লোকদেরকে ধরে এনে দরদের সাথে তাদেরকে সেবা দান করা এবং প্রতিষ্ঠানে ধরে রাখা- এই দুই কাজ আন্ত রিকতা ও যোগ্যতা ছাড়া সম্ভব নয়।

প্রতিষ্ঠানটির খৃস্টান ইন্ডাস্ট্রিয়াল লীগ নামটি শুনে মনে মনে যতটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছিলাম, প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করে এবং মিস্টার ভ্যান্স আইজম্যানের সাথে কথা বলে ততটাই আনন্দিত হলাম। আসলে এই ধরনের সংস্থা সমাজে যত বেশি হয় তত ভালো। সমাজের পতিত লোকদের টেনে তোলা একক ব্যক্তি কিংবা একক কোনো সংগঠনের কাজ নয়। এই কাজের জন্য প্রয়োজন সমাজের সামষ্টিক উদ্যোগ।

আমরা সাড়ে চার'টার দিকে খৃস্টান ইন্ডাস্ট্রিয়াল লীগ অফিস থেকে বের হয়ে এলাম। আজ রাতেই আমাদের বড় দাওয়াত আছে কোটিপতি এক বাঙালির বাড়িতে। সেখানে আমরা যাব রাত আটটার দিকে। তার আগে অনেকটা সময় আমাদের হাতে। আমরা মুস্তাফিজ সাহেবের ভাতিজা ফাস্তাহ সাহেবের সঙ্গে শহর দেখতে বের হলাম। আমরা ঘুরলাম নানা জায়গায়। শিকাগোর একটা সড়কে আমরা গেলাম যার দু'পাশে সাইনবোর্ডগুলো বাংলা ও উর্দুতে লেখা, হিন্দিও আছে। শুনলাম সব দোকান হয় বাংলাদেশী অথবা ভারতীয় না হয় পাকিস্ত ানীদের। আমরা একটা দোকানে ঢুকলাম। দোকানদার একজন পাকিস্তানী। তবে সেলসম্যানদের মধ্যে উপমহাদেশের বিভিন্ন দেশের লোক দেখলাম। দোকানদারের সঙ্গে অনেক আলাপ হলো। নামটা ভুলে গেছি। তার দোকান থেকে কিছু কিনলাম স্মারক হিসেবে। তিনিও একটা কিছু গিফট হিসেবে দিলেন। আমরা ঠিক আটটাতেই সেই কোটিপতি বাঙালির বাড়িতে গেলাম। গেট থেকে আশরাফ আলী সাহেব আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। এই আশরাফ আলী সাহেবই আমাদের হোষ্ট, বাঙালি কোটিপতি। সত্যিই বিশাল বাড়ি। আমরা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সব শেষে আমরা গিয়ে বসলাম বিশাল ড্রইং রুমে। আলাপ শুরু হলো। তাঁর কথা শুনতেই আমরা আগ্রহ প্রকাশ করলাম। তার কথা আমরা শুনলাম। দেশের রাজনীতি ও দেশের ভবিষ্যৎ নিয়েই তার আগ্রহ বেশি দেখলাম। তার কথাবার্তার মধ্যে দেশ সম্পর্কে হতাশাই বেশি। বললাম, আমেরিকান সমাজ ও আমেরিকান রাজনীতির স্টান্ডার্ড বিচার করলে সে দেশ

www.pathagar.com

সম্পর্কে হতাশ হতেই হবে। কিন্তু বাংলাদেশকে বিচার করতে হবে তার ইতিহাস, সমস্যা ও সামর্থ্যের আলোকে। ৪৭-এ দেশ বিভাগের পর এক সংকটে পড়তে হয়। '৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জন সেই সংকটের সমাধান এনে দেয়। কিন্তু পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। এই অর্থনৈতিক সংকট শিক্ষা-সংস্কৃতির অধ:গতি এবং অযাচিত নানারকম অপপ্রভাব আমাদের জাতীয় সংকটকে আরো ঘনীভূত করে দেয় এবং রাজনীতিও অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। কিন্তু সে অবস্থা থেকে আমরা অনেকটা সরে আসতে পেরেছি। ৯১-এর নির্বাচনের পর গণতন্ত্র একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে। সামনের আশার দিকটাকে আমাদের বড় করে দেখা দরকার। আরো অনেক বিষয়ে আমরা কথা বললাম। খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেও আমাদের কথা চললো। বাঙালি আমেরিকান উভয় রকম খানারই ব্যবস্থা ছিল। দেশ থেকে দূরে গেলে দেশীয় খানার প্রতি দরদ বাড়ে। আমেরিকায় এসে আমাদেরও তাই হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পরও গল্পগুজব চললো রাত এগারটা পর্যন্ত। রাত সাড়ে এগারটায় হোটেলে ফিরলাম। একটা অভিজ্ঞতা হলো আমেরিকায় শহরের চেয়ে শহরের উপকণ্ঠ ভালো। বড় বড় ধনী লোকরা শহরের ভিতরে না থেকে শহরের বাহিরে বাস করতে ভালোবাসেন। আমাদের দেশের ব্যাপারটা এর উল্টো। শহরের উপকণ্ঠ মানেই বস্তির বিশৃঙ্খলা এবং দারিদ্র্য।

শনিবার জুনের তিন তারিখ। সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে আনুষ্ঠানিক সকল প্রোগ্রাম থেকে আমরা মুক্ত। আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম না থাকলেও অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম কিন্তু জট পাকিয়ে বসেছিল। শিকাগোতে অনেক বাংলাদেশীর বাস। সবারই আগ্রহ আমাদের নিয়ে প্রোগ্রাম করার। তার উপর দিনটি ছিল শনিবার, ছুটির দিন। এইজন্য তারা প্রোগ্রাম আয়োজনেরও সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু সব প্রোগ্রামে এটেন্ড করা সম্ভব নয়। প্রোগ্রামগুলো কাছাকাছি সময়ে পড়েছে। বিশেষ করে দু'টি প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা বিপদে পড়লাম। অন্যান্য প্রোগ্রাম বাদ দিলেও এই দু'টি প্রোগ্রাম বাদ দেয়া গেল না। অবশেষে আমরা ঠিক করলাম ড. মুস্তাফিজ সাহেব এক প্রোগ্রামে যাবেন, অন্য প্রোগ্রামে আমি যাব। আমি যে প্রোগ্রামে গেলাম সে প্রোগ্রামে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী উভয় ধরনের লোকই ছিল। আমি দেখলাম বিভিন্ন বিষয়ে জানা তাদের আগ্রহ। কোনো আলোচনা দিয়ে সব প্রশ্নের উত্তর সম্ভব নয়। সুতরাং ঠিক করা হলো, কোনো বক্তৃতা নয় অনুষ্ঠানে শুধু প্রশ্ন-উত্তর চলবে। লাঞ্চের পূর্ব পর্যন্ত প্রশ্ন-উত্তর ও নানা আলোচনা চললো। প্রশ্ন এলো দেশের

www.pathagar.com

রাজনীতি নিয়ে, দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে, দুনিয়ার মুসলমানদের নিয়ে, কেন মুসলমানরা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়লো, ধর্মহীনতা এবং ধর্মের বিরোধিতা বাড়ছে, এই অবস্থায় ইসলামের ভবিষ্যত কি, ইত্যাদি ধরনের প্রশ্নই বেশি ছিল। এ ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি এর আগেও আমি হয়েছি আমেরিকায় এসে। একই ধরনের আমার জবাব ছিল এখানে। প্রোগ্রামের পর রাশেদ সাহেবের বাসায় সকলের দাওয়াত ছিল। আমরা সেখানেই লাঞ্চ করলাম। তারপর লাবলু, আসাদুর রহমান মিলনের সাথে আমি শিকাগো ইসলামিক সেন্টারে গেলাম। এই ইসলামিক সেন্টারটি শিকাগোর মুসলমানদের একটি মিলন কেন্দ্র। সুন্দর পরিবেশে সুন্দর একটি সেন্টার। সেন্টারটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। সেন্টারটিতে মূল্যবান কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কাজ হয়। এদের সুন্দর একটি লাইব্রেরি গড়ার প্রচেষ্টা রয়েছে। এখানে নিয়মিত নিউজ ব্রিফিং-এর ব্যবস্থা আছে। একটা বেশ বড় একটি বোর্ডে নিয়মিত নিউজ ক্লিপিং করা হয়। আমেরিকাসহ দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যে নিউজ পাওয়া যায়, বোর্ডে তা ক্লিপিং করা হয় সকলের অবগতির জন্য। সেন্টারটি ভবিষ্যতে মুসলমানদের একটা শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে। ইসলামিক সেন্টার থেকে বেরিয়ে আমরা মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী প্রতিষ্ঠিত মসজিদ এবং মুসলিম কমিউনিটি সেন্টার দেখতে গেলাম। মসজিদ এবং সেন্টার কমপ্লেক্সটি শিকাগো শহরের উপকণ্ঠে এক নয়নাভিরাম পরিবেশে অবস্থিত। এই কমপ্লেক্সে একটি বিশাল মসজিদ তৈরি হচ্ছে, এখানে একটি সানডে স্কুল ছাড়াও একটি হাইস্কুল চলছে। একটি সুন্দর কমিউনিটি হল তৈরি হচ্ছে। মসজিদে তৈরি হচ্ছে একটি উঁচু মিনার, শিকাগো শহরে এটাই হবে মিনার বিশিষ্ট প্রথম মসজিদ। মসজিদে দু'রাকাত নামায পড়লাম। মসজিদ ও সেন্টার প্রজেক্টের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা হলো। মুষ্টিযুদ্ধের কিংবদন্তি মিস্টার মোহাম্মদ আলী বহুমুখী উদ্দেশ্যে এই সেন্টারটি গড়ে তুলছেন। এখানে মসজিদ, কমিউনিটি হল, সানডে স্কুল, হাইস্কুল, উচ্চতর শিক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের বিনোদনের ব্যবস্থা ছাড়াও এই সেন্টারকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক সহায়তামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে বিভিন্ন সাহায্য প্রকল্প পরিচালনার জন্য। তিনি জানালেন, বিল্ডিং-এর স্থানটি গ্রিকদের কাছ থেকে কিনে নেয়া হয়েছে। মসজিদের স্থানে একটি গির্জাও ছিল, এটাও কিনে নেয়া হয়েছে। মনে পড়ল গতকাল যে বায়তুন নূর মসজিদে জুম্মার নামায পড়েছিলাম, সেটাও গির্জা কিনে মসজিদ বানানো হয়েছে।

www.pathagar.com

মুষ্টিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কমপ্লেক্স থেকে বিদায় নেয়ার সময় মন থেকে আপনাতেই মোহাম্মদ আলীর জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা বের হয়ে এলো। ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য মোহাম্মদ আলীর স্বতঃস্ফূর্ত এ কাজ, এর উপযুক্ত জাযা যেন আল্লাহ দেন। আমেরিকায় মোহাম্মদ আলীর চেয়েও ধনী মুসলমান নিশ্চয় আছে যেমন সেদিন এক কোটিপতি মুসলমানের বাসায় দাওয়াত খেলাম। কিন্তু মোহাম্মদ আলীর মতো মন হয়তো তাদের নেই। মোহাম্মদ আলী ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থে যা করেছেন তার একটা অংশও হয়তো তারা করতে পারেননি। আমেরিকায় কোনো এক সাক্ষাৎকারে এক আলোচনায় একজন খৃস্টান প্রশ্ন তুলেছিলেন ইহুদীরা তাদের স্বার্থে আমেরিকায় ব্যাংক-বীমার ক্ষেত্রে জেঁকে বসেছে, মিডিয়ার বড় অংশ তাদের হাতে, রাজনীতিতে তারা প্রভাব বিস্তার করেছে, মুসলমানরা তা পারেনি কেন? পেট্রো ডলারের হিসাব ধরলে ইহুদীদের চেয়ে মুসলমানদের টাকা কম নয়। তাহলে মুসলমানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখ করার মতো একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতে পারেনি কেন? অর্থনীতি রাজনীতি কোনো ক্ষেত্রেই তাদের উপস্থিতি দেখার মতো নয়। এর জবাব সেদিন আমি দিতে পারিনি। জবাবটা ঐ রকম বৈঠকে বলার মতো নয়। আসলে মুসলামানদের সবই আছে, নাই বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা। বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা থাকলে সব কাজ করার মতো উপযুক্ত মানসিকতাও তাদের গড়ে উঠতো। বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার অভাবেই সে মানসিকতা গড়ে উঠতে পারেনি। এখানেই মুসলমানদের পরাজয়। তাদের বর্তমান দুর্দশার কারণও এটাই।

সন্ধ্যায় আমাদের ডিনারের দাওয়াত। শিকাগোর মুসলিম কমিউনিটির পক্ষ থেকে দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি ও ড. মুস্তাফিজ সেখানে পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায়। একটি রেস্টুরেন্টে এই দাওয়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা সেখানে পৌঁছে দেখলাম নারী-পুরুষ মিলে প্রায় ত্রিশ জনের মতো উপস্থিত। প্রবাসীদের অনানুষ্ঠানিক একটা আয়োজনের জন্য এটা একটা বড় উপস্থিতি। আমি মনে করেছিলাম অনুষ্ঠানটা শুধু খাবার জন্যই। কিন্তু দেখলাম খাওয়ার আগে আলোচনার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। মনে হলো এই আলোচনাটাই লক্ষ, ডিনার উপলক্ষ মাত্র। আমি ও ড. মুস্তাফিজ দু'জনকেই কথা বলতে হলো। কথা বলার পর উপস্থিতদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হলো বেশি। তাতে বুঝলাম বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের লোক এখানে রয়েছে। কিন্তু একটা বিষয়ে দেখলাম সবার আবেগ একই রকম সেটা ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ। দেখলাম সবাই চায় ইসলাম অন্যায়

www.pathagar.com

সব বৈরিতা, অমূলক সব অভিযোগ, ভিত্তিহীন সব দায় থেকে মুক্ত হোক এবং বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের জীবন থেকে জুলুম, নির্যাতন, অপমান, অবিচার-পীড়িত রাতের অবসান ঘটুক। আসলে গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের এটা একটা সাধারণ আবেগ। এই আবেগ নিজেদের অস্তিত্ব ও উত্থানের পক্ষে, কিন্তু কারো বিপক্ষে নয়। গণতন্ত্র, ন্যায়নীতি, সমমর্যাদা ও সহাবস্থানের ভিত্তিতে আদম সন্তানরা একটা শান্তির বিশ্ব গড়ে তুলুক, সকল শান্তিকামী মানুষের মতো তারাও এটা চায়। ডিনারের পরেও আলোচনা আমাদের অব্যাহত ছিল। সাতটা থেকে সাড়ে দশটা পর্যন্ত আমাদের প্রোগ্রাম চললো। হোটেলে পৌঁছতে আমাদের রাত এগারটা বেজে গেল।

পরদিন নামায পড়েই প্রস্তুত হলাম আমি এবং ড. মুস্তাফিজ। আজ গির্জায় আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে। প্রোগ্রামটা হলো গির্জার প্রার্থনা সভায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকা। তাদের সাথে থেকে তাদের রোববারের প্রার্থনা অনুষ্ঠান সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করা। সকালেই গির্জার অনুষ্ঠানে যেতে হবে বলে রাতেই ব্যাগ ব্যাগেজ সব বেধে রেখেছিলাম। আজ আমাদের শিকাগো ছাড়ারও দিন।

আট'টার মধ্যেই আমরা গির্জায় যাবার জন্য তৈরি হলাম। নাস্তার বালাই ছিল না। গত রাত্রে গল্পের মধ্যেই খাবারটা বেশি খেয়ে ফেলেছিলাম। যে কোনো কারণেই হোক সকালে ওঠে দেখলাম পেটের অবস্থা খাবার পক্ষে নয়। আমি ও ড. মুস্তাফিজ কেউ নাস্তা করলাম না।

প্রস্তুত হয়ে আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। গির্জা থেকে একজন লোক এলেন আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। আমরা তার সাথে তার গাড়িতেই গির্জায় গেলাম। আমরা গির্জার প্রার্থনা অনুষ্ঠানে সকলের সাথে চেয়ারে বসলাম। প্রার্থনা অনুষ্ঠান শুরু হলো। সবার সাথে বসে গির্জার মঞ্চ থেকে ফাদারের সারমন শুনলাম। শেষে সবাই চেয়ার থেকে নেমে হাটু গেড়ে প্রার্থনায় যোগ দিলেন। আমরা সেই প্রার্থনায় যোগ দিলাম না, শুধুই দেখলাম। প্রার্থনা সভায় উপস্থিতির সংখ্যা প্রার্থনা হলের তুলনায় খুবই হতাশাব্যঞ্জক বলা যায়। উপস্থিতির মধ্যে প্রজন্ম গ্যাপ স্পষ্ট। বৃদ্ধ, যুবক এবং কিশোর এই তিনের ভারসাম্য গির্জার উপস্থিতিতে নেই। প্রার্থনা অনুষ্ঠানের পরে ফাদারের অফিসে গেলাম। সেখানে গির্জার আরো কয়েকজন কর্মকর্তা ছিলেন। সেখানে সবার সাথে আমরা নাস্তা করলাম এবং অনেক আলোচনাও হলো। গির্জার প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগদান আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা। আমাদের জন্য এ ধরনের অনুষ্ঠান রেখে আমাদের হোস্টরা একটা যুক্তিযুক্ত কাজ করেছেন। পারস্পরিক এমন অভিজ্ঞতা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৭

এবার আমাদের যাত্রা ইন্ডিয়ানা স্টেটের ব্লুমিংটনে। শিকাগো এয়ারপোর্টে অভ্যন্তরীণ টার্মিনাল থেকে ছোট একটা বিমানে ওঠলাম। বিমানটা অনেকটা বড় বাসের মতো, অন্তত একোমোডেশনের দিক দিয়ে। সিকাগো থেকে ব্লুমিংটন ২৩৬ মাইল। একবার মনে হলো এই ছোট বিমান ২৩৬ মাইল ফ্লাই করার উপযুক্ত কি না! কিন্তু যখন বিমান আকাশে উড়ল, চলতে শুরু করল তখন একে ওয়াইড বডি বড় বিমানের মতোই আরামদায়ক মনে হলো। আমরা চলছি ইন্ডিয়ানা স্টেটের বিশ্ববিদ্যালয় শহর ব্লুমিংটনে। ব্লুমিংটন আসলে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়েরই শহর। ১৮১৬ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো শিক্ষা ও ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্লুমিংটনকে পছন্দ করেন। ব্লুমিংটনের সেই শিক্ষা ট্রেনিং প্রতিষ্ঠানই ১৮২০ সালে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি। ছাত্র সংখ্যার দিক দিয়েও ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় শীর্ষ তালিকায়। বাৎসরিক এনরোলমেন্ট ত্রিশ হাজারের ওপরে। খেলাধূলা, সংস্কৃতি ও শিক্ষার উৎকর্ষতা সবদিক দিয়েই ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় সাফল্যের একটি দৃষ্টান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। বৈদ্যুতিক ও গৃহস্থালী জিনিসপত্র, ইলিভেটর ইত্যাদি ধরনের হালকা শিল্পপণ্য উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত ব্লুমিংটন। বিশেষ করে ইন্ডিয়ানার দক্ষিণ অংশ লাইমস্টোনের জন্য গোটা আমেরিকায় বিখ্যাত। গোটা আমেরিকায় শত শত দর্শনীয় বিল্ডিং সাউথ ইন্ডিয়ানার লাইমস্টোনে তৈরি হয়েছে। ওয়াশিংটন মনুমেন্ট, লিংকন মেমোরিয়ালের মতো জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভগুলো তৈরির গৌরব ইন্ডিয়ানা লাইমস্টোনের। খুব ছোটবেলা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে দু'টো নাম আমার কাছে পরিচিত তার একটি হলো ডেনভার আরেকটি ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়। এরপর আমি শুনেছি আব্রাহাম লিংকনের নাম। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পড়েছিলাম পল্লী কবি জসিমউদ্দিনের লেখা 'চলে মুসাফির' বইতে। 'চলে মুসাফির' বইটি ক্লাস সেভেনে আমাদের দ্রুত পঠন ছিল। বইটি কবি জসিমউদ্দিনের আমেরিকা সফরের কাহিনী। পল্লী কবি জসিমউদ্দিন লোকসঙ্গীত সম্মেলনে আমেরিকার এই ইন্ডিয়ানা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। অনেক কথা লিখেছিলেন তিনি আমেরিকার লোকসঙ্গীত, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি বিষয়ে। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যায়য়ের প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ তখন থেকেই।

বেলা দু'টায় আমরা ব্লুমিংটনে পৌঁছলাম। এয়ারপোর্টে নামলাম। লসএঞ্জেলসে বা শিকাগোর মতো বড় এয়ারপোর্ট এটা নয়। কিন্তু এয়ারপোর্টটি খুব সুন্দর। এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের যাত্রা সোজা ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্লুমিংটনে আমাদের হোস্ট মিস কালাহান। তিনি ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রামস ডিভিশনের প্রোগ্রাম অফিসার। তিনি আগেই আমাদের জন্য আবাস ঠিক করে রেখেছেন। সেই আবাসে, ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন গেস্ট হাউজে আমরা উঠলাম। আমার ও ড. মুস্তাফিজ সাহেবের রুম এবার পাশাপাশি হলো না। দুইজন দুই ফ্লোরে গিয়ে উঠলাম। রুমে গিয়ে লাগেজ ও কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক করে নিচে লবিতে নেমে এলাম। ড. মুস্তাফিজ ও কার্ন এলেন। আমাদের সবারই লাঞ্চ দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টের খোঁজ পেলাম আমরা। খুশি হলাম। চাইনিজ রেস্টুরেন্টের খাবার আমাদের আরো খুশি করলো। আমরা ভাত ও সবজি খেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে সব দেশের ছাত্র আছে বলেই হয়তো সব রকমের খানা এখানে মেলে। চাইনিজ রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আমরা ক্যাম্পাসের পাশে আরেকটি দোকান থেকে পাউরুটি, জুস আর খাবার পানি কিনলাম। এই ছোট কেনাকাটা আমার বিশেষভাবে মনে আছে সেটা দোকানের সেলসগার্ল এর ব্যবহারের কারণে। আমি যা কিনলাম তার দাম হয়েছিল পাঁচ ডলার সাতাশ সেন্ট। একটা মজার ব্যাপার হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু কিনতে গেলে খুচরা পয়সা অপরিহার্য। প্রত্যেকটা জিনিসের দামেই একটা ফ্রাকশন আছে। খুচরা পয়সা হয় গ্রাহককে দিতে হয়, না হয় দোকানদার দিয়ে থাকে। আমি সেলসগার্ল মেয়েটাকে দিলাম পাঁচ ডলার পঞ্চাশ সেন্ট। কিন্তু আসলে দিয়েছিলাম পাঁচ ডলার পঁচিশ সেন্ট। পঁচিশ সেন্টকে আমি পঞ্চাশ সেন্ট মনে করেছিলাম। মেয়েটা আমাকে কিছু বলল না। একবার আমার দিকে তাকালো মাত্র। তারপর ক্যাশ কাউন্টারের বাইরে পাশে রাখা ছোট একটা বাটি থেকে (যেখানে কিছু সেন্টের কয়েন ছিল) দুই সেন্ট তুলে নিয়ে আমার দেয়া টাকার সাথে মিলিয়ে ক্যাশ কেবিনে রেখে দিল। তখনই আমি বুঝলাম আমি পঞ্চাশ সেন্ট নয় পঁচিশ সেন্ট দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ড. মুস্তাফিজ সাহেবকে বললাম, তার কাছে থাকলে দু'টি সেন্ট আমাকে দেবার জন্য। তার

www.pathagar.com

কাছে ছিল। আমি মেয়েটিকে দু'টি সেন্ট দিয়ে দিলাম। মেয়েটি দুটি সেন্ট হাতে নিয়ে কিছু একটা ভাবলো। তারপর ঠোঁটে এক টুকরো হাসি টেনে সেন্ট দু'টি ক্যাশ কাউন্টারের বাইরে সেই বাটিতে রেখে দিল। আমি বুঝলাম বাটির সেন্টগুলো দোকানের ক্যাশের অংশ নয়। কোনো ক্রেতা বেশি দিয়ে গেলে তারা সেই বাড়তি পয়সা ক্যাশে না নিয়ে সেই বাটিতে রেখে দেয়। আবার কেউ কম দিলে সেই বাটি থেকে নিয়ে তা পূরণ করা হয়। আমার ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল। চমৎকার একটা ব্যবস্থা এটা। দোকানের সেলসগার্ল এর সততা আমাকে দারুণভাবে মুগ্ধ করল। আমরা গেস্ট হাউজে ফিরে এলাম। দিনটা ছিল রোববার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। কোনো প্রোগ্রাম আমাদের ছিল না। আমরা সময়টা পড়াশুনা ও বিশ্রামের মধ্যে দিয়েই কাটিয়ে দিলাম।

সোমবার, পাঁচ জুন। সকাল সকাল আমরা নাস্তা সারলাম। আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম। আমাদের প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিলিজিয়াস স্টাডিজ এর অধ্যাপক স্কট আলেকজান্ডার এর সাথে। ইউনাইটেড মেথডিজ চার্চের মিনিস্টার রয় মর্গান এর সাথে ছিল দ্বিতীয় প্রোগ্রাম। এরপর ছিল আমাদের লাঞ্চের একটা দাওয়াত। তৃতীয় প্রোগ্রাম ছিল আমাদের ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সালি আলতোমা'র সাথে। আমাদের দিনের শেষ প্রোগ্রামটা ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর ইনিস্টিটিউটে ছিল।

নাস্তার পর আমরা গেস্ট হাউজের লবিতে বসেছিলাম। প্রোগ্রামের সময় তখন হয়নি। প্রোগ্রাম যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যেই, সুতরাং খুব একটা তাড়া ছিল না। দু'চার মিনিট আগে বের হলেই আমরা পৌঁছতে পারবো। কিন্তু অবাক ব্যাপার আমরা উঠার আগেই অধ্যাপক স্কট আলেকজান্ডার গেস্ট হাউজের লবিতে এসে হাজির আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। আমরা কিছুটা বিব্রত হলাম। তবে অধ্যাপক স্কট আলেকজান্ডারের দু'একটা কথা বলেই বিব্রতভাব আমাদের উবে গেল। অধ্যাপক স্কট আলেকজান্ডার বয়সে খুব তরুণ, ছাত্র বলে ভুল হবার মতো। আসলে ছাত্রত্ব তার বেশিদিন আগে কাটেনি। মাত্র চার বছর আগে হার্ভার্ড থেকে পাস করে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন।

তার সাথে আমরা তার ডিপার্টমেন্টের অফিসে গেলাম। প্রথমে তিনি তার ডিপার্টমেন্টের কাজের বর্ণনা দিলেন। তার কাছ থেকে জানা গেল ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই 'রিলিজিয়াস স্ট্যাডিজ' বিভাগটি নতুন। সাবজেক্ট হিসাবে ইসলাম কিভাবে তারা শিক্ষা দেয় সে বিষয়ে তিনি কথা বললেন। ইবনে ইসহাক

www.pathagar.com

এবং এ ধরনের প্রাচীন বই তারা ব্যবহার করেন। কুরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা অন্যান্য আরো কিছুর সাথে আল্লামা ইউসুফ আলীর কুরআনের ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণ করেন। রিলিজিয়াস স্টাডিজ বিভাগকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ধর্মের ওপর বই যোগাড়ের ব্যাপক প্রোগ্রাম তাদের রয়েছে। বিভিন্ন ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ও মুসলমান সংক্রান্ত সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। তিনি নিষ্ঠাবান মুসলমানদের ক্ষেত্রে 'ফান্ডামেন্টালিস্ট' শব্দের ব্যবহারকে সম্পূর্ণ অন্যায় ও অমূলক বললেন। তিনি এ ক্ষেত্রে 'ইসলামিস্ট' শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতি। আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম চলমান ধর্মগুলোর বর্তমান অবস্থা, অধঃগতি, অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয় মনিটর করার কোনো ব্যবস্থা তার বিভাগের প্রোগ্রামে আছে কি না। আমার উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ধর্মের বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে তার কাছ থেকে কিছু জানা। কিন্তু কোনো লাভ হলো না। তিনি এ আলোচনার দিকে না গিয়ে বললেন, তার ডিপার্টমেন্ট এ ধরনের কোনো প্রোগ্রাম এখনো গ্রহণ করেনি।

ইসলাম ধর্ম নিয়ে তার সাথে বেশি আলোচনা হলো। এই আলোচনায় তাকে আমরা খুব আগ্রহী দেখলাম। ইসলাম সম্পর্কে তার বক্তব্য খুবই পরিষ্কার, কোনো বিভ্রান্তি তার মধ্যে নেই। আলোচনার পর ড. মুস্তাফিজ আমাকে বলেছিলেন, অধ্যাপক স্কট আলেকজ্যান্ডারের মতো ইসলাম বিষয়ে স্বচ্ছ জ্ঞানের লোক পশ্চিমাদের মধ্যে আর কাউকে তিনি পাননি।

পরবর্তী প্রোগ্রাম আমাদের ইউনাইটেড মেথোডিস্ট চার্চের রয় মর্গানের সাথে। অধ্যাপক আলেকজ্যান্ডার এটা জানার পর তিনি আমাদেরকে সেখানে পৌঁছে দিলেন। আবারও বলতে হয়, দেখা করতে গেছি এমন কোনো মুসলিমের এই ব্যবহার আমরা এ পর্যন্ত পাইনি।

আমরা চার্চ অফিসে পৌঁছলাম। দেখা হলো রয় মর্গানের সাথে। তিনি আমাদের তার লাইব্রেরিতে নিয়ে বসালেন। সেখানে বসেই আমরা আলাপ আলোচনা করলাম। তার লাইব্রেরিটা দেখলাম। এমন কোনো বিষয় নেই যে বিষয়ের ওপর লাইব্রেরিতে কোনো বিভাগ নেই। একটি চার্চের লাইব্রেরিতে বইয়ের এমন বিচিত্র কালেকশন আমাকে অভিভূত করলো। আমাদের কোনো ধর্মীয় সংস্থায় বইয়ের এত বিরাট বহুমুখী কালেকশনের কথা কল্পনাই করা যায় না।

রয় মর্গানের সাথে কথাবার্তার শুরুতেই আমি আমাদের আমেরিকা সফরের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করে বললাম, ধর্ম মার্কিন সমাজে কী ভূমিকা পালন করছে সেটা জানতে আমরা খুবই আগ্রহী। তিনি বলতে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, স্যরি মিস্টার রয় মর্গান আগে আপনি আপনার চার্চ সম্পর্কে কিছু আমাদের বলুন প্লিজ। তিনি চার্চের পরিচয় দিয়ে তাদের চার্চের সামাজিক কার্যক্রমের একটা ফিরিস্তি দিলেন। একেই তিনি সমাজে ধর্মের ভূমিকা বলে মত প্রকাশ করলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম রাজনীতি, আইন তৈরি, সমাজ নিয়ন্ত্রণ, এসব ক্ষেত্রে চার্চ কোনো দায়িত্ব পালন করে কি না। তিনি বললেন, গ্যামলিং ইত্যাদি ধরনের আইনের আমরা বিরোধিতা করি এবং এ ধরনের নানা ইস্যুতে আমরা সিনেট এবং কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে লবি করি। কিন্তু নির্বাচনে কারো পক্ষ নেই না। এটা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। চার্চের লোকেরা এ ব্যাপারে তাদের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অপরাধ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বাইরের নিয়ন্ত্রণ (External Control) এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ (Inner Control) বিষয়ের কথা উল্লেখ করে আমি বললাম, অনেকে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণকে সেক্যুলার মরালিটি ও রিলিজিয়াস মরালিটি এই দুইভাগে বিভক্ত দেখিয়ে বলেন যে, মানুষের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের জন্য সেকুলার মরালিটিই যথেষ্ট। এই ব্যাপারে আপনার মত কি মিস্টার রয় মর্গান? মিস্টার মর্গান বললেন, সেকুলার মরালিটি বলে কোনো জিনিস নেই। যারা এটা বলেন তারা এটা বানিয়ে বলেন। মরালিটি বা নৈতিকতা শুধু ধর্মই দিতে পারে। দেখলাম রয় মর্গান খুব স্পষ্টভাষী মানুষ। যা তিনি বিশ্বাস করেন তা স্পষ্টভাবে বলেন। তার সাথে আরো অনেক বিষয়ে কথা হলো। চার্চের এ প্রতিষ্ঠানটি বেশ বড়। সবকিছু তিনি আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। সময় তাড়াতাড়ি যেন শেষ হয়ে গেল। আমরা ওঠলাম। পরবর্তী প্রোগ্রাম আমাদের লাঞ্চ। এই লাঞ্চের প্রোগ্রাম আমাদের হোস্টই ঠিক করে রেখেছেন। কথা আছে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রাচ্যের ভাষা ও কালচার বিভাগের মরিয়াম এহতেশামি এখানে এসে আমাদের নিয়ে যাবেন। আমরা মেথডিশ চার্চ থেকে বের হয়েই দেখতে পেলাম স্কার্ট আর কোট পরা একজনকে। জানলাম ইনিই মরিয়াম এহতেশামি। আমি অবাক হলাম তিনি ঠিক যথাসময়ে হাজির। এক মিনিটও দেরি হয়নি। তবে আমরা মরিয়াম এহতেশামিকে যে পোশাকে দেখবো বলে ভেবেছিলাম সে পোশাক তিনি পরেননি। খুশি হলাম আমরা। তিনি জানালেন যে, তিনি ইরানী। স্কুল জীবন থেকে তিনি আমেরিকায়।

তার গাড়িতে করেই তিনি আমাদের লাঞ্চ করতে নিয়ে গেলেন। লাঞ্চ রুমে ভাষা

www.pathagar.com

ও কালচার বিভাগের একজন পাকিস্তানী ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলো। তিনিও আমাদের সাথে লাঞ্চ করার কথা। মরিয়াম এহতেশামি লাঞ্চের মেন্যু ঠিক করলেন। লাঞ্চ করার মধ্যেই আমাদের কথাবার্তা চলল। অনেক কথা। ইরানের রাজনীতি নিয়ে কথা ওঠলো। এমন কি ইরানে জাহেদান প্রদেশে সুন্নীরা কেমন আছে সেটা নিয়েও আমাদের কথা চলল। এর সাথে এশিয়ার ঐ এলাকার আঞ্চলিক রাজনীতি নিয়েও আমরা কথা বললাম। গ্রেটার বেলুচিস্তান প্রশ্ন করাচির শিয়া-সুন্নী দাঙ্গার তাৎপর্য ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করালাম। দেখলাম তিনি ভাষা ও কালচার বিভাগের হয়েও রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান তাঁর টনটনে। লেটেস্ট তথ্য তিনি রাখেন। আমাদের আলোচনার উপসংহার হলো এভাবে যে, মত বিভিন্নতা অন্যায় ও অস্বাভাবিক নয়, যদি না তা সংহতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। দুঃখের বিষয় আমরা ঐক্য ও সংহতি নয়, মতানৈক্যের বিষয়কে বড় করে দেখছি।

লাঞ্চ শেষে সেই পাকিস্তানী ছাত্র ও মরিয়াম এহতেশামি আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রাচ্যের ভাষা ও কালচার বিভাগের প্রফেসার সালিহ আলতোমার অফিসে নিয়ে গেলেন। লাঞ্চের পর আলতোমার সাথে আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট ছিল। আমাদের পৌঁছে দিয়ে মরিয়াম এহতেশামি ও পাকিস্তানী ছাত্র বিদায় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসার আলতোমা বললেন যে, চলুন নিচে লাইব্রেরিতে গিয়ে বসা যাক। ঐখানে ভালো পরিবেশ পাওয়া যায়। কথা বলতে বলতে আমরা লাইব্রেরিতে নেমে এলাম। প্রফেসার আলতোমার বয়স ষাটোর্ধ্ব।

খোলামেলা মানুষ। মুহূর্তে আমাদের আপন করে নিলেন। তিনি আমাদের লাইব্রেরির কম্পিউটার সেকশনে নিয়ে গেলেন। কিভাবে সমস্ত বই ও ম্যাগাজিন কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে, তিনি আমাদের তা দেখালেন। বললেন, এখন ছাত্রদের পড়াশোনার ধরন পাল্টে গেছে। এখন আর গোটা বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয় না। যে বইয়ের যা দরকার বই ম্যাগাজিনের সেই অংশটুকু প্রিন্ট করে তারা নিয়ে যাচ্ছে। তাদের এ কম্পিউটার ডাটাবেজে বাংলাদেশের কিছু আছে কি না জানতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি কম্পিউটারে বাংলাদেশ ফাইল ওপেন করলেন। ফাইলের বিষয়গুলো তিনি আমাদের দেখালেন। দেখলাম বাংলাদেশের মৌলবাদি ও এনজিওদের দ্বন্দ্বের কথা গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তার সাথে বাংলাদেশের ধর্মীয় আলেমরা কিভাবে মেয়েদের কাজের বিরোধিতা করে,

www.pathagar.com

সেই কাহিনীও। সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম এটা ডিসটোর্শন অব ফ্যাকটস। দৃষ্টান্ত হিসেবে আমি দু'একটা ঘটনার কথাও তুলে ধরলাম। কিভাবে এক শ্রেণীর মিডিয়া হয়কে নয় করে। প্রফেসার আলতোমা কম্পিউটার অফ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। বললেন, এটাই মুসলমানদের দুর্ভাগ্য যে, মটিভেটেট ডিসটোর্শনে সত্য মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে, আর সত্য গরহাজির। আপনারা সাংবাদিক, আপনাদের দায়িত্ব এ বিষয়ে লেখা।

আমি বাংলাদেশ সংক্রান্ত খবরের ঐ অংশসহ কিছু প্রয়োজনীয় নিবন্ধের শিরোনামের প্রিন্ট নিলাম। শিরোনাম থেকে বুঝা যাবে যারা বাংলাদেশ সংক্রান্ত ফাইল তৈরি করছে তারা কি ধরনের নিউজকে পছন্দ করে, এ পছন্দ থেকে তাদের মানসিকতাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোনো দেশ সংক্রান্ত ফাইল তৈরিতে সংবাদ বা বিষয় বাছাইয়ে নিরপেক্ষ না হলে নিউজ সংগ্রহে বাস্তবতার প্রতিফলন না ঘটলে সেই ফাইল দিয়ে কিংবা সেই ফাইল ভিত্তিক কোনো গবেষণা প্রকৃতই কোনো উপকারে আসে না। কম্পিউটার রুম থেকে প্রফেসর সালিম আলতোমা আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটোরিয়ায় নিয়ে এলেন। একটা ভালো জায়গা দেখে আমরা বসলাম। ক্যাফেটোরিয়ায় কোনো সেলসম্যান নেই। সেল্ফ সার্ভিস ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় টাকা লেনদেন ও খাবার সরবরাহ হয়। পছন্দ মতো খাদ্য ও পানির মূল্য কাউন্টারের নির্দিষ্ট জায়গায় ঢুকালে বাঞ্ছিত খাদ্য ও পানীয় চলে আসে। প্রফেসর আলতোমা আমাদের সকলের জন্য হালকা নাস্তা ও পানীয় নিয়ে এলেন। খেতে খেতে কথা আমাদের শুরু হলো। প্রথমেই তিনি তার 'নিকট প্রাচ্য ভাষা ও কালচার' বিভাগের পাঠ্য বিষয় ও পড়ার মান সম্পর্কে বললেন। তিনি দুঃখ করলেন যে, মুসলিম দেশের ছাত্ররা পরিশ্রম করে না। এখানে একই সময়ে দুই বিষয়ে মাস্টারস এমন কি ডক্টরেটও দেয়া হয়। তাতে করে সংশ্লিষ্ট ছাত্রের জ্ঞান অর্জন শুধু নয় ভালো চাকরির সুবিধা হয়। চোখের সামনের একটি উদাহরণ টেনে তিনি বললেন, একজন আরবীয় সম্প্রতি একই সাথে কম্পিউটার সাইন্স এবং লিংগুইস্টিক এ ডক্টরেট করেছেন। মুসলিম বিশ্বে উন্নয়ন ব্যাপারে তিনি হতাশা প্রকাশ করলেন। জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ানও এশিয়ান দেশ, কিন্তু ওরা তো দ্রুত এগিয়ে গেছে। তিনি বললেন, মুসলমানদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধর্মের স্লোগানও একটা সমস্যা। তার শেষ কথাটা আমার ভালো লাগলো না। আমি বললাম, আপনি যা বললেন তা আসলে ইসলামের একটা রং এন্টারপিটেশন। আমি বললাম, আমি অর্থনীতির ছাত্র, পড়ার সময় দেখেছি আমাদের স্যাররাও

www.pathagar.com

এই অসত্য ধারণার শিকার হয়ে বলতেন, ইসলাম উন্নয়নের বিরোধী, আসলে তা নয়। ইসলাম উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত ও শক্তিশালী করে যা পুঁজিবাদের অবদানের চেয়ে বেশি। আমি কোরিয়ার অর্থনীতির সাথে বাংলাদেশের অর্থনীতির তুলনা করে বললাম, এক সময় তাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের সমান ছিল। এক্ষেত্রে আমরাই কিছুটা এগিয়েছিলাম। কিন্তু কোরিয়ার রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং কোরীয়দের পরিশ্রম তাদেরকে আমাদের চেয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে। অন্যদিকে রাজনৈতিক সংকট, দুর্নীতি নামক সংক্রামক ব্যাধি আমাদেরকে এগোতে দেয়নি। এখানে ধর্মের কোনো ভূমিকা ছিল না। বরং বলা যায় আমাদের ধর্ম যে সততা, সমঝোতা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও ঐক্যের শিক্ষা দেয় তা মানলে আমরাও এগোতে পারতাম। বিদেশ থেকে পাওয়া হাজার হাজার কোটি টাকা যেভাবে লোপাট আমরা করেছি তা ধর্মের শিক্ষা না মানারই ফল। প্রফেসর আলতোমাও এটা স্বীকার করলেন। এরপর তিনি অন্য প্রসঙ্গ তুলে বললেন, অন্যায়ভাবে সন্ত্রাসী হওয়ার দোষও মুসলমানদের ওপর আরোপ করা হচ্ছে। তিনি জানালেন, 'ওকলাহোমার ঘটনার পর বলতে গেলে আমরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, যে কোনো সময় আমরা প্রতিবেশীর আক্রমণের শিকার হবো। এরকম ঘটনা কোথাও কোথাও শুরু হয়ে গিয়েছিল।' আমার মনে পড়লো, আজকেই সকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই রিলিজিয়াস স্টাডিজের অধ্যাপক স্কট আলেকজ্যান্ডার ওকলাহোমা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তার ক্লাসে তিনজন মুসলিম ছাত্রের প্রতি ক্লাসের অন্য সকলেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। প্রফেসর সালিম আলতোমা আরো বললেন, ওকলাহোমার ঘটনার জন্যে আমেরিকান একজন খৃস্টান ধরা না পড়ে যদি কোনো মুসলিম ধরা পড়তো তাহলে কি হতো তা আল্লাহই জানেন। তিনি আবেগের সাথে বললেন, মুসলমানদের দ্বারা যখনই কোনো সন্ত্রাসের ঘটনা কোথায় ঘটে তখনই অস্বস্তি, শঙ্কা ও লজ্জা আমাদের এসে ঘিরে ধরে। এ ধরনের হিংসা, সন্ত্রাস একেবারেই ইসলাম সম্মত নয়। এরপরও সন্ত্রাসের দায় ইসলামের ওপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। প্রফেসার আলতোমার সাথে আমাদের এ আলোচনা আরো চলতে পারতো কিন্তু সময় হাতে ছিল না। আমরা বিদায় চাইলাম। আমাদের সাথে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তিনি বললেন, কোনো নিবন্ধ বা এ ধরনের কোনো কিছু দরকার হলে লিখবেন আমি সহযোগিতা করতে চেষ্টা করবো। আমরা বেরিয়ে এলাম প্রফেসার আলতোমাও আমাদের সাথে এলেন। তিনি আমাদেরকে আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রামের জায়গা ইন্ডিয়ানা

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর ইন্সটিটিউটে পৌঁছে দিলেন। আমাদেরই এক মুসলিম ভাইয়ের এই সহযোগিতা আমাদেরকে মুগ্ধ করলো। ক্যাফেটোরিয়াতেও তিনি নিজ হাতে আমাদের খাবার ও পানি এনে দিয়েছিলেন। তারই ডিপার্টমেন্টের একজন পাকিস্তানী ছাত্র তার সার্ভিস অফার করেছিলেন। প্রফেসর আলতোমা তাকে বসিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, তোমরা সকলেই আমার মেহমান। ষাটোর্ধ্ব বয়সের একজন অধ্যাপকের এই ব্যবহার শিক্ষণীয়।

ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর ইন্সটিটিউটে অধ্যাপক হেনরি গ্লাসির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ করার কথা। আমরা জেনেছি তিনি তিনবার বাংলাদেশ সফর করেছেন। এ বছরও মার্চ মাসে তিনি বাংলাদেশ গিয়েছিলেন। তিনি অধ্যাপক মনসুরুদ্দিন এবং অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকীকে খুব ভালো চিনেন। তিনি অধ্যাপক মনসুরুদ্দিনের বাড়িতেও গিয়েছেন।

ফোকলোর ইন্সটিটিউটের সামনে দাঁড়াতেই কিছুটা রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। এই ফোকলোর ইন্সটিটিউটে আমাদের পল্লি কবি জসিম উদ্দিনও এসেছিলেন। তিনি পল্লীর গান ও কথার মানুষ। তিনি ফোকলোর ইন্সটিটিউটকে যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন আমি হয়তো সেভাবে দেখছি না, তবু আমার খুব ভালো লাগল ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ইন্সিটিটিউট গ্রামের মানুষের কথা ভাবে বলে।

আমরা ফোকলোর ইন্সটিটিউটে পৌঁছলে অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি'র মহিলা সেক্রেটারি আমাদেরকে অধ্যাপক হেনরি'র অফিসে পৌঁছে দিলেন। অধ্যাপক হেনরি গ্লাসি তার রুমের দরজায় আমাদের স্বাগত জানালেন। তার কক্ষে চেয়ার ছিল মাত্র তিনটি। অ্যধাপক গ্লাসি ও ইরউইন কার্নসহ আমরা মোট চারজন। অধ্যাপক গ্লাসি অন্য কক্ষ থেকে নিজ হাতে চেয়ার এনে চারজনের বসার ব্যবস্থা করলেন। আমেরিকায় আমাদের কর্মসূচির অনেক ক্ষেত্রে এমনটা ঘটেছে। সম্মানিত সিনিয়র অধ্যাপকরা নিজেরাই নিজের কাজ আনন্দের সাথে করেছেন। আজকেই এর আগে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। অধ্যাপক স্কট আলেকজ্যান্ডারকে অন্য কক্ষ থেকে আমাদের সবার জন্য দু'টি চেয়ার আনতে হয়েছে। আবার আমরা যখন বেরিয়ে আসি তখন তিনি সে দু'টি চেয়ার আবার সংশ্লিষ্ট কক্ষে পৌঁছে দিয়েছেন।

প্রফেসর হেনরি গ্লাসি প্রথমে বাংলাদেশ নিয়ে কথা শুরু করলেন। তিনি বললেন, বাংলাদেশের খাদ্য এবং আবহাওয়া দুইই আমার ভালো লেগেছে। সেখানকার মানুষ এবং সাংকৃতিক ঐতিহ্য আরো সুন্দর। তারপর আলোচনা শুরু হলো দেশ-

www.pathagar.com

বিদেশের কালচার ও ইতিহাস নিয়ে। তিনি তুরস্কেরও ভূয়সি প্রশংসা করলেন। এরপর তিনি বললেন, আপনাদের সফরের সাবজেক্ট খুবই ইন্টারেস্টিং। আপনারা কি জানতে চান বলুন। আমি আপনাদের সহযোগিতা করতে পারলে খুশি হবো। প্রথমেই তার কাছে জানতে চাইলাম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ধর্মের ভবিষ্যৎ কি? তিনি হাসলেন। তারপর ধীরে ধীরে তার মুখে গাম্ভির্য নেমে এলো। তিনি বললেন, দেখুন মানুষ এখানে ধর্মভীরু হচ্ছে, মানুষের ধর্ম বিশ্বাস বাড়ছে, চার্চে বেশি বেশি মানুষ যাচ্ছে, চার্চের সদস্য সংখ্যা বাড়ছে, এ ধরনের যেসব পরিসংখ্যান দেয়া হয় সেসব আমি বিশ্বাস করি না, সবই ভূয়া। আসলে ধর্মীয় আচরণ কোথাও নেই, গুটিকতক চার্চের ভিতর ছাড়া। মার্কিন জনসাধারণ ধর্মভীরু ছিল। কিন্তু সে সমাজ পাল্টে গেছে। এখন ধর্ম কোথাও নেই। মানুষ তার ব্যক্তি ও বর্তমান নিয়ে ব্যস্ত। ধর্মের ভবিষ্যৎ খুবই হাতাশাব্যঞ্জক। আমি বললাম, এই অবস্থার জন্য ধর্ম কি নিজেই দায়ী? সমাজে ধর্মের কি কিছু দেবার নেই। কিংবা চার্চ কি এই দায়িত্ব পালন করেনি? না সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ এর মূলে কাজ করছে? তিনি বললেন, ধর্ম নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ এর মূলে কাজ করছে। তিনি বললেন, সামাজিক ও রাজনৈতিক মানসিকতায় যে পরিবর্তন এসেছে তার ফলেই এটা ঘটেছে। শিক্ষা নীতি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের দর্শন, অবাধ স্বাধীনতা ইত্যাদি সবকিছু মিলে এমন একটা সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যার ফলে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। খৃস্টান ধর্মের অবশ্যই দেবার কিছু ছিল কিন্তু সুযোগ পায়নি। ড. মুস্তাফিজ সাহেব আমার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করে আরো সুস্পষ্টভাবে জানতে চাইলেন, খৃস্টধর্মে যুগের চাহিদা পূরণ করার মতো কিছু নেই বলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি তো? তিনি এটা স্বীকার করলেন না। তিনি আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণকেই দোষলেন।

আমার পরবর্তী প্রশ্নটা ছিল একটু বড়। আমি বললাম, বিষয়টাকে আমি এভাবে দেখতে চাই যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডিং ফাদাররা এবং মার্কিন সংবিধান চেয়েছিল রাষ্ট্রের সরকার ও শাসনযন্ত্রকে ধর্ম থেকে, অন্য কথায় ধর্মের অনুশাসন ও বাস্তবায়ন থেকে দূরে রাখতে। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকার এবং তার প্রতিষ্ঠানগুলো জনগণকেই ধর্ম থেকে দূরে রাখার সকল ব্যবস্থা করে। শিক্ষাঙ্গন থেকে শুরু করে সকল সামাজিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে সেকুলার করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানকে সেকুলার করার নামে ধর্ম থেকেই দূরে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। যা অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের বৈরিতায় রূপ নিয়েছে। ফলে মানুষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে

www.pathagar.com

শুরু করে জাতীয় সংস্থাসমূহের কোথাও ধর্মকে দেখেনি বরং পেয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার নামে ধর্মহীন হবার মটিভেশন। এভাবেই মানুষের জীবন ও সমাজ থেকে ধর্মকে দূরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। প্রফেসার হেনরি আগের মতোই আবার হাসলেন। শান্ত হাসি। তারপর আবারও গম্ভীর হয়ে পড়লেন। একটু সময় নিয়ে কথা শুরু করলেন। তিনি প্রথমে ব্যাখ্যা করলেন, ফাউন্ডিং ফাদাররা কি চেয়েছিলেন। ফাউন্ডিং ফাদারদের সামনে ইউরোপীয় সমাজ ছাড়া আর কিছু ছিল না। তারা দেখেছিলেন চার্চ ও রাষ্ট্রের আতাত ও দ্বন্দ্বে জনসাধারণের দূরবস্থা। সেই অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখেই ফাউন্ডিং ফাদাররা চেয়েছিলেন রাষ্ট্র প্রশাসনকে প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম প্রতিষ্ঠা বা ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে দূরে রাখতে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের ইচ্ছার অপব্যাখ্যা অপব্যবহার করা হয়েছে। শুধু রাষ্ট্র থেকেই ধর্মের বিচ্ছেদ ঘটানো হয়নি, সমাজের সবকিছু থেকেই ধর্মকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ব্যক্তি সমাজেরই অংশ। তাই অবশেষে সমাজ জীবন থেকেও ধর্ম আজ দূরে সরে গেছে।

এই উত্তর তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দিয়েছেন। ইউরোপের রোমান ইতিহাস, চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যকার মৈত্রি ও দ্বন্দ্ব এসব বিষয়ে ইউরোপের অভিজ্ঞতা, স্বাধীন মার্কিন রাষ্ট্র ব্যবস্থা শুরুকালীন ফাউন্ডার ফাদারদের বিবেচনা সবই তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছিলেন। ইউরোপের চার্চ ও স্টেটের বেআইনী স্বেচ্ছাচারিতা ইউরোপীয় জনগণকে সংঘাতে ডুবিয়ে দিয়েছিলো। সেই অভিজ্ঞতা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফাউন্ডার ফাদাররা আমেরিকান সমাজকে ঐ সংঘাত থেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে স্বাধীন এবং ধর্ম রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন থাকুক এটাই তারা চেয়েছিলেন। প্রফেসর হেনরি গ্লাসির মতে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক রাখার নীতি রাষ্ট্রযন্ত্রের লোকদের থেকেও ধর্মকে দূরে সরিয়ে দেবার নীতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আমি বললাম, বিষয়টাকে এভাবে দেখা যায় কি না যে, মানুষ ধর্মভীরুই ছিল বা আছে, কিন্তু সেক্যুলার সিস্টেমের কারণেও তারা কিছু করতে পারেনি। যেমন মার্কিন প্রেসিডেন্টরা বাইবেলে হাত রেখে শপথ নেন যা মুসলিম দেশগুলোতে নেই। তারা তাদের ধর্মগ্রন্থকে এই মর্যাদা দেয় না। সুতরাং মার্কিনিরা ধর্মবিমুখ নন। প্রফেসর হেনরি গ্লাসি বললেন, বাইবেলে হাত রেখে শপথ নেয়া একটা রীতি মাত্র। এর সাথে তাদের ধর্মবোধের কোনো সম্পর্ক নেই। বলা যায় প্রেসিডেন্ট কার্টার কিছুটা ধর্মভীরু ছিলেন।

দীর্ঘ আলোচনা শেষে আমরা তার কক্ষ থেকে বের হলাম। তিনি আমাদের সাথে

www.pathagar.com

হেঁটে আমাদের গেস্টহাউজ পর্যন্ত এলেন। হাঁটার সময়ও নানা কথাবার্তা হলো। আমরা খুবই মুগ্ধ হলাম যে তিনি আমাদের সাথে আমাদের গেস্টহাউজ পর্যন্ত এলেন। এমন সৌজন্যবোধ অনুকরণীয়। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম।

আমরা আমাদের কক্ষে ফিরে এলাম। রাত আটটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের একটা দোকানে গিয়ে পাউরুটি, আলুফ্রাই আর টমেটোর জেলি নিয়ে এলাম। রাতের ডিনারের জন্য।

৬ জুন মঙ্গলবারের সকাল। আজ সকালেই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রোগ্রাম আছে। আমরা পাউরুটি ও জুস দিয়ে নাস্তা সেরে সাড়ে নয়'টায় গেস্টহাউজের লাউঞ্জে নামলাম। দশ'টায় আমাদের প্রোগ্রাম। নয়'টা পঁয়তাল্লিশে ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম ডিভিশনের প্রোগ্রাম অফিসার মিস ইদা ক্লাহান এসে আমাদের নিয়ে যাবার কথা। নয়'টা পঞ্চাশ মিনিটে তিনি এলেন। পাঁচ মিনিট দেরি হওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমাদের প্রোগ্রাম ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর ইউনিভার্সিটি মিনিস্ট্রি' এর মিনিস্টার (ধর্মীয় প্রধান) রবার্ট টার্নারের সাথে। তার অফিসের সামনে আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। অফিসের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন পঞ্চাশোর্ধ একজন মানুষ। মনে হলো তিনিই মিস্টার টার্নার। হাঁ তাই। ভদ্রলোক আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছেন। খুব খুশি হলাম। তার অফিসে নিয়ে তিনি আমাদের বসালেন। কথা শুরু হলো। তার সেন্টার কোনো চার্চ নয়। কিন্তু প্রতি সোমবার এখানে প্রার্থনা হয়। তিনি খৃস্টান ধর্মের প্রেসবেটেরিয়ান গ্রুপ অনুসরণ করেন। প্রশ্ন করলাম প্রার্থনায় আসেন এবং ধর্মের প্রতি অনুগত এমন ছাত্রের সংখ্যা কেমন। তিনি জানালেন, চৌত্রিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে এমন ছাত্র হাজার তিনেকের মতো হতে পারে। জানতে চাইলাম, আপনার সেন্টারের এমন কোনো ব্যবস্থা আছে কি না যার দ্বারা আপনারা ছাত্রদের ধর্মপ্রবণতা বাড়ছে না কমছে জানতে পারেন। তিনি বললেন, না এমন কোনো ব্যবস্থা আমদের নেই, বিশ্ববিদ্যালয়েরও নেই। এসব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মাথা ঘামায় না। আমি বললাম, যদি মাথা ঘামায় তাহলে কি তা শাসনতন্ত্র বিরোধী হবে? তিনি বললেন, হাঁ হবে। কারণ এটা পাবলিক ইউনিভার্সিটি। এ ইউনিভার্সিটি সরকারি টাকা নেয়। চার্চ এবং স্টেট পৃথক– এ নীতি এখানেও প্রযোজ্য। ধর্মের সাহায্য-সহায়তা হয় বিশ্ববিদ্যালয় এমন কিছু করতে পারে না। আমি জানতে চাইলাম, আপনার মতে এই পৃথকীকরণের ফল

www.pathagar.com

কী হয়েছে? উত্তর দিতে গিয়ে তিনি ফলাফলের বেশ কয়েকটা দিক তুলে ধরলেন। বললেন, ছাত্ররা কোনো প্রবণতার শিকার না হয়ে সকল সূত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করতে পারছে। দ্বিতীয়ত, এক ধর্মের ওপর অন্য ধর্মের গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। সুতরাং এ নিয়ে কোনো সমস্যা বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। তৃতীয় বিষয় হলো- চার্চের অর্থাৎ ধর্মের ক্ষতি হচ্ছে। ড. মুস্তাফিজ সাহেব বললেন, সরকার ধর্ম থেকে দূরে থাকলে জনগণ ধর্মের দিকে এগিয়ে আসে, এটাই হয়। সুতরাং এ সুবিধা তো আপনারা পেয়েছেন। ধর্মের ক্ষতি হবে কেন? মিস্টার টার্নার বললেন, এটা ঠিক নয়। ধর্মের ক্ষতি হচ্ছে। চার্চের সদস্য সংখ্যা কমছে। আমি বললাম, তাহলে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যে চার্চ ও রাষ্ট্রকে আলাদা করার নীতি ক্রমশ জনগণ ও ধর্মের মধ্যে ব্যবধান ঘটাচ্ছে। ধর্মের ক্ষতি হওয়ার বা জনজীবন থেকে ধর্ম দূরে সরে যাবার কারণ এটাই। মিস্টার টার্নার এভাবে কথাটা স্বীকার করলেন না। বললেন, আমি এভাবে চিন্তা করি না। তারপর এ নিয়ে তিনি অনেক কথা বললেন। উপসংহারে জানালেন, বিষয়টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিরাট বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। দেশে এখন তিনটি পক্ষ। প্রথম পক্ষ সরকার, দ্বিতীয় পক্ষ চার্চ (যেমন খৃস্টান কোয়ালিশন) এবং তৃতীয় পক্ষ হলো জনগণ বা সভ্যতার কালচার। সরকার ও চার্চ লড়াই শুরু করেছে এই কালচার দখলের জন্যে। চার্চের ঐক্য বিধানের দ্বারা এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মাধমে চার্চ রাজনৈতিক লাইন নিয়েছে। সিনেট ও কংগ্রেসে মেজোরিটি অর্জন বা সদস্যদের পক্ষে আনার মাধ্যমে আইন প্রনয়ণ করে তা জনগণের ওপর চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। তার কাছে জানতে চাইলাম, দুই প্রতিযোগী পক্ষের মধ্যে আমরা জানলাম চার্চ ধর্মের পক্ষে কাজ করছে, কিন্তু সরকার কার পক্ষে কাজ করছে? সরকার কোন স্বার্থকে প্রমোট করছে? প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে মিস্টার টার্নার বললেন, জনগণের জন্য সরকার, জনগণের সুখের জন্যই সরকার কাজ করছে।

মিস্টার টার্নারের সাথে আমাদের আলোচনাটা দীর্ঘই হলো বলা যায়। সময় আমাদের শেষ হয়ে গেল। আমাদের সময় দেয়ার জন্য, সহযোগিতা করার জন্য মিস্টার টার্নারকে ধন্যবাদ দিলাম। আমরা বিদায় চাইলাম। তিনি আমাদের তার অফিসের বাইরে পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আমাদের আজকের দ্বিতীয় প্রোগ্রামটা এই ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক অধ্যাপকের সাথে। তিনি প্রফেসর শেরম্যান জ্যাকসন। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিয়ার ইস্টার্ন ল্যাংগুয়েজ এন্ড ক্যালচার' বিভাগের প্রধান তিনি। জন্মগতভাবে তিনি আমেরিকান খৃস্টান। সতের বছর

www.pathagar.com

আগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার সাথে তার স্ত্রীও। ওনাদের সাথে সাক্ষাৎকালে তার ছয়-সাত বছরের ছেলেও তার সাথে ছিল, নাম শিহাবউদ্দিন। তার সাথে কথাবার্তার শুরুতেই তার বিভাগের কাজ সম্পর্কে একটা ধারণা নিলাম। আমি বললাম, আমাদের আগ্রহ সমাজে ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে জানা। ধর্মের প্রভাব সমাজে বাড়ছে না কমছে। তিনি বললেন, বিষয়টা এখন বড় একটা রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। গত ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিজয় লাভ করেছে রিপাবলিকানরা। খৃস্টান রাইটরা বেশি পরিমাণে এর সাথে যুক্ত। পাবলিক স্কুলে প্রার্থনা ও ফ্যামিলি ভ্যালুজ এখন বড় একটি বিতর্কের বিষয়, যা আমাদের রাজনীতিকেও স্পর্শ করছে। ভবিষ্যতে ধর্ম আমাদের রাজনীতিতে একটা বড় বিষয়ে পরিণত হবে। খৃস্টান রাইটদের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বললেন, এদের মধ্যে রয়েছে খৃস্টান কোয়ালিশন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি প্রসঙ্গে তিনি আরো বললেন, আমেরিকান সংবিধান প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে ধর্মের প্রতি ভয় নিয়ে। এর প্রভাব পড়েছে সর্বত্র। ভয়ের বস্তুকে মানুষ পরিত্যাগ করবে এটাই স্বাভাবিক। সেটাই হয়েছে। ফল হয়েছে যা হবার তাই। আমাদের পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে, মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে ধর্মকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। দম নেয়ার মতো একটু থেমে আবার তিনি বললেন, ধর্মকে কিন্তু বিলুপ্ত করা যায়নি। যেখানে ছিল সেখানেই রয়েছে। বরং ধর্মের আবার উত্থান ঘটছে। আমাদের জীবনের 'আধুনিকতা' নিজেই নিজের ধ্বংস সাধন করছে। প্রমাণ হয়েছে সেক্যুলারিজম সমাজ বা জীবনের কোনো নিশ্চিত ঠিকানা দেয় না।

আমাদের আলোচনাটা মুসলমানদের প্রসঙ্গে মোড় নেয়। আমেরিকান মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বললেন, মুসলমানরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে ওঠা দরকার। শিক্ষায় তা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। শিক্ষা থেকে আসবে চাকরি, বিনিয়োগ, তারপর সমৃদ্ধি। মুসলমানরা আমেরিকান সমাজের আধুনিকতার মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছেন। ব্যতিক্রম কিছু তো থাকবেই। মুসলমান যারা এদেশে এসেছে এবং বাস করছে, তারা নিজ দেশে মুসলিম সমাজে থাকার সময় যে পারিবারিক বন্ধন রাখত, আমেরিকান সমাজে এসে তাদের সে বন্ধন আরো শক্তিশালী হয়েছে। তাদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও এটাই সত্য। ভিন্ন বিশ্বাস ও কালচারের মধ্যে এসে নিজেদের বিশ্বাস ও কালচারের প্রতি আকর্ষণ আরো বেড়েছে। আমেরিকায় ইসলামের প্রসার ঘটছে। মুসলিম খৃস্টান হওয়ার দু'একটা ঘটনা অবশ্যই ঘটেছে।

www.pathagar.com

সন্ত্রাস ও চরমপন্থা নিয়েও কথা ওঠলো। পলিটিক্যাল ইসলাম বা মিলিট্যান্ট ইসলাম সম্পর্কে তার মত জানতে চাইলে তিনি আমেরিকাবাসী একজন মরক্কোর বংশোদ্ভূত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিলেন। বললেন, মরক্কোর বংশোদ্ভূত ঐ লিবারেল ব্যক্তি বলেছেন, 'মিসরে থাকলে আমিও মিলিট্যান্ট বা ফান্ডামেন্টালিস্ট হতাম। সেখানে এবং ঐ ধরনের মুসলিম দেশে ধর্ম ও সংস্কৃতির যা অবস্থা করা হয়েছে, তাতে পলিটিক্যাল ইসলাম না করে উপায় নেই। তিনি বললেন, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পরিবেশই এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। চরমপন্থা বা মিলিট্যান্সি অনেকের কাছে এখন গর্বের বিষয়। শাসকদের ক্ষমতা লিপ্সা, আদর্শচ্যুতি, স্বৈর-আচরণ বন্ধ হলে, জনকল্যাণমুখী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এ অবস্থা থেকে সরে আসা সম্ভব হবে। অবেশেষে আলোচনা শেষ করে প্রফেসর শেরম্যান জ্যাকশনের কাছ থেকে বিদায় নিতে হলো। প্রফেসর শেরম্যান খুবই বাস্তববাদী মানুষ। তার বিশ্লেষণ খুব নগ্ন হলেও তা সত্যেরই প্রতিধ্বনি করেছে। চারটায় গেস্টহাউজে ফিরে এলাম। বাথরুম করে ফ্রেস হয়ে এসে তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নিলাম। সময় ক্ষেপণ ও বিশ্রাম নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। সাড়ে পাঁচটায় ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুসলিম ছাত্র আসবে আমাদের ডিনারে নিয়ে যাবার জন্য।

সময়ের একেবারে কোনো এদিক সেদিক নেই। ঠিক সাড়ে পাঁচটাতেই ছাত্রটি এলো। মিসরে ওর বাড়ি। তবে পিতা-মাতা এখন আমেরিকার বাসিন্দা। পেশায় ডাক্তার। ছেলেটা এখানেই বড় হয়েছে। মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি। পরে জেনেছি ছেলেটা নামাযী।

আমরা একটু এদিক সেদিক ঘুরে ঠিক সময়ে ডিনারের জন্য গেলাম। ডিনারে একজন মরোক্কান এবং একজন ইয়েমিনি ছাত্র এলো। তাদেরও মুখে দাড়ি। বাংলাদেশি ছাত্রও ছিল ডিনারে। নাম শাহেদ, তার একজন বন্ধু ফুলব্রাইট বৃত্তি নিয়ে পড়তে এসেছে। শাহেদের সাথে সেও এসেছে। ডিনার শেষে আমরা ব্লুমিংটনে সুন্দর একটা মসজিদে নামায পড়তে গেলাম। মসজিদটি ছাত্রদের অনুদানে তৈরি। অন্যান্য মসজিদের মতো এ মসজিদেও মেহরাব ও মিনার নেই। তারা বলল, লাউড স্পিকারে যখন আজান দেয়া যাবে না তখন এত খরচ করে মিনার বানিয়ে লাভ কী। নামায পড়ে আমরা গেস্টহাউজে ফিরতে চাইলে উপস্থিত ছাত্ররা বলল, আরো কিছু ছাত্র নিয়ে আমরা বসবো আপনারা থাকলে ভালো হয়। আমি বললাম, আমাদের হাতে সময় নেই। আমরা তাদের কাছে বিদায় নিয়ে গেস্টহাউজে ফিরে এলাম।

www.pathagar.com

সাত জুন ভোরে ওঠে নামায পড়ে আর ঘুমালাম না। সকালের নাস্তার দাওয়াত দিয়েছে সাইয়েদ রফিউদ্দিন। খুব সকাল সকাল তার আসার কথা। তাই হলো। সাড়ে সাতটার মধ্যেই সে আমাদের গেস্টহাউজে এলো। তার সাথে আমরা একটা রেস্টুরেন্টে গেলাম। আমাদের সাথে ফিরোজ আহমেদ নামে একজন ছাত্রও ছিল। নাস্তার টেবিলে বসেই ঠিক হলো নাস্তা শেষে আমরা 'লেক মনরো' দেখতে যাব।

গাড়ি নিয়ে তারা এসেছিল। আমরা লেক মনরো যাত্রা করলাম। লেক মনরো সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। যেতে যেতে শুনলাম অনেক কিছু। শুরুতে মনরো নামের কোনো লেক ছিল না। এলাকাটা ছিল মিয়ামি এবং দেলোয়ার ইন্ডিয়ানদের সম্পত্তি। সরকার এই এলাকাটা উপযুক্ত দামে ইন্ডিয়ানদের কাছ থেকে কিনে নেয়। ব্লুমিংটন থেকে লেক মনরোর দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার। সল্ট ক্রিক নদীতে বাঁধ দিয়ে লেক মনরোর সৃষ্টি করা হয়েছে। আসলে লেক মনরো একটা রিজার্ভার। প্রায় ১১ হাজার একর এলাকা নিয়ে এর অবস্থান। পানির গভীরতা প্রায় ৬০ ফিটের মতো। পাহাড়ী রিজার্ভারের মতোই এটা বেশ আঁকাবাঁকা। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুবই মনোমুগ্ধকর। পর্যটকদের জন্য এটা দারুণ আকর্ষণীয় জায়গা। রয়েছে হোটেলের ব্যবস্থা। মাছ ধরা এবং নৌকা ভ্রমণ পর্যটকদের প্রিয় আইটেম। শত শত বোট রয়েছে পর্যটকদের জন্য। লেক মনরোতে পৌঁছলাম। আমাকে অভিভূত করলো এর পরিবেশ। শহরের কোলাহল থেকে দূরে নিঝুম পরিবেশে চারদিকের সবুজ সমুদ্রের মাঝখানে বিশাল নীল চাদরের মতো লেকটা। পরম আরামে যেন ঘুমিয়ে আছে নিস্তরঙ্গ লেক মনরো। লেকের পানিতে নৌকা ভ্রমণের সুযোগ আমাদের হয়নি, অতটা সময়ও আমাদের ছিল না। দশটার মধ্যেই আমাদের গেস্টহাউজে পৌঁছতে হবে। সাড়ে এগারটার মধ্যেই ব্লুমিংটন থেকে আমাদের প্লেন ফিল্ডে যেতে হবে। তবু যতটা পারা যায় আমরা ঘুরলাম। মাছ ধরার প্রতিযোগিতা দেখলাম। দশটার মধ্যেই আমরা ফিরে এলাম ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউজে। বিশ্রাম হলো না। তবু কয়েক মিনিট বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে গেস্টহাউজের লবিতে নেমে এলাম।

দুপুরের খাওয়াসহ আমাদের প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট আছে। আমাদের দাওয়াত দিয়েছেন প্লেন ফিল্ডের 'ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকা' (Islamic Society of North America-ISNA)। ব্লুমিংটন থেকে প্লেন ফিল্ড প্রায় ৪০ মাইল। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়েমিনি ছাত্র রিয়াদ আমাদেরকে তার গাড়িতে করে

www.pathagar.com

প্লেন ফিল্ডে নিয়ে গেলেন। তার স্ত্রী ইসনার প্রোগ্রামে প্লেন ফিল্ডে গেছেন। আমাদেরকে রেখে তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন। খুব ভালো ছেলে, খুব নামাযী ছেলে এই রিয়াদ।

সুন্দর রাস্তা। সময় বেশি লাগলো না। দেখতে দেখতেই আমরা পৌঁছে গেলাম প্লেন ফিল্ডে ইসনার অফিসে। ইসনা অফিসে ইসনার সেক্রেটারি জেনারেল ড. সাঈদের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনিই আমাদের হোস্ট। তার অফিসে আমরা বসলাম। শুরুতেই তিনি বললেন, 'আমাদেরকে আপনারা সময় দিলেন না। যেটুকু সময় নিয়ে এসেছেন তাতে আমরা যা চাই তা হবে না।' সত্যিই ব্যাপারটা তাই। খাওয়া-দাওয়ার পরেই বলতে গেলে আমাদেরকে গাড়িতে ওঠতে হবে। যেতে হবে ইন্ডিয়ানা এয়ারপোর্টে, নিউইয়র্কে যাবার জন্যে। আমেরিকা নিয়ে বেশ কিছু কথা হলো ড. সাঈদের সাথে। বিতর্কিত কিছু প্রশ্নও ওঠলো। যা নিয়ে আমরা গোটা সফরের বিভিন্ন জনের সাথে আলোচনা করেছি। ড. সাঈদ আমাদের জানালেন, 'আমেরিকা ইউরোপ থেকে ভিন্ন। আমেরিকা ওপেন সোসাইটির দেশ। জীবন-যাপনের অবাধ স্বাধীনতা এখানে। স্বাধীন মত প্রচারে এখানে কোনো বাধা নেই। সত্যিকার অর্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল না, কোনো কলোনি শাসন করেনি। বরং এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলোর মতো ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মগতভাবেই গণতান্ত্রিক। এটা মুসলমানদের জন্য মঙ্গল।'

ড. সাঈদ ইসনা'র সাংগঠনিক অবকাঠামো এবং তাদের কাজের ক্রমবর্ধমান বিস্তার ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের অনেক কথা জানালেন। তিনি কিছু কাগজপত্র আমাদের দিলেন। ইসনা'র স্কুল বিভাগের ড. শাকেরের সাথে আমাদের আলাপ হলো। কথা উঠলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাবলিক স্কুলে প্রার্থনা বিষয়ক চলমান বিতর্ক নিয়ে। তিনি বললেন, বিষয়টির অর্থ না বুঝে এ নিয়ে ঝগড়া করা হচ্ছে। আইন করে স্কুলে প্রার্থনার ব্যবস্থা করার দরকার নেই, সব গ্রুপকে প্রার্থনার স্বাধীনতা দিলেই হয়ে যায়। এটা সংবিধানের বিরোধীও হবে না। যোহরের নামাযের সময় হলো। আমরা ইসনা'র মসজিদে সবাই মিলে নামায পড়লাম। ইসনা আমাদেরকে লাঞ্চেরও দাওয়াত দিয়েছিলো। আমরা নামায শেষে লাঞ্চ করলাম। ইন্ডিয়ানায় এটাই আমাদের শেষ প্রোগ্রাম। লাগেজ নিয়েই আমরা ইসনা'য় এসেছি। আমরা লাঞ্চ শেষে গাড়িতে ওঠলাম। তারপর সোজা ইন্ডিয়ানা এয়ারপোর্টে। সোয়া সাতটার দিকে যাত্রা নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৮

আমাদের আমেরিকা সফরের শেষ গন্তব্য নিউইয়র্কের উদ্দেশ্যে ছুটে চলছি আমরা। নিউইয়র্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম নগরী। নিউইয়র্ক নগরীর পাঁচটি প্রধান বিভাগ ম্যানহ্যাটান, ব্রুকলিন, ব্রুন্স, কুইন্স এবং রিচমন্ড (স্টেটিন আইল্যান্ড)। বিভিন্ন জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির বহুত্ব নিউইয়র্ককে আকর্ষণীয় কসমোপলিটান ও আন্তর্জাতিক নগরীতে পরিণত করেছে। হাডসন এবং ইস্ট রিভার আটলান্টিকের তীরে নিউইয়র্ক নগরীর অবস্থানকে করেছে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত। নিউইয়র্ক প্রাচীনতম একটি নগরীও। ডাচরা সপ্তদশ শতকে হাডসন নদীর মুখে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করে। নিউইয়র্ক পৃথিবীর সুন্দরতম একটি বন্দরও। উনিশ' শতকেই নিউইয়র্ক আমেরিকার সর্ববৃহৎ সমুদ্রবন্দরে পরিণত হয়। মার্কিন বাণিজ্যের শতকরা চল্লিশ ভাগই নিউইয়র্ক বন্দর দিয়ে উঠানামা করে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এই নিউইয়র্ক শহরে। নিউইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের হেড কোয়ার্টার ওয়াল স্ট্রিট পৃথিবীব্যাপী পরিচিত। বিস্ময়ের ব্যাপার গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট গ্রন্থ প্রকাশনার তিন-চতুর্থাংশ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত হয়। মার্কিন বিজ্ঞাপনী এজেন্সির সত্তর ভাগই নিউইয়র্ক-বেসড। শিক্ষার দিক দিয়ে নিউইয়র্কের জগৎ জোড়া নাম। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি, ফোর্ডহাম ইউনিভার্সিটি এবং নিউ স্কুল অব সোস্যাল রিসার্চ নিউইয়র্কের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। পুরাতন স্থাপনার মধ্যে সেন্ট প্যাট্রিক্স ক্যাথেড্রাল, মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট, ব্রুকলিন ব্রিজ, ওয়ার্লডরফ-এসট্রোরিয়া হোটেল, ইউরোপীয় ইমিগ্রান্টদের প্রাচীন অভ্যর্থনা ক্যাম্প এবং স্ট্যাচু অব লিবার্টি নিউইয়র্কের দর্শনীয় স্থানগুলোর কয়েকটি। সবচেয়ে বড় কথা নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তর। এ দিক থেকে নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক রাজনীতির কেন্দ্র। সেই নিউইয়র্কে আমরা দ্বিতীয়বার পা রাখতে যাচ্ছি। প্রথমবার আমরা নিউইয়র্ক দিয়ে ঢুকে ওয়াশিংটন গিয়েছিলাম।

সব ব্যবস্থা করাই ছিল। আমরা নিউইয়র্ক বিমানবন্দরে নেমেই সোজা আমাদের হোটেলে গিয়ে উঠলাম। নিউইয়র্কের ফিফটি ফাস্ট স্ট্রিটে লেক্সিংটন এভিনিউতে হোটেলটি। নাম লুইস নিউইয়র্ক। নিউইয়র্কে আমাদের হোস্ট মিস ডোনা শেরিফ

www.pathagar.com

এবং মিস্টার আমান মুবিন। প্রথম জন ইউএস ইনফরমেশন এজেন্সির রিসেপশন সেন্টারের ডাইরেক্টর, দ্বিতীয় জন প্রোগ্রাম অফিসার। হোটেলে পৌঁছে রুম পেতে আমাদের রাত বারটা বেজে গেল। রুমে ব্যাগবাগেজ রেখেই আমরা নিচে নেমে গেলাম খাবার দোকানের সন্ধানে। লোনা মাছের সান্ডউইচ নিয়ে যখন রুমে ঢুকলাম তখন রাত একটা। খাওয়া সারতে বাজলো রাত দেড়টা।

৮ জুন নিউইয়র্ক এ আমাদের প্রথম সকাল। নামায পড়ে একটু গড়িয়ে নিতেই আটটা বেজে গেল। সকালে আমাদের খাবার নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হলো না। আলমগীর হোসেন আমাদের জন্য খাবার নিয়ে এলেন। পোলাও ধরনের খাবার। হোটেলের নয় হোমমেড। সকালের জন্য যদিও ভারি খাবার, তবুও আমরা খুশি হলাম। দেশীয় এ পোলাও এর সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের জন্য আনন্দের। আজ প্রথম প্রোগ্রাম দশটায়। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা নয়টায় বেরিয়ে এলাম হোটেল থেকে। আমাদের যেতে হবে আমাদের হোস্ট সংস্থা ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন এজেন্সির অফিসে। প্রোগ্রাম অফিসার আমান মুবিনের সাথে সেখানে সাক্ষাৎ হবে। ইরউইন কার্ন আমাদের সাথে। তার উৎসাহে আমরা হেঁটেই যাত্রা করলাম। ভালোই হলো। নিউইয়র্কের কিছু এলাকা ঘনিষ্ঠভাবে দেখা গেল। পথে আমরা দেখলাম বিশাল রকফেরার সেন্টার, চেস ম্যানহাটান ব্যাংক। এ ধরনের অনেক কিছুই আমাদের চোখে পড়লো। আসলে নিউইয়র্কের সাথে অন্য কোনো মার্কিন শহরের তুলনাই হয় না। আকাশ স্পর্শী সব দালান, প্রচুর ভিড়, প্রচুর গাড়ি। লসএঞ্জেলেস কিছুটা এরকম, কিন্তু এতটা না। শিকাগো ব্যস্ত শহর, কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে অনেক শান্ত ও খোলামেলা।

মিস্টার আমান মুবিনের অফিসে পৌঁছলাম। সফর সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তার সাথে কথা হলো। তিনি আমাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। আমি বললাম, এক কথায় বলতে গেলে সফর আমাদের সফল। থাকা খাওয়া পরিবহণ কোনো দিক দিয়ে আমাদের কোনো অসুবিধা হয়নি। যেটুকু অসুবিধা হতে পারতো মিস্টার কার্নের সহযোগিতা তা আমাদের পূরণ করে দিয়েছে। সকলের আমরা সহযোগিতা পেয়েছি। আমরা যে কয়টা বিষয়কে সামনে রেখে এই সফরটা করেছি সে বিষয়ে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি। সব মিলিয়ে একটা মার্কিন মানস আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাদের সঙ্গে আমরা দেখা করেছি, তারা সকলেই আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করেছেন, সহযোগিতা করেছেন এবং আন্তরিকভাবে তারা কথা বলেছেন। তার সাথে সাক্ষাতের পর আমরা টেলিফোনে ওয়াশিংটনে ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন

www.pathagar.com

এজেন্সির ডিরেক্টরের সাথে কথা বললাম। এটা প্রকৃতপক্ষে আমাদের বিদায়ী টেলিফোন যোগাযোগ। তিনি আমাদের সফরের খোঁজ-খবর নিলেন। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানালাম এবং সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম।

নিউইয়র্ক আমাদের সফরের শেষ আমেরিকান শহর। নিউইয়র্কে আমাদের জন্য দুইটি প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে। একটা হলো- 'করফারেন্স অব প্রেসিডেন্টস অব মেজর আমেরিকান জুইস অরগানাইজেসন্স' এর সাথে। অন্য প্রোগ্রামটি 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব দ্যা চার্চেস অব ক্রাইষ্ট ইন দ্যা ইউএস' এর সাথে। প্রোগ্রাম দুইটি অনেকটা উপসংহারের মতো। সফরকালে আমরা মুসলিম কমিউনিটি ছাড়া আমেরিকার প্রধান দুই কমিউনিটি হিসাবে কয়েকটি ইহুদি সংগঠন এবং অনেকগুলো খৃস্টান সংস্থা সংগঠনের সাথে কথা বলেছি। এখন নিউইর্য়কে সব ইহুদি সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী ইহুদি সংস্থা এবং খৃস্টান সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার সাথে আমরা কথা বলবো। যেন সফরকালীন আমাদের সব আলোচনা উপসংহার হবে নিউইয়র্কে। এ ধরনের আলোচনার ব্যবস্থা রাখায় খুশি হলাম।

আমরা আমান মুবিনের অফিস থেকে বেরিয়ে জুইস কনফারেন্স অফিসে গেলাম। তখন বেলা ১১টা। অফিসের গেটে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য কেউ ছিল না। আমরা গিয়ে আমাদের পরিচয় দিলাম এবং বললাম, মিস্টার ম্যালকম হোয়েনলিয়েন এর সাথে আমাদের প্রোগ্রাম আছে। মিস্টার ম্যালকম হোয়েনলিয়েন জুইস কনফারেন্স এর নির্বাহী ভাইস চেয়ারম্যান। নিছক আমাদের পরিচয় কোনো কাজ দিল না। আমাদের পরিচয়-পত্র দেখতে চাইলেন গেটের লোকরা। পরিচয়-পত্র দেখার পর আমাদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হলো। এরপর আরো দুই জায়গায় বডি সার্চ করা হলো। আমরা বিস্মিত হলাম। এ ধরনের ঘটনা আমাদের গোটা সফর প্রোগ্রামের মধ্যে কোথাও ঘটেনি। এমনকি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে ঢোকার সময় কেউ আমাদের পরিচয়পত্র দেখতে চায়নি এবং বডি সার্চও করা হয়নি। সবশেষে আমাদেরকে মিস্টার ম্যালকম হোয়েনলিয়েন এর অফিসে পৌছানো হলো। দেখা হলো মিস্টার ম্যালকম হোয়েনলিয়েনের সাথে। তার অফিস ঘরটি বইপুস্তক ও ফাইলপত্রে ঠাসা। ঘরের সিলিং এর কিছুটা নিচ বরাবর দেয়ালের চারদিক ঘিরে তৈরি সেলফে বইয়ের সারি। একই রকমের মোটা মোটা বই। মিস্টার ম্যালকম হোয়েনলিয়েনের সামনের টেবিলে দু'পাশে আমি ও ড. মুস্তাফিজ সাহেব বসলাম। আর তিনি তার চেয়ারে। আমাদের তিনজনের বসার অবস্থানটা ত্রিভুজের মত। মিস্টার ম্যালকম হোয়েনলিয়েন লোকটা মনে হলো খুবই গম্ভীর

www.pathagar.com

প্রকৃতির। প্রাথমিক সম্ভাষণ ও পরিচয়ের সময়ও তার মুখে আমরা দিলখোলা হাসি দেখলাম না। আমি খুবই উৎসুক ছিলাম ঘরের চারদিকে সেলফে সাজানো বইগুলোর ব্যাপারে। পরিচয় পর্বের পর আমি জিজ্ঞাসা করে বসলাম ঘরের চারদিকে সেলফে সাজানো ওগুলো কি বই। তিনি বললেন, ওগুলো আমাদের এয়ারবুক, জুইস এয়ারবুক। প্রতি বছরই আমাদের জুইস এয়ারবুক প্রকাশিত হয়। আমাদের কমিউনিটির উল্লেখযোগ্য সব বিষয়ই এয়ারবুকে স্থান পায়। বিস্মিত হলাম তাদের জাতীয় সব ব্যাপার স্থায়ীভাবে ধরে রাখার এই অব্যাহত প্রয়াস দেখে। ওদের জাতিগত সফলতার অনেকগুলো কারণের মধ্যে এই সচেতনতাও একটি কারণ।

আমাদের আলোচনা শুরু হলো। ড. মুস্তাফিজ সাহেব শুরুতেই ধর্মের ঐক্যের কথা তুললেন। 'বললেন, তিন ধর্মের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই, পার্থক্য সৃষ্টি করে আমরা সংঘাত বাধাচ্ছি'। মিষ্টার ম্যালকম হোয়েনলিয়েন কথা বললেন। তার কথার শুরুটা ছিল আক্রমণাত্মক। তিনি যা বললেন তার সারাংশ হলো, 'মুসলমানদের সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। ইসলামের নামে পলিটিক্যাল ব্যক্তিরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে। মুসলমানরা কেউ এর সমালোচনা করছে না।' তিনি এমনভাবে কথাগুলো বললেন, যেন ইসলামপন্থীদের রাজনীতি করাই ঠিক নয়, তাদের রাষ্ট্র ও দেশ নিয়ে যেন কথা বলাই সন্ত্রাস। আমি বললাম, ইসলামপন্থীদের গণতান্ত্রিক রাজনীতি কোনো সমস্যা সৃষ্টি করেনি এবং করছে না। সন্ত্রাসের ঘটনা যারা ঘটাচ্ছে তাদের কার্যক্রমকে কেউ ইসলামী বলছে না, সমর্থনও করছে না।' জবাবে তিনি বললেন, 'কিন্তু সমালোচনাও কেউ করছে না। মুসলিম দেশগুলো এবং সংগঠনগুলো যদি এর সমালোচনা করতো, তাহলে এ সন্ত্রাস চলতে পারতো না'। আমি বললাম, আপনি যে ধরনের সন্ত্রাসের কথা বলছেন, দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া এ ধরনের সন্ত্রাস মুসলমানরা করছে না। আর দু'চারটা সন্ত্রাসের ঘটনা অন্য ধর্মের লোকরাও ঘটাচ্ছে রাজনৈতিক পরিচয়ে এবং রাজনৈতিক দাবীতে। সুতরাং সন্ত্রাসের জন্য মুসলমানদের এককভাবে দায়ী করা যৌক্তিক নয়। আর যদি মধ্যপ্রাচ্যে ফিলিস্তিনিরা ফিলিস্তিনে যা করছে, কাশ্মিরীরা কাশ্মিরে যা করছে, ফিলিপাইনের মিন্দানাও বাসিরা মিন্দানাওয়ে যা করছে, তাকে যদি সন্ত্রাস বলা হয়, তাহলেও এ সন্ত্রাসের সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, মিন্দানাও ও চেচনিয়ার মতো দেশগুলোতে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম/সন্ত্রাস চলছে, তা আসলে ভূমির অধিকার নিয়ে। ইসলাম কিংবা ইসলামের কোনো ইস্যু এখানে এজেন্ডা নয়। ঘটনাক্রমেই ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, চেচনিয়া, মিন্দানাও এর স্বাধীনতা সংগ্রামী/সন্ত্রাসীরা মুসলমান। মুসলমান হলেও

www.pathagar.com

তাদের সংগ্রাম হলো ভূমির অধিকার নিয়ে, নিজ ভূমিতে স্বাধীন শাসনের অধিকার নিয়ে। সুতরাং ইসলামের নামে কোথাও সন্ত্রাস হচ্ছে না, এটাই সত্য।' মিস্টার ম্যালকম হোয়েনলিয়েন আমার কথার কোনো জবাব দিলেন না, বরং বলা যায় আরো এগ্রেসিভ হয়ে উঠলেন তিনি। তিনি বললেন, 'আমরা জানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানরা অস্ত্র ও অর্থ জোগাড় করছে সন্ত্রাস চালাবার জন্য'। আমি বললাম, 'এ ধরনের চরমপন্থী, সন্ত্রাসী থাকলে তাদের আমরা নিন্দা করি। আপনাদের সেরকম কিছু জানা থাকলে মার্কিন সরকারকে অবশ্যই জানানো উচিত। ইসলাম এ ধরনের চরমপন্থার বিরুদ্ধে। এ কথা ঠিক যে, বহুলাংশেই অব্যাহত অন্যায় অবিচার থেকে চরমপন্থা ও সন্ত্রাসের উদ্ভব ঘটছে। কারণ যাই হোক ইসলাম অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের, অবিচার দিয়ে অবিচারের মোকাবিলা করার বিরুদ্ধে। ভয়ানক শত্রুর মোকাবিলায়ও সুবিচার করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ আল-কুরআনে এবং বলা হয়েছে এই সুবিচার ঈমানেরই অংশ। সুতরাং মুসলিম কমিউনিটির কেউ যদি কোনো কারণে চরমপন্থি বা সন্ত্রাসী হয়, তাহলে তার জন্য মুসলিম কমিউনিটি বা ইসলামকে দায়ী করা কোনোভাবেই ঠিক নয়।' মিস্টার ম্যালকম হোয়েনলিয়েন আমার এই বক্তব্য সম্পর্কেও কিছু বললেন না এবং তিনি তার এ কথা থেকেও সরলেন না যে, দুনিয়া জুড়ে মুসলমানরাই সন্ত্রাস করছে।

অন্য কোনো বিষয়ের আলোচনায় তাকে আগ্রহী আমরা দেখলাম না। আমাদের মূল যে আলোচ্য বিষয়, সে আলোচনায় যাওয়াই সম্ভব হলো না। ইতিমধ্যে আমাদের সময়ও শেষ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি আমাদের চা অফার করেছিলেন। আমরা চা খেয়ে বিদায় হলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। গোটা সফরে আজই প্রথম আলোচনায় আমরা দু'পক্ষের কেউ যেন সন্তুষ্ট হতে পারলাম না।

আমাদের সফরের শেষ প্রোগ্রামটা ছিল নিউইয়র্কের 'National Council of the Churches of Christ in the USA' এর সাথে। নিউইয়র্কের রিভার সাইড ড্রাইভে তার অফিস। সুন্দর জায়গা। আমরা যখন তার অফিসের লোকেশনে পৌঁছলাম, সাক্ষাতের সময় তখনও হয়নি। আশপাশটা ঘুরে দেখতে লাগলাম। সে অফিস থেকে একটু দূরেই শুকনো খালের মতো একটা অগভীর নালা, সম্ভবত নদীর দিক থেকে ওঠে এসে সামনের দিকে চলে গেছে। বৃষ্টির সময় পানি নিষ্কাশনের একটা প্রাকৃতিক ব্যবস্থা এটা হতে পারে। প্রাকৃতিক বললাম এ কারণে যে, খাল জাতীয় এই নালাটা জঙ্গলাকীর্ণ। খালে এবং খালের দু'পাশে কখনো মানুষের হাত পড়েছে বলে মনে হলো না। কিছু গাছ মরে আছে। দু'একটা মরা গাছ ভেঙ্গে পড়ে আছে মাটিতে। ওগুলো পচে যাচ্ছে, গভীর নির্জন

www.pathagar.com

বনে যা ঘটে থাকে। শহরের বুকের মাঝে এমনটা কেন জানতে চাইলে আমাদের ইস্কর্ট ইরউইন কার্ন বললেন, শহরের মাঝে এটা একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। শহরের মানুষের তৈরি সুন্দর বিল্ডিং ও রাস্তা-ঘাটের পাশে এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রক্ষা করা হয়। মানুষের জন্যে এটা প্রয়োজন। আসলেই মার্কিনীরা খুবই ঐতিহ্য ও প্রকৃতিপ্রেমী। ওরা পারতপক্ষে প্রকৃতির সাজানো গায়ে হাত দেয় না এবং যা কিছু পুরাকীর্তি এবং ঐতিহ্য হিসাবে প্রাচীন, তাকে তারা সংরক্ষণ করে।

প্রোগ্রামের সময় হয়ে গেলে আমরা Council of the Churches অফিসে ফিরে এলাম। অফিসে ঢুকতেই আমাদের স্বাগত জানালেন অফিসের কয়েকজন। তারা বললেন মিস্টার ব্রেনার আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। তারা আমাদেরকে মিস্টার বার্ট এফ ব্রেনারের কাছে পৌঁছে দিল। মিস্টার ব্রেনার তার চেয়ার থেকে ওঠে এসে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন। তিনি বিশাল প্রতিষ্ঠান 'National Council of the Churches of Christ in the USA'-এর কো-ডাইরেক্টর। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন, আন্তঃধর্ম সম্পর্কের উন্নয়নে তারা বেশি আগ্রহী। শান্তি, সমঝোতা, ও সহাবস্থানের জন্যে আন্তঃধর্ম সম্পর্কের উন্নয়ন খুব বেশি জরুরী। তিনি আলোচনার শুরুতেই আমাদেরকে জানালেন যে, মুসলমানরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ কমিউনিটি। অতএব মুসলমানদের সাথে তারা সবচেয়ে ভালো সম্পর্ক আশা করে। তারপর এই সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা চললো। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি কিছুটা ক্ষোভের সাথে বললেন, 'মুসলমানরা যেভাবে পশ্চিমাদেরকে শত্রু ভাবছে এবং যুদ্ধ ঘোষণা করছে, তাতে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতির চেষ্টা সামনে এগোনো কঠিন'। তিনি এই সাথে এটাও বললেন যে, 'সন্দেহ নেই ভুল বোঝাবুঝি এর একটা বড় কারণ। এটা দূর করার চেষ্টা আমরা করেছি।' আমি মিস্টার ব্রেনারের জবাবে বললাম, 'যুদ্ধ শব্দের ব্যবহার বোধহয় ঠিক নয়। আর শত্রু শব্দের বদলে ভয়, অবিশ্বাস, বিক্ষুব্ধ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাই মনে হয় সঙ্গত হতো। আমি আমার এই কথাকে আরো খোলসা করতে গিয়ে বললাম, পশ্চিমকে ভয় করার, পশ্চিমকে অবিশ্বাস করার এবং পশ্চিমের ওপর বিক্ষুব্ধ হবার মুসলমানদের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো আজকের পাশ্চাত্য বিশেষ করে ইউরোপের শক্তিগুলো এশিয়া আফ্রিকার অন্যান্য দেশসহ মুসলিম দেশগুলোকে শাসন করেছে, কোথাও কোথাও দেড়শ' বছর, দুইশ' বছর পর্যন্ত। দীর্ঘ এই শাসনকালে মুসলমানদের সাথে তাদের শাসক শাসিতের সম্পর্ক ছিল। এই সময় যুদ্ধ, শোষণ, নিপীড়নের মতো সব ধরনের ঘটনা ঘটেছে দীর্ঘদিন ধরে। এই সব কাহিনীতে ভর্তি তাদের ইতিহাস। সুতরাং পশ্চিমের প্রতি তাদের বহমান একটা

www.pathagar.com

ক্ষোভ থাকা খুবই স্বাভাবিক। তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় চলমান এমন কোনো ঘটনা তাদের এই ক্ষোভকে আরো উসকে দেয়। দ্বিতীয় কারণ হলো মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বেশকিছু ঘটনা নিয়ে পশ্চিমের সাথে মুসলমানদের ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে। যেমন ফিলিস্তিন ও কাশ্মীর সমস্যা। দুইটি সমস্যাই প্রায় অর্ধশত বছরের পুরানো। এই দুই ক্ষেত্রে ঐ দুই স্থানের মুসলিম বাসিন্দারা অবিচারের শিকার। ফিলিস্তিনে প্রথমত মুসলমানদের উচ্ছেদ করে ইহুদি রাষ্ট্র ইসরাইলের পত্তন করা হয়েছে। তার ওপর ১৯৬৭ সালে আরো কিছু ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড ইসরাইল দখল করেছে। অনুরূপভাবে কাশ্মীরের মুসলমানরাও অবিচারের শিকার। ভারত বিভাগের নীতি অনুসারে কাশ্মীরের জনগণ নিজেদের দেশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার একমাত্র অধিকারী। এই নীতি ভঙ্গ করে এবং জাতিসংঘের প্রস্তাব লংঘন করে তাদের স্বাধীনতার দাবিকে দমিয়ে রাখা হয়েছে। এই ব্যাপারে পশ্চিমা শক্তিগুলো মুসলমানদের ন্যায্য দাবি আদায়ের ব্যাপারে যা করতে পারতো তা করেনি। মুসলমানদের চোখের সামনে পূর্বতিমুর ও দক্ষিণ সুদানের খৃস্টানরা স্বাধীন হয়ে গেল। অথচ কাশ্মীর ও ফিলিস্তিন ইস্যু ঝুলে আছে অর্ধশত বছর ধরে। এ ধরনের কিছু সমস্যা নিয়ে পশ্চিমের ওপর ক্ষোভ আছে মুসলমানদের। তৃতীয় আরো একটি কারণ আছে সেটা হলো মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা এনজিওদের সন্দেহজনক ভূমিকা। এসব এনজিওদের ভূমিকা অনেকক্ষেত্রে নিঃস্বার্থ নয়। তারা কোনো একটি বিশেষ ধর্ম বা কোনো বিশেষ লক্ষ নিয়ে কাজ করে। মুসলিম দেশগুলোর অনেক আঞ্চলিক, দেশ ও জাতিগত সমস্যার ক্ষেত্রে তারা পক্ষপাতিত্বপূর্ণ আচরণ করে। তাদের ওপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভ পশ্চিমাদের ওপর গিয়ে বর্তায়। এসব নানা কারণেই পশ্চিমাদের ব্যাপারে সাধারণভাবে একটা নেতিবাচক ধারণা মুসলমানদের রয়েছে। তবে আমি মিস্টার ব্রেনারকে জানালাম যে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটছে। যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে এবং শিক্ষার প্রসার ঘটার মধ্য দিয়ে পশ্চিমাদের সাথে মুসলমানদের জানাজানি বাড়ছে এবং অনেক ভুল বুঝাবুঝিও দূর হচ্ছে। পশ্চিমের প্রতি মুসলমানদের ভয় ও অবিশ্বাস ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। পশ্চিমেরও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ভূমিকা জনগণমুখী হয়ে ওঠছে। মিস্টার ব্রেনার আমার কথাগুলো মনযোগ দিয়ে শুনলেন। আমাকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বললেন, এশিয়া আফ্রিকার কলোনিগুলোর ওপর পশ্চিমা শক্তিগুলো যে অবিচার করেছে এবং মুসলিম স্বার্থের ক্ষেত্রে যে অবিচারগুলো হচ্ছে তার জন্য দায়ী পশ্চিমী জনগণ নয়, দায়ী এক শ্রেণীর সরকার। এটা মুসলমানদের বুঝতে হবে। এরপর তিনি এশিয়া-আফ্রিকার জনগণের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার কথা বললেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো

www.pathagar.com

কলোনি শাসনের জন্য দায়ী নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাধ্যমত জনগণের স্বার্থে কাজ করে। মিস্টার ব্রেনারের সাথে আমাদের আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়েছে। এতটা সময় দেয়ার জন্য আমরা তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে এলাম।

আগেই বলেছি নিউইয়র্ক আমাদের সফরের শেষ শহর। এই নিউইয়র্ক থেকে আমরা বাড়ি ফিরবো। বাংলাদেশীরা ঘরমুখো বলে বদনাম আছে। এটা খুব অমূলক বোধহয় নয়। আমরা নিউইয়র্কে আসার পর সব প্রোগ্রামই আমাদের কাছে গৌণ হয়ে গেল, মুখ্য হয়ে ওঠলো আমরা বাড়ি ফিরছি। সুতরাং নিউইয়র্কের সময়টা তাড়াতাড়ি কাটুক এটাই চাচ্ছিলাম। সুতরাং নিউইয়র্ক ঘুরে দেখার ব্যাপারটা তাই আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠলো না। তবুও দর্শনীয় কিছু জায়গায় আমরা গিয়েছি। বিশ্ব বিখ্যাত সংবাদ মাধ্যম এপি'র হেড কোয়ার্টার সাংবাদিক হিসাবে আমার কাছে খুবই আকর্ষণের বিষয় ছিল। এপি'র হেডকোয়ার্টার দেখতে গিয়েছিলাম আমি। দেখলাম এপি'র হেডকোয়ার্টার। ফটোও নিলাম সেখানে। এরপরে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিল স্ট্যাচু অব লিবার্টি এবং সমুদ্রতীরে প্রাচীন আমলের দুর্গটা। স্ট্যাচু অব লিবার্টিতে আমি যাইনি। দুর্গে দাঁড়িয়ে নদীর ওপারে দাঁড়ানো স্ট্যাচু অব লিবার্টিকে দেখেছি। স্ট্যাচু অব লিবার্টির পাশে একটা পুরনো স্থাপনা দেখলাম। শুনলাম ইউরোপ থেকে নিউইয়র্কে আশা ইমিগ্রান্টরা প্রথমে ওখানেই ওঠতো। ১৮৯২ থেকে ১৯২৪ পর্যন্ত যে লক্ষ লক্ষ ইমিগ্রান্ট নিউইয়র্কে এসেছে তাদের প্রথমে এলিস দ্বীপের এই স্থাপনায় রেখে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সেরে দেশের ভিতরে নেয়া হয়েছে। এখানকার লাইব্রেরি ও মিউজিয়ামে নানাভাবে তাদের স্মৃতি ধরে রাখা হয়েছে। জাদুঘরের 'ওয়ার্ড অব ওনার' এ সারি সারি পিতলের প্লেটে ইমিগ্র্যান্টদের নাম খোদাই করে রাখা হয়েছে। এক ওয়ালেই দুই লক্ষ নাম দেখা যাবে। প্রাচীন দুর্গটি দেখতে আমার খুব ভালো লেগেছে। এখানে আত্মরক্ষা আক্রমণের ব্যবস্থা দেখতে গিয়ে আমি যেন অতীতের, ফিরে গিয়েছিলাম। তখনকার যুদ্ধ এখনকার যুদ্ধের মধ্যে কত পার্থক্য! জাতিসংঘের সদর দফতরও দেখতে গিয়েছিলাম। এছাড়া ব্যক্তিগত প্রোগ্রাম হিসাবে নিউইয়র্কের অনেক জায়গায় আমি গিয়েছি বাংলাদেশীদের আমন্ত্রণে। বাঙালীদের নিয়ে কয়েকটা প্রোগ্রামও করেছি। এর মধ্য দিয়ে দেশে ফিরে আসার দিনটি আমার এসে গেল। আসার আগের মুহূর্তে ওয়াশিংটনে আমাদের হোস্টের সাথে টেলিফোনে কথা বললাম। সুন্দর সফরের ব্যবস্থা করার জন্যে তাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, যে বিষয় নিয়ে আমাদের সফর ছিল সে বিষয়ে আমরা অনেক জেনেছি। এটা আমাদের জন্য বড় আনন্দের বিষয়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

৯

সময়টা ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর। একদিন ঢাকাস্থ ইউনাইটেড স্টেট ইনফরমেশন্স এজেন্সি থেকে মিস্টার আলীর একটা টেলিফোন পেলাম। তিনি জানতে চাইলেন বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন সিনিয়োর সম্পাদক আমেরিকা যাচ্ছেন, আপনি যেতে আগ্রহী কি না। আমি বললাম যে, সফরের এজেন্ডা কি হবে। তিনি জানালেন, বিভিন্ন ইস্যু এবং নাইন এলেভেনের পর আমেরিকার মুসলমানরা কেমন আছে, ইত্যাদি ব্যাপারে জানাজানিই প্রধান বিষয় হবে। আমি বললাম খুবই আকর্ষণীয় বিষয়, আমি যেতে পারলে খুশি হবো। এর কয়েকদিন পরে আমি ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের একটি চিঠি পেলাম। রাষ্ট্রদূত এক্সসেলেন্সি হেরি কে টমাস মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অতিথি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের আমন্ত্রণ জানালেন। অক্টোবরের ১৩ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত সিনিয়ার সম্পাদকদের একটি গ্রুপ ওয়াশিংটন ডিসি, ডিয়ার বর্ন, মিসিগান এবং নিউইয়র্ক সিটি সফর করবেন। তিনি লেখেন, "Should you accept, you will travel as a guest of the U.S. State Department."

দাওয়াত আগেই অ্যাকসেপ্ট করে বসে আছি। সে কথাই আমি তাকে Acceptance letter-এর মাধ্যমে জানালাম। সহযোগী সম্পাদকদের সাথে এই সফর আমাকে সত্যিই খুব আনন্দিত করেছিল। সবার জন্যই আনন্দের হয়েছিল। সম্পাদকদের মধ্যে ছিলেন দৈনিক সংবাদের বজলুর রহমান, জনকণ্ঠের সম্পাদক আতিকুল্লাহ মাসুদ, নিউজ টুডের সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন আহমদ, সমকাল সম্পাদক গোলাম সরোয়ার, ফাইনানশিয়াল এক্সপ্রেসের সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন, সিনিয়ার সাংবাদিক হাসান শাহরিয়ার, ঢাকাস্থ ইউনাইটেড স্টেট ইনফরমেশন্স এজেন্সির মিস্টার আলী এবং আমি। রাজনৈতিক দিক দিয়ে আমরা সবাই একমতের নই। কিন্তু এটাই আমাদের জন্য আনন্দের একটা বড় উপকরণ হয়েছে। সহযোগী সম্পাদকরা দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদক হিসেবে

www.pathagar.com

আমাকে এবং জনকণ্ঠের সম্পাদক হিসেবে আতিকুল্লা মাসুদকে রাজনৈতিক মতের দিক দিয়ে দুই বিপরীত মেরুর ধরে নেয়ায় আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনের মজার প্রয়াস ছিল গোটা সফর জুড়ে। খাওয়ার সময় একসাথে বসানো, ফটো তোলার সময় ধরে নিয়ে একসাথে দাঁড় করানো ইত্যাদি বিষয় ছিল হাসি আনন্দের। সত্যি মতামত নির্বিশেষে আমরা সকলে সফরের সময় এক হয়ে গিয়েছিলাম। আমাদের একে অপরের মধ্যকার অনেক ভুল বুঝাবুঝিও দূর হয়েছিল। বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সমঝোতা সৃষ্টি করা যায় এবং এক সাথে পথও চলা যায় এই সফরে আমরা সেটা দেখেছিলাম।

একদিন আলোচনার এক পর্যায়ে আতিকুল্লাহ মাসুদ সাহেব আমাকে বলেছিলেন, জনকণ্ঠও আপনাদের বিরুদ্ধে লেখবে না সংগ্রাম থেকেও আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে লিখবেন না। যদিও জনকণ্ঠ পরে সংগ্রামের বিরুদ্ধে না লিখলেও সংগ্রামের যে আদর্শ তার বিরুদ্ধে লিখেছে। তবুও বলা যায় সমঝোতা একটা অগ্রগতি। ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই সমঝোতা আজ খুব বেশি প্রয়োজন। আমাদের দেশে অশান্তির সিংহ ভাগই চলে যাবে যদি সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১ অক্টোবর তারিখে Emirates Airlines এ আমরা সাত জন আমেরিকায় যাত্রা করলাম। দুবাইয়ে আমাদের যাত্রা বিরতি ছিল। পরদিন ১২ তারিখ সকাল পোনে আট'টায় দুবাই থেকে আমাদের লন্ডন যাত্রা। স্থানীয় সময় বার'টা পনর মিনিটে লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে পৌঁছে ঐদিনই বিকেল চার'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে আমরা আমেরিকা যাত্রা করলাম ইউনাইটেড এয়ারলাইন্সে। ১২ তারিখেই সন্ধ্যা পোনে আট'টায় আমরা ওয়াশিংটনের ডালাস বিমান বন্দরে নামলাম।

১৩ অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বাস দিবস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ ছুটির দিন এটা। আমাদেরও এইদিন কোনো কর্মসূচি ছিল না। আমরা এইদিন ইচ্ছেমতো ঘুরেফিরে ওয়াশিংটন শহরটাকে দেখলাম। পরদিন ১৪ অক্টোবর ওয়াশিংটনে আমাদের সফর প্রোগ্রাম শুরু হলো। ওয়াশিংটনে আমাদের দুই দিনের প্রোগ্রাম ছিল, ১৪ এবং ১৫ অক্টোবর। এই দুই দিনে অন্যান্য প্রোগ্রামের সাথে আমরা স্টেট ডিপার্টমেন্টে গিয়েছি, বৈদেশিক প্রেস সেন্টার এবং হোয়াইট হাউসের প্রোগ্রামেও গিয়েছি। স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রোগ্রাম অফিসার আলজিস

www.pathagar.com

সাইলাস এবং ব্যুরো অব ইস্ট এশিয়ান এবং প্যাসিফিক এ্যাফেয়ারস এর পাবলিক এ্যাফেয়ারস এডভাইজার কেনেথ বেল এর সাথে দেখা হয়েছে। আমরা তার সাথে মিডলইস্ট, বিশেষ করে ফিলিস্তিন এবং বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনা করেছি। বেশি সময় গেছে ফিলিস্তিন বিষয়ে আলোচনায়। সমাধান কোন পথে এটাই ছিল আলোচনার বিষয়। আমি সমাধানের জন্যে ইসরাইলকে ১৯৬৭-পূর্ব সীমানায় ফিরে যাবার কথা বলেছিলাম। এরপর আরেকটি প্রোগ্রামে এজেন্সি ফর ইনটারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট-এর ফরেন সার্ভিস অফিসার এডলফ ওয়াই উইলবার্ন এর সাথে আমরা প্রোগ্রাম করেছি। সেখানেও অন্যান্য বিষয়ের সাথে ফিলিস্তিন ইস্যুও ওঠেছিল। সেখানেও আমি সমস্যা সমাধানের জন্য আমার মতটা বলেছিলাম। তিনি একমত হননি। বলেছিলেন, এই সমস্যার এমন সহজ সমাধান নেই। হোয়াইট হাউজে আমাদের জন্য প্রোগ্রাম রাখা হয়েছিল। সেখানে হোয়াইট হাউজ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ডাইরেক্টর ফর কমিউনিকেশন ফর মিডিয়া রিলেশনস-এর মিস্টার কলবি জে কুপার এবং হোয়াইট হাউজ ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের ডাইরেক্টর ফর সাউথ এশিয়া-এর এলিজাবেথ ওয়াই মাইলার্ড এর সাথে কথা হয়েছিল। এখানে কিছু তথ্যের আদান-প্রদানসহ সৌজন্যমূলক আলোচনাই বেশি হয়। ওয়াশিংটনে আমাদের একটি সাইটসিং প্রোগ্রাম ছিল। সেই প্রোগ্রামে আমরা পার্লামেন্ট অব ক্যাপিটাল হিল, জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিংকন, টমাস জেফারসন, ভিয়েতনাম মেমোরিয়ালসহ অনেকগুলো ঐতিহাসিক স্থান আমরা দেখলাম।

এই সাইটসিংয়ে যাবার পথে অথবা আসার পথে হোয়াইট হাউজের পার্শ্ববর্তী রাস্তায় (হোয়াইট হাউজের কোন্ দিকে এবং রাস্তাটির কি নাম তা মনে নেই) প্রতিবাদী কিছু প্লাকার্ডসহ কয়েকজনকে আমরা দেখেছিলাম। রাস্তাসংলগ্ন চত্বরে তাদের তাঁবুও ছিল। এই তাবুতে তারা বাস করে এই প্রতিবাদী প্রোগ্রাম চালিয়ে যায়। প্লাকার্ডে কিছু মার্কিন বিরোধী শ্লোগান, কিছু দাবিদাওয়া ছিল। প্রতিবাদীদের মধ্যে একজন বৃদ্ধাকে আমি দেখেছিলাম। বয়স নব্বইয়ের বেশি হবে। তার মুখ এবং গায়ের চামড়া কুঞ্চিত। সে প্লাকার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অনেকটা হিসপানিক চেহারা। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন দেশের নাগরিক। তিনি বললেন, আমি বিশ্ব নাগরিক। আমি বললাম, কোনো দেশের

www.pathagar.com

নাগরিক হওয়ার পরেই তো আপনি বিশ্ব নাগরিক হয়েছেন সে দেশ কোনটি। তিনি কথাটা এড়িয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে মনোযোগ দিলেন। আমি এই লুকোচুরিটা বুঝলাম না এবং তার ফলে তাদের প্রতিবাদটাও আমার কাছে অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়লো। দেখলাম পুলিশ এদিকে খেয়াল করে না। ওয়াশিংটনে সরকারি প্রোগ্রামের পাশে আমার জন্য আর একটা আনন্দের ঘটনা ঘটলো। আমার মেয়ে এবং জামাই থাকে মেরিল্যান্ডে। জামাই জাপানে পিএইচডি করার পর জন হপকিংস বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশিপ নিয়ে পোস্ট-ডক্টরাল করেছে।

ওয়াশিংটন অবস্থানের দ্বিতীয় দিনে তিন নাতিসহ মেয়ে ও জামাই আমার হোটেল রুমে এলো। অনেকদিন পর দেখা। ছোট নাতির বয়স তিন বছর। তাকে এই প্রথম দেখলাম। এই সাক্ষাৎ ছিল আমাদের সবার জন্য দারুণ আনন্দের। গল্প গুজবে নাতিদের আনন্দঘন ছুটাছুটিতে অনেকটা সময় কিভাবে কেটে গেলো বুঝাই গেল না। অবশেষে তারা বিদায় নিল। হঠাৎ আলো নিভে গেলে যেমনটি হয় আমার তেমনি হয়েছিল, যতটা আনন্দিত হয়েছিলাম ততটাই নিরানন্দ এসে আমাকে ঘিরে ধরলো। পরে আমাকে আমার মেয়ে টেলিফোন করে জানিয়েছিল হোটেল রুমকে আমার ছোট নাতি আমার বাড়ি বলে মনে করেছিল এবং নানার বাড়ি দেখে খুব খুশি হয়েছিল। আমি বলেছিলাম ওর আনন্দ তোমরা নষ্ট করো না।

১৬ তারিখে আমরা ডেয়ারবর্নে যাত্রা করলাম। ডেয়ারবর্ন মিসিগানের একটি শহর। ডেয়ারবর্ন ছাড়াও আমরা মিসিগানের ডেট্রয়েট এবং ফোর্ডসিটি সফর করেছি। এই তিন শহর মিলে আমরা ১৬ থেকে ২১ তারিখ পর্যন্ত মিসিগানে ছিলাম। আমার মনে হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশি আরব মুসলমানের বাস এই ডেয়ারবর্নে। ডেয়ারবর্নে অন্যান্য দেশের মুসলমানও প্রচুর বাস করে। বাংলাদেশী মুসলমানদের সংখ্যাও সেখানে কম না। 'বাংলা আমার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা ডেয়ারবর্ন থেকে বের হয়ে থাকে। এই মাসিক এর সম্পাদক আবু সাঈদ মাহফুজের সাথেও আমাদের দেখা হয়েছে। ডেয়ারবর্নের ইউনিভার্সিটি অব মিসিগানে আমরা গিয়েছিলাম। বিশ্বদ্যিালয়ের সেন্টার ফর এ্যারাব আমেরিকান স্ট্যাডিজের অধ্যাপক রোলান্ড স্টকটন এর সাথে আমরা কথা বলেছিলাম। তার নেমকার্ডে সুন্দর একটা আরবি ক্যালিওগ্রাফি আছে। ডেয়ারবর্নের মেয়র মাইকেল

www.pathagar.com

এ গিডোর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল। মুসলমানদের অবস্থাসহ অনেক বিষয় নিয়ে তার সাথে কথা হয়। খুবই দিলখোলা লোক তিনি। তার ডেয়ারবর্ন শহরে বিপুল সংখ্যক মুসলমানের অধিবাস নিয়ে তিনি গর্ব করেন। সবচেয়ে বেশি আমাদের কথা হয়েছে আরব মুসলমানদের সাথে। ডেয়ারবর্নে আমেরিকান এ্যারাব চেম্বার অব কমার্স নামে একটি ব্যবসায়িকদের সংস্থা আছে। নাছের এম বেইদুন এই সংস্থার ডাইরেক্টর। আমরা তার অফিসে গিয়েছিলাম। শুধু ডেয়ারবর্নের মুসলমান নয়, গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমানদের সম্পর্কে তার কাছে অনেক কথা শুনেছি। তিনি আশার কথাই বলেছিলেন। তিনি আমাদেরকে দাওয়াত করেছিলেন ডেয়ারবর্নে আরব মুসলমানদের বার্ষিক ভোজসভায়। ভোজ সভা হলেও আসলে তা ছিল একটি রাজনৈতিক সভা। এখানে ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকান উভয় দলের নেতারা বক্তৃতা করেছিলেন। সম্পাদকদের সবাই আমরা আমন্ত্রিত। অনুষ্ঠানের পুরো সময় আমরা সেখানে ছিলাম।

ডেয়ারবর্নের পর আমরা মিসিগানের ফোর্ডসিটিতে গিয়েছিলাম। এটা অনেকটা ছিল আমাদের শিক্ষা ট্যুরের মতো। গাড়ি তৈরির ফোর্ড কোম্পানীর অফিস, কারখানা একটা সিটিতে পরিণত হয়েছে। ট্রেনে আমরা ঘুরেছিলাম ফোর্ডসিটিতে। জায়গা ছিল খোলামেলা। দারুণ শীত সেদিন। আমাদের সাথে যা কাপড় ছিল তাতে কুলোচ্ছিল না। একটা কোম্পানীর কারখানা অফিস যে এতো বড় বিশাল হয় আমরা দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। আরো ভালো লাগত যদি শীতটা না থাকতো। সবচেয়ে আমাদের ভালো লেগেছিল ফোর্ড গাড়ি কোম্পানীর যাদুঘরটা। সেখানে গাড়ি কোম্পানীর ইতিহাস ধরে রাখা হয়েছে। প্রথম যে গাড়িখানা তৈরি করেছিল সেখান থেকে বর্তমান পর্যন্ত গোটা ক্রমবিকাশকে যাদুঘরে ধরে রাখা হয়েছে। আমরা ঘুরে ঘুরে ধারাবাহিকতার অংশ সবগুলো গাড়ি দেখলাম। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিভাবে বর্তমান অবস্থায় এসেছে বিশেষ করে অটোমোবাইলের ক্ষেত্রে, তা দেখার এক অপূর্ণ স্থান এই অটোমোবাইল যাদুঘর। অনেকটা সময় আমাদের লেগেছিল ফোর্ডসিটি দেখতে। সময়টা আমাদের কাজে লেগেছিল।

মিসিগানে আমাদের তৃতীয় ডেসটিনেশন ছিল ডেট্রয়েট সিটি। আমরা ফোর্ডসিটি থেকে প্লেনে ডেট্রয়েটে গিয়েছিলাম। ডেট্রয়েট বিমানবন্দরে আমাদের স্বাগত

www.pathagar.com

জানিয়েছিলেন ইউ এস ইনফরমেশন এজেন্সির ডেট্রয়েট শাখার কর্মকর্তারা ছাড়াও আমাদের বাংলাদেশী অনেক ভাইয়েরা। বিশেষ করে মনে পড়ছে সাহেদুল হকের কথা। তিনি জালালাবাদ সোসাইটি অব মিসিগানের প্রেসিডেন্ট এবং সাপ্তাহিক ঠিকানার মিসিগান ব্যুরো চিফ। ডেট্রয়েট সফরকালে তিনি এবং অন্যান্য বাংলাদেশী ভাইয়েরা আমাদের অনেক সহযোগিতা করেছেন এবং দাওয়াত খাইয়েছেন। ডেট্রয়েটে আমরা তাদেরকে খুব বেশি সময় দিতে পারিনি। এর মধ্যেও আমরা বেশ কয়েকটি প্রোগ্রাম করেছি। তার মধ্যে একটি ছিল 'ডেট্রয়েট ফ্রি প্রেস' এর পিটার গ্যাব্রিলোভিসের সাথে সাক্ষাৎ। আমাকে সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ডেট্রয়েট এবং কানাডার সংযোগস্থানটিকে। মিসিগানের তিন দিকে লেক, উত্তরে লেক হুরণ এবং পূর্বে লেক এ্যনি। লেক হুরণ এবং লেক এ্যনিকে সংযুক্ত করেছে আরেকটি ছোট নদী। সে নদীর দুরত্বের মাঝখানে আরেকটি ছোট্ট লেক। এই লেক এবং লেক এ্যনিকে সংযুক্তকারী ছোট নদীর তীরেই ডেট্রয়েট। সে নদীর তীর ধরে আমরা হেঁটেছি। পর্যটকদের জন্য এটা একটা লোভনীয় জায়গা বটে। এই সুন্দর জায়গা না দেখলে ডেট্রয়েট দেখা হয় না।

২২ অক্টোবর আমরা ডেট্রয়েট থেকে নিউইয়র্কে এলাম। ২৩ ও ২৪ তারিখ– এ দু'দিন আমরা নিউইয়র্কে ছিলাম। ২৫ তারিখ ছিল আমাদের বাড়ি ফেরার দিন। নিউইয়র্ক সফরে আমাদের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল জাতিসংঘ সদর দফতরের প্রোগ্রাম। তখন জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের সময় নয়। আমরা একটা কমিটি মিটিংএ দর্শক গ্যালারিতে বসে মিটিং এর প্রোসিডিং প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আমরা জাতিসংঘ সদর দফতরেই জাতিসংঘে মার্কিন মিশনের সিনিয়ার এ্যাডভাইজার অব সাউথ এশিয়া মিঃ এরিখ ডি টুনিস এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। সম্ভবত সেখানেই বাংলাদেশ ককাসের কয়েকজন সাবেক ও বর্তমান সিনেটর ও কংগ্রেস ম্যানের সাথে দেখা হয়েছিল। সেখানে বাংলাদেশের রাজনীতি ছাড়াও সাউথ এশিয়া মধ্যপ্রাচ্যসহ বেশ কয়েকটি বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। খুশি হয়েছিলাম যে বাংলাদেশ বিষয়ে তারা অনেক কিছু জানেন। বিদায়ের আগে আমরা জাতিসংঘের এক ক্যাফেটরিয়াতে বসে সবাই নাস্তা করলাম। নিউইয়র্কে আমাদের স্মরণীয় একটি সফর ছিল জিরোগ্রাউন্ডে। জিরোগ্রাউন্ড ধ্বংস হয়ে যাওয়া টুইন টাওয়ারের স্থান। টুইনটাওয়ারের স্থানটায় তখন পুকুরের মতো গভীর

www.pathagar.com

গর্ত। সেখানে ভবিষ্যৎ টাওয়ারের ফাউন্ডেশন গড়ে তোলা হচ্ছে। আশেপাশের কয়েকটা বিল্ডিং সেই ধ্বংসলীলার সাক্ষ্য বহন করছে। পাশের কয়েকটা টাওয়ারের দেয়াল পুড়ে যাওয়ার দৃশ্য আমরা দেখলাম। সামনেই আটলান্টিক থেকে উঠে আসা নদী। সেখানে খুব বাতাস সেদিন। এতোদিন মাথার জন্য উলের টুপি ব্যবহার করিনি। কিন্তু সেদিন সেখানে গিয়ে একটা উলের টুপি কিনতে হলো।

নিউইয়র্কে দু'দিন আমাদের ব্যস্ত সময় কেটেছে। দেশীয়দের সাথে দেখা সাক্ষাৎ গেট টুগেদার ইত্যাদির মধ্যদিয়ে। নিউইয়র্কের বাংলাদেশী অধ্যুষিত কয়েক জায়গায় আমরা গিয়েছি। তার মধ্যে জ্যামাইকা একটি। ম্যানহাটন থেকে জ্যামাইকা গিয়েছিলাম ট্রেনে। স্টেশনে গিয়ে জনসমুদ্র দেখে আমার চক্ষু চড়কগাছ। অফিস ছুটির সময় এতো ভিড় হয়, ধারণা ছিল না আমার। এতো লোক কি করে ট্রেনে ওঠবে, আমরাই বা কি করে যাবো। আমার সাথী জ্যামাইকার একজন বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। মিনিট দশকও গেলো না। এর মধ্যে স্টেশন খালি। এতো ট্রেন এবং ক্রিস-ক্রস এতো লাইন যে দশ মিনিটের মধ্যে স্টেশন ফাঁকা। জ্যামাইকায় আমাদের গেট টুগেদারে ঠিক সময়ে আমরা পৌঁছলাম। নিউইয়র্কে আমাদের দেশী কিছু সাংবাদিক ভাইয়ের সাথেও দেখা হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন উইকলি 'বাংলা পত্রিকার' নির্বাহী সম্পাদক আবু তাহের, উইকলি 'এখন সময়' এর সম্পাদক কাজী সামছুল হক, উইকলি 'দর্পণ' এর সম্পাদক মুহাম্মদ ফজলুর রহমান এবং ইন্টারন্যাশনাল মাস্থলি 'মেসেজ' এর এডিটার ইন চিফ মাহবুবুর রহমান। মেসেজ অফিসে দীর্ঘক্ষণ ছিলাম। দিনটা ছিল ২৪ অক্টোবর শুক্রবার। মেসেজ অফিস সংলগ্ন মসজিদে নামায পড়েছিলাম এবং দুপুরে লাঞ্চও করেছিলাম। মেসেজ অফিসে মাহবুবুর রহমানের সাথে টুইনটাওয়ারের ঘটনা পরবর্তী ঘটনাবলী, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেক আলাপ হয়েছিল। তার কাছে শুনেছিলাম টুইনটাওয়ার ঘটনার পরবর্তী মুসলিম ও ইসলাম বিরোধী অপপ্রচার মার্কিনীদের মধ্যে ইসলামের ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। ইসলামী বইয়ের বিক্রয় আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ছে ওয়াশিংটন থাকাকালে আমি ভার্জিনিয়ায় ইন্টারন্যাশনাল ইনিস্টিউট অব ইসলামিক থট (আই আই আই টি) অফিসে

www.pathagar.com

গিয়েছিলাম। সেখানে দেখা হয়েছিল আই আই আই টি'র ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. আহমদ তুতুনজির সাথে। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত, কয়েকবার ঢাকা এসেছেন। টুইনটাওয়ার পবরবর্তী ঘটনা নিয়ে তার সাথে অনেক আলাপ হয়েছিলো। তিনিও বলেছিলেন, ইসলামের ব্যাপারে মার্কিন জনগণের আগ্রহ বেড়েছে এবং সেই কারণে ইসলাম গ্রহণের সংখ্যাও আগের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাস করেছিলেন মুসলিম ও ইসলাম বিরোধী যে প্রোপাগান্ডা বিশ্বব্যাপী চালানো হচ্ছে তার আলটিমেট রেজাল্ট কি হবে। আমি বলেছিলাম, প্রোপাগান্ডা যেহেতু উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং মিথ্যার ওপর ভিত্তিশীল, সেহেতু এই প্রোপাগান্ডার আলটিমেট রেজাল্ট ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে যাবে। বিশ্বের সচেতন মানুষ সত্য জানার জন্য ইসলাম ও মুসলমানদের আরো কাছে আসবে। নিউইয়র্কের দু'দিন, বলা যায় তিন দিন, আমাদের হোটেলে খাওয়া হয়নি। তিন দিনে আমরা যা দাওয়াত ছিল তা শেষ করতে পারিনি। নিউইয়র্কের শেষ দাওয়াত ছিল নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল রাষ্ট্রদূত রফিক খানের বাসায়। সেটা শুধু দাওয়াতই ছিল না, বাংলাদেশীদের ছোটখাট একটা গেট টুগেদার। সেখানেই দেখা হয়েছিল আমাদের স্বনামধন্য সাংবাদিক কামালউদ্দিন সাহেবের সাথে। জানলাম তিনি পরদিন বাই রোড ওয়াশিংটনে ফিরবেন। আর পরদিন ২৫ অক্টোবর থেকে আমাদেরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রোগ্রাম শেষ। আমি আগেই পরিকল্পনা করেছিলাম প্রোগ্রাম শেষ হলে আমি ওয়াশিংটনে ফিরবো। আমার মেয়ে ও জামাই মেরিল্যান্ডে থাকে। সেখানে কয়েকদিন থাকবো, তারপর দেশে ফিরবো। আমার ইচ্ছা ছিল না নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনে প্লেনে যাওয়ার। প্লেনে গেলে আকাশ ভ্রমণ হয় দেশ ভ্রমণ হয় না। বাই রোডে যাওয়ার একটা সুযোগ আমি পেয়ে গেলাম। সাইয়েদ কামাল উদ্দিন সাহেবের সাথে পাকা কথা হয়ে গেল আমি তার গাড়িতেই যাবো। ওয়াশিংটনে যাবার পথে মেরিল্যান্ড পড়ে। যে হাইওয়ে দিয়ে নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনে যেতে হয় সেই হাইওয়ে থেকে এগজিট দিয়ে কিছুদূর গেলে মেরিল্যান্ডে আমার মেয়ে-জামাইয়ের বাসা। কামাল উদ্দিন সাহেবও আমার জামাইয়ের বাসায় যেতে সম্মত হন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১০

২০০৩ সালে আমাদের আমেরিকা সফরের একটা বড় বিষয় ছিল, নাইন-ইলেভেনের ঘটনার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে আমরা যখন মিসিগানের ডেয়ারবর্নে, তখন ভয়েস অব আমেরিকা থেকে একটা টেলিফোন পেলাম, তারা এই বিষয়টিই আমার কাছে জানতে চাইলো। তাদের একটা প্রশ্ন এই রকম যে, এর আগেও আপনি একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছিলেন তা থেকে এই সফরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করছেন কি না। খুব সংগত প্রশ্ন। আমার মনে হয়, যারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগেও সফর করেছেন এবং এখন সফর করছেন, তাদের কাছে এই পরিবর্তনের ব্যাপারটাই প্রথম বিষয় হবে। লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড এয়ার লাইন্সে উঠতে গিয়েই এই পরিবর্তন আমরা লক্ষ করেছিলাম। শুধু জুতা খুলতেই হলো না। বডি সার্চের জন্য বিশেষ স্থানে বিশেষ নিয়মে দাঁড়াতে হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটগুলোতেও যেমন, তেমনি ওয়াশিংটন থেকে মিসিগান এবং মিসিগান থেকে নিউইয়র্ক যাবার সময় অভ্যন্তরীণ ফ্লাইটেও এই ধরনের চেকিং-এর মুখোমুখি হতে হয়েছে। আগে ইন্টারন্যাল ফ্লাইটে কোনো চেকিং ছিল না। বিমান ও যাত্রীদের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই বিরক্তিকর। এ বিরক্তি এড়াবার জন্যেই নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন যাবার ইন্টারন্যাল ফ্লাইটের সুযোগ না নিয়ে আমি সড়ক পথে ওয়াশিংটন গিয়েছি। আরেকটি বিষয়, এই চেকিং-এর চাপটা নন-আমেরিকান, নন-ইউরোপিয়ানদের ওপরই বেশি। তবে সাধারণভাবে সকলকেই চেকিং এর শিকার হতে হয়। ওয়াশিংটনে একটা লাঞ্চে একজন মার্কিন কূটনীতিকের সাথে কথা হচ্ছিল আমাদের। তিনি জানালেন, তাঁকেও বার বার এ ধরনের চেকিং এর শিকার যে হতে হয়েছে শুধু তাই নয়, জওয়াবদিহিও করতে হয়েছে- কেন তিনি এতো বেশি আরব দেশ সফর করেছেন। এটা যে তার

www.pathagar.com

কূটনৈতিক দায়িত্বের অংশ, সে কথা বলার আগে তারা বুঝেনি। উল্লেখ্য, ঐ কূটনীতিকের মুখে মুসলমানদের মতো দাড়ি রয়েছে।

নাইন-ইলেভেনের পরবর্তী সময়ে এই পরিবর্তন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একমাত্র পরিবর্তন নয়। নাইন-ইলেভেনে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা উপলক্ষ করে দুনিয়ায় নানামুখী পরিবর্তনের যে ঢেউ বয়ে যায়, তার কেন্দ্রবিন্দু তো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সুতরাং সেখানে পরিবর্তন আসারই কথা। সে পরিবর্তন সেখানকার জনজীবনের নানা ক্ষেত্রে। ইতিবাচক-নেতিবাচক সব ধরনেরই। কিন্তু এতো কথা সেদিন ভয়েস অব আমেরিকাকে বলার সময় হয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দেশ। সেখানে কোনো কালাকানুন নেই। নাগরিক অধিকার কোনোভাবেই সেখানে পদদলিত হয় না অনেক দেশের মতো। এটা ছিল আমেরিকানদের গর্ব। কিন্তু নাইন-ইলেভেনের পর এই গর্বে অনেকখানি ধ্বস নেমেছে। নাইন-ইলেভেনের পর সে বছরই ২৬ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট বুশ একটা আইন পাস করেন। তার নাম 'US Patriot Act'. সে দেশের সংবিধান বিশেষজ্ঞের মতে এ আইনটি 'Eroded civil liberties'. মানে এই আইন নাগরিক স্বাধীনতাকে মুছে দিয়েছে। এই আইনে প্রশাসন সন্দেহভাজনদের দীর্ঘ সময়, এমনকি অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আটকে রাখতে পারে। কোনো অন্যায়ের সাথে জড়িত না হলেও শুধু সন্দেহ হলেই যে কোনো নাগরিকের বাড়ি-ঘর, ব্যবসায়-বাণিজ্যের স্থান ও রেকর্ডপত্র সার্চ করতে পারা যায় এই আইনের অধীনে। তিনশ' পৃষ্ঠার এই আইনে নাগরিক স্বাধীনতার অনেক কিছুই বাঁধা পড়ে। কোনো ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, সেলসশপ ১০ হাজার অথবা তার বেশি অঙ্কের ডলার মূল্যের জিনিস কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করলে তার তথ্য সরকারকে জানাতে হয়।

নাগরিক অধিকার খর্বকারী এই 'প্যাট্রিয়ট এ্যাক্ট' প্রবর্তন করা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মার্কিন জনগণের নিরাপত্তা বিধানের নামে। মার্কিন 'বিল অব রাইটস' এর পরিপন্থী এই আইন পাস না হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কি ক্ষতি হতো বলা মুশকিল, তবে এই আইন ক্ষতি করছে বিশেষ করে মার্কিন মুসলমানদের এবং অন্যান্য দেশের মুসলমানদের। নাইন-ইলেভেনের পর বিপুলসংখ্যক মার্কিন মুসলিম নাগরিককে ডিটেনশনে রাখা হয় এই আইনের অস্ত্র প্রয়োগ করে। বিনা অপরাধে বিনাবিচারে এই আটকে রাখাকে সংবিধানের ষষ্ঠ সংশোধনীর পরিপন্থী বলে অভিযোগ উত্থাপিত খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই। মার্কিন সংবিধানের এই ষষ্ঠ সংশোধনীতে বলা হয়েছে,

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'demon possessed pedophile.' Allah is not Jehovah either. Jehovah's not going to turn you into terrorists that will try to bomb people and take the lives of thousands and thousands people." 'ক্রিশ্চিয়ান ব্রডকাস্টিং নেটওয়ার্ক' তার '700 club' প্রোগ্রামে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে বলে যে, 'ভয়ংকর ও ধ্বংসকামী মুসলমানদের দ্বারা আমেরিকা আক্রান্ত'। বলা হয়: "স্বয়ং কুরআন বলেছে, যেখানেই কাফেরদের দেখ হত্যা কর।" মিশিগান ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় রক্ষণশীল ভাষ্যকার এ্যানি কোলটার মুসলমানদেরকে 'Camel riding nomad' বলে অভিহিত করেন। তিনি তাঁর 'Online column' এ লিখেন, We should invade their (Muslim) countries, kill their leaders and convert them to Christianity". ফ্রি কংগ্রেস ফাউন্ডেশন-এর সভাপতি Paul Weyrich মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডাক বিভাগকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, 'ডাক বিভাগের 'Eid Greeting' সীলে 'টুইন টাওয়ার'-এর অবয়ব উৎকীর্ণ থাকতে হবে।' কারণ তাঁর মতে "American's most notable experience about Islam was the attacks on 9-11." মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত ইভানজেলিস্ট রেভারেন্ড বিলি গ্রাহামের ছেলে ইভানজেলিস্ট ফ্রাংকলিন গ্রাহাম বার বার ইসলামকে 'Wicked,' 'Violent' হিসেবে অভিহিত করেন। টিভি চ্যানেল 'NBC-এর এক প্রোগ্রামে তিনি বলেন, "We are not attacking Islam, but Islam attacked us. The God of Islam is not the same God..... It is a different God.... I believe it is a very evil and wicked religion." অবশ্য পরে বিলি গ্রাহাম বলেন, 'It is not my calling to analyze Islam. কিন্তু মুসলমানদের পক্ষ থেকে তার ভ্রান্তি দূর করার জন্যে আলোচনার আহবান করলে তিনি আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেন। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার এভাবে চলতেই থাকে। Idaho স্টেটের 'ক্রসরোডস এ্যাসেম্বলি অব গড চার্চ্চ ' এর একটি ডিসপ্লে সাইনবোর্ড এ লেখা হয় 'The spirit of Islam is the spirit of the antichrist.' লসএঞ্জেলসের 'Simon Wiesenthal Centre Museum of Tolerance. এর ডীন রাব্বি মারভিন হায়ার টিভি চ্যানেল CNN কে বলেন, 'There are direct references in the Quran to violence.' 'টুওয়ার্ড ট্রাডিশন'-এর

www.pathagar.com

সভাপতি রাব্বি ড্যানিয়েল ল্যাপিম ঘোষণা করেন, "Conservative Christian are the natural allies of the Jewish community.... Today we are witnessing two distinct religious civilization in conflict: That of the Quran, allied with the believers in no God, violently challenging the civilization of the Bible, of Christianity and Judaism."

এ ধরনের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী বিষোদগারের দৃষ্টান্ত অজস্র। নাইন-ইলেভেনের পর টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্যে সরকারিভাবে মুসলমানদের টার্গেট করার সঙ্গে সঙ্গেই স্রোতের মতো এই বিষোদগার শুরু হয়। এই বিষোদগার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক শ্রেণীর মানুষকে মুসলমানদের বিরদ্ধে অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করে। নানা স্থানে মুসলিম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়। Council on American Islamic Relation (CAIR) এর একটা রিপোর্ট বলছে, "The 9-11 attacks were followed by a dramatic rise in anti-Muslim hate crimes. CAIR received 1717 reports of harassment, violence and other discriminatory acts in the first six months. Although violent attacks have dropped sharply, CAIR has logged more than 325 complains in the second six months period after the attacks a 30 percent increase over the same period prior to 9-11."

ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী ও এর মত নেতিবাচক পরিবর্তনের পাশাপাশি আরেকটা ইতিবাচক পরিবর্তন মার্কিন জনজীবন প্রত্যক্ষ করে। ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী হিংসাত্মক অপপ্রচারের প্রতিটির জবাব আমেরিকান মুসলমানরা দেবার চেষ্টা করেছে। তাদের পাশাপাশি আমেরিকান মুসলমানদের দুর্দিনে এগিয়ে এসেছে বিবেকসম্পন্ন অমুসলিম আমেরিকান 'Southern Baptist Convention' -এর মুসলিম ও ইসলাম বিরোধী জঘন্য অপপ্রচারের জবাবে এগিয়ে এসেছে 'American Baptists' নামের ভিন্ন একটি সংগঠন। ২০০২ সালের ১৪ জুন American Baptist Churches' এর সাধারণ সম্পাদক A.R. Medley বলেন,..... .....I am deeply saddened by remarks made by some Baptist leaders and other Christians that have maligned the Islamic faith and religion....." এর

www.pathagar.com

আগে ২০০১ সালের নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'General Board of American Baptist Churches' এর পক্ষ থেকে Anti-Islam, Anti-Muslim Anti-Arab প্রচারণার তীব্র প্রতিবাদ করে এক ঘোষণা প্রচার করা হয়। সে ঘোষণায় আমেরিকানদের প্রতি এই আহবান জানানো হয়:

"1. To persue a better understanding of Islam, Muslims and Arabs (including Arab Christians) by including in their Churches educational programs a study of Islam, of Muslim world and the Christian minorities within that world. The world and of the issues that have united and divided us by inviting Muslims and Arabs to be a part of the leadership and fellowship of such programme;
2. To encourage local and regional ecumenical and interfaith agencies to seek conversation and cooperation with Muslim religious organisations.
3. To advocate and defend the civil rights of Arabs and Muslims living in the U. S. By such means as monitoring organisation and agencies which exercise responsibility for the peace, welfare and security of the community;
4. To reject the religious and political demagoguery and manipulation manifest in the reporting of events related to the Middle East, to seek an understanding of the underlying causes of the event, and to condemn violence as a means of enforcing national will or achieving peace;
5. To challenge and rebut statements made about Islam, Muslims and Arabs that embody religious stereotyping, prejudice and bigotry."

'ন্যাশনাল ব্যাপ্টিস্ট কনভেনশন' নামের আরও একটি আমেরিকান সংস্থা ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী হিংসাত্মক প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। তারা

www.pathagar.com

জনগণের প্রতি আহবান জানায়, "To pray for calm and rational thought and behavior, to pray that our shock and anger not turn to hatred of fear, to pray that our passion do not goad us into cries for vengeance, to pray that the finest character of America will emerge from the chaos of this experience." নর্থ আমেরিকান কংগ্রেস অন ল্যাটিন আমেরিকা', 'কংগ্রেসনাল ব্ল্যাক এসোসিয়েট', 'দি সিভিল লিবারাটিজ কোয়ালিশন' প্রভৃতি আমেরিকান সংস্থা মুসলিম বিরোধী প্রোপাগান্ডা ও কর্মকান্ডের প্রতিবাদ করে। The Congressional Black Associates দু'হাজার এক সালের ১৬ নভেম্বর নতুন কালাকানুনের বিরোধিতা করে বলে, ...Although profiling is now being directed primarily at Muslims and people who look Middle Eastern, experience shows that it will also be used against other minorities." দু'হাজার এক সালের ডিসেম্বরে The American Civil Liberties Union, (ACLU) এবং অন্য আরো ১৮টি সংস্থা ফেডারেল কোর্টে গিয়ে আটক লোকদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য, যেমন তার কি অপরাধ, তারা কোথায় কতদিন ধরে আছে, তাদের উকিলদের নাম কি ইত্যাদি জানার চেষ্টা করে। তারা 'গ্লোবাল রিলিফ ফাউন্ডেশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা রাবিহ হাদ্দাদের আমেরিকা থেকে বহিষ্কারাদেশ সংক্রান্ত মামলার প্রকাশ্য শুনানির দাবিতে দু'টি মামলা দায়ের করে। ACLU দু'হাজার দুই সালে জানুয়ারি মাসে শিকাগোর আদালতে দায়ের করে এ ধরনের আরও দু'টি মামলা।

এসব প্রতিবাদ ও আইনী লড়াই ইতিবাচক ফল দান করে। ২০০২ সালের আগস্টে একজন ফেডারেল বিচারক তার রায়ে বলেন যে, জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট রাবিহ হাদ্দাদের মামলার শুনানি রুদ্ধদ্বার কক্ষে করে অসাংবিধানিক আচরণ করছে। কোর্ট জাস্টিস ডিপার্টমেন্টকে আটক ব্যক্তিদের নাম প্রকাশেরও নির্দেশ দেয়। ২০০১ সালের ৮ নভেম্বর সিনেটর রবার্ট সি. স্মিথ 'Intelligence Authorisation Bill' নামে একটি আইন পাস করানোর জন্য সিনেটে আনেন। এই আইনের লক্ষ ছিলো অভিযুক্তকে শাস্তি দেয়া হলো কোন তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে, তা অভিযুক্ত পক্ষের কাছ থেকে গোপন রাখা। সিনেটর প্যাট্রিক লেহী এবং সিনেটর বব গ্রাহামের মতো ডিমোক্রেট সিনেটরদের সোচ্চার কণ্ঠের বাধা এই আইন প্রণয়নের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়।

www.pathagar.com

কংগ্রেসের হাউস জুডিশিয়ারী কমিটি ও ব্ল্যাক ককাসের সদস্য জন কনিয়াস জুনিয়র কালাকানুনের একজন তুখোড় সমালোচক। তিনি নানাভাবে আটক মুসলিমদের সহায়তা দান করেন। দু'হাজার দু'সালের ২২ জানুয়ারি তিনি The Detroit News এ বলেন, "To be clear, I have firmly supported the need to bring terrorists to justice, while consistently protesting against government abuses of our Constitution.....I fear the Justice Department, in its zealousness to protect our freedoms by detaining Middle Easterner without disclosing evidence and holding secret hearings, is quickly whittling away the constitutional foundation that has made freedom a beacon for the world." নাইন-ইলেভেনের পর ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মার্কিন মিডিয়া আগ্রাসন ছিলো খুবই ভয়ংকর। সিয়ান হ্যানিটি, বিল ও' রেলি, রীচ লোয়ারী, ড. ল'রা শ্লোসিংগার, রস লিমবার্গ, ক্যাল টমাস এবং এ্যালেন কিয়েসের মতো বিখ্যাত মার্কিন ভাষ্যকাররা তাদের মুখ থেকে বিষ উদ্গিরণ করেন। এরই পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের কিছু কিছু উদ্যোগ ইসলাম ও সন্ত্রাসের মধ্যকার পার্থক্য প্রদর্শনে এগিয়ে আসে। 'Oprah Winfrey Show' নামের NBC টেলিভিশনের ১ ঘন্টার টেলিভিশন অনুষ্ঠান মুসলমানদের জীবন ও ইসলামি আদর্শ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য তুলে ধরে। অনুষ্ঠানটি খুবই জনপ্রিয় ছিলো। 'ওয়ার্নার ব্রাদার্স টেলিভিশন নেটওয়ার্ক-এর 'Seventh Heaven Show'এবং Noggin and Nickelodeon A walk in your shoes' এর প্রোগ্রাম ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে ভুল ধারণা নিরসনে এগিয়ে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'Washington Post' সহ অনেক সংবাদপত্র তাদের সম্পাদকীয় নিবন্ধে মার্কিন প্রশাসনের বৈষম্যমূলক আইন ও আচরণের তীব্র সমালোচনা করে। ২০০২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন পোস্ট লেখে, 'Ten days after the 9-11 attacks, the administration instructed its immigration judges to keep certain proceedings closed. Not only would hearings be conducted in secret with 'no visitors, no family, and no press' present, but the' 'record of the proceeding (was) not to be released to anyone' either

www.pathagar.com

including 'confirming or denying whether such a case is on the docket or scheduled for a hearing..... Public access has been not-existent anyway. Immigration cases carry enormous consequences for people's freedom. The trials should, like criminal trials, be open for public scrutiny and criticism unless there is a compelling reason to the contrary. Holding trials in secret is a tactic unworthy of a great legal system.

উপরে যে আলোচনা হলো তার গোটাটাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরের কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও এমন কথা বলার অনেক আছে। বিশেষ করে নাইন-ইলেভেনের পর আফগানিস্তান, ইরাকসহ বিভিন্ন দেশের ব্যাপারে যে মার্কিন পলিসির প্রকাশ ঘটেছে, মার্কিন সংবিধানের নিরিখে সে সম্পর্কে অনেক কিছুই বলা যেতে পারে। কিন্তু আজ এ বিষয়টা আমার আলোচ্য নয়।

তবে গুয়ানতানামো বন্দীখানার ব্যাপারটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের ব্যাপার নয়। প্রায় সাতশ'র মতো লোককে সেখানে বন্দী করে রাখা হয়। যারা মার্কিন কোর্ট ও মার্কিন আইনের আশ্রয় পাচ্ছে না। অথচ তারা মার্কিনীদেরই হাতে বন্দী। মার্কিন সরকারের বন্দী হলেও মার্কিন আইন ও মার্কিন কোর্টের হাত তাদের পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না এবং তাদের ব্যাপারে পৃথিবীর সব আইন অক্ষম। মানবাধিকার লংঘনের এতোবড় ঘটনা সভ্য জগতের ইতিহাসে নেই। মার্কিন Bill of rights এবং মার্কিন সংবিধানের ঘোর বিরোধী এই ব্যবস্থা। নাইন-ইলেভেন পরবর্তী মার্কিন জীবনের এটাও একটা পরিবর্তন। গুয়ানতানামোকে বাদ দিয়ে মার্কিন ইতিহাস লেখা যাবে না।

নাইন-ইলেভেন মার্কিন আইন ও মার্কিন আচরণের মতো মার্কিন মুসলমানদের জীবনেও পরিবর্তন এনেছে। হত্যা-ধর্ষণ থেকে শুরু করে সম্পত্তির ক্ষতি, নানাভাবে নির্যাতন ও লাঞ্ছনা-গঞ্জনার তারা শিকার হয়েছে। কিন্তু এই নেতিবাচক পরিবর্তন তাদের জীবনে আরেকটা ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। বহু ক্ষেত্রেই ইসলামকে বুঝার ও মুসলমানদের জানার জন্যে আমেরিকানরা এগিয়ে এসেছে। নাইন-ইলেভেনের পরপরই মার্কিন প্রশাসনের একটা অংশ ও একশ্রেণীর আমেরিকানের মধ্যে ইসলাম ও মুসলিম বিরোধিতা যেমন তীব্র হয়ে ওঠে, তেমনি এ সময়ই সাধারণ ও সচেতন আমেরিকানদের মধ্যে ইসলাম ও

www.pathagar.com

মুসলমানদের প্রতি আগ্রহ দারুণভাবে বেড়ে যায়। এর একটা পরিমাপক হলো নাইন-ইলেভেনের পর প্রথম এক কোয়ার্টারে ইসলাম গ্রহণের হার ছিল প্রতিমাসে ৪ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার। নাইন-ইলেভেনপূর্ব সময়ের চেয়ে এই হার প্রায় চার গুণের মতো বেশি। পরে এই হার কমে এসেছে বটে, কিন্তু তবু বর্তমান(২০০৩) হারও নাইন-ইলেভেন পূর্ব সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। সাধারণ আমেরিকানরা খুঁজে খুঁজে ইসলামি বই-পত্র ও পত্র-পত্রিকা যোগাড় করে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে জানার আগ্রহ মেটাচ্ছে। আমেরিকা সফরকালে একদিন আমি নিউইয়র্কের মেসেজ সম্পাদকের টেবিলে বসেছিলাম। এ সময় তার কাছে একটা e-mail এলো আটলান্টা থেকে। একজন অমুসলিম মেয়ে মেসেজ পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলি জানার জন্যে এই e-mail করেছিল। মেয়েটি কোথাও থেকে এই পত্রিকার নাম পেয়েছিল। সম্পাদক সাহেব বললেন, এ ধরনের টেলিফোন, চিঠিপত্র, e-mail তারা অহরহই পাচ্ছেন। এই সফরে ওয়াশিংটন ডেট্রয়েট, নিউইয়র্ক যেখানেই ধর্মনেতা, আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদদের সাথে দেখা হয়েছে, তারা বলেছেন যে নাইন-ইলেভেনের পর রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ও অনুষ্ঠানে তাদের ডাক বেড়ে গেছে। স্থানীয়ভাবে মুসলমানরা স্থানীয় রাজনীতিক ও সমাজ নেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারা পরিবর্তনের আরেকটা উল্লেখযোগ্য দিক। নাইন-ইলেভেনের পর থেকে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দলের স্থানীয় নেতা এবং সিনেট ও কংগ্রেস সদস্যরা মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছেন। নাইন-ইলেভেন পরবর্তী বিপর্যয়কর মুহূর্তে বহু ক্ষেত্রেই তাদের সহযোগিতা-শান্তনায় মুসলিম আমেরিকানরা নিরাপত্তা বোধ করেছে। মেরিল্যান্ড অথবা ভার্জিনায় একটা চমকপ্রদ গল্প শুনেছিলাম। সেখানকার মেয়র অফিসে একজন মুসলিম আমেরিকান চাকরি করেন। নাইন-ইলেভেনের ঘটনার পরদিন তিনি ভয়ে অফিসে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। মেয়র এ বিষয়টা জানার সাথে সাথেই নিজে ছুটে যান কর্মচারির বাড়িতে এবং তাকে অভয় দিয়ে নিজ গাড়িতে করে অফিসে নিয়ে আসেন।

নাইন-ইলেভেনের পর আমেরিকান মুসলমানদের জীবনে পরিবর্তনের আরেকটা বড় দিক হলো, তাদের দৃষ্টি এবার তাদের নিজেদের দিকে খুব ভালোভাবেই পড়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। তাদের শক্তি ও সম্ভাবনাকে যেন তারা নতুন

www.pathagar.com

করে আবিষ্কার করছে। এবার মিসিগানের ডেট্রয়েট-ডিয়ারবোর্নে থাকাকালে সেখানে আরব-আমেরিকানদের তিন দিনব্যাপী বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান দলের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেন। তিন দিনের এই কনভেনশনে প্রেসিডেন্ট পদে ডেমোক্র্যাটিক দলের নমিনেশনকামী প্রার্থী বক্তৃতা করেন। শুনেছি, আরব-আমেরিকান এই কনভেনশন মার্কিন রাজনীতিকদের কাছে এবার যে গুরুত্ব পেয়েছে, তার শতভাগের এক ভাগ গুরুত্বও অতিতে পায়নি। কনভেনশনের দ্বিতীয় দিনে বার্ষিক ডিনার অনুষ্ঠিত হয়। আমরা এই ডিনারে দাওয়াত পেয়েছিলাম। ডিনার পার্টিতে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিক পার্টির নেতৃবৃন্দসহ একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বক্তৃতা করেন। তারা সবাই মুসলিম স্বার্থের পক্ষে কথা বলেন। আমেরিকান মুসলমানরা যে নির্যাতন-নিপীড়নের শিকার হয়েছে তাও তারা স্বীকার করেন এবং এ জন্যে সরকারকে তারা অভিযুক্ত করেন। কিন্তু আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আরব-আমেরিকান নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা। এই বক্তৃতায় তাদের আত্ম-সমীক্ষা ও আত্মসমালোচনা ছিল। মুসলমানরা বিভিন্ন গ্রুপ-নামে বিভক্ত থাকাজনিত অনৈক্যকে তারা আমেরিকান মুসলমানদের দুর্বলতা ও দুর্ভাগ্যের একটা কারণ বলে উল্লেখ করেন। এই দুর্বলতা না থাকলে তারা মার্কিন রাজনীতির মূল স্রোতধারায় তাদের শক্তিশালী অবস্থান চিহ্নিত করতে সমর্থ হতো। মুসলিম নেতৃবৃন্দ বলেন, 'ভোট আমাদের Right এবং ব্যালট আমাদের Might - এই অস্ত্র আমরা এতদিন ব্যবহার করিনি, ব্যবহার করতে হবে এখন এই অস্ত্র।' উক্তিটি আমি মনে করি সব আমেরিকান মুসলমানদেরই। মসজিদগুলোর সামনে শামিয়ানা টাঙিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ভোটার রেজিস্ট্রেশনের হিড়িকের মধ্যে এই মনোভাবেরই সরব প্রকাশ আমি দেখেছি। আত্মপরিচয়সহ নিজেদের প্রকাশ করার দৃঢ়তাও সৃষ্টি হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে নাইন-ইলেভেনের পর। নিউইয়র্কে অথবা ওয়াশিংটনে একজন কলেজ শিক্ষকের কাছে গল্প শুনেছিলাম যে, নাইন-ইলেভেনের পর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম মেয়েদের মধ্যে হিজাব পরার অভ্যাস বাড়ছে। ভয়-সংকোচের বদলে তারা সাহসী হয়ে উঠেছে। একটা বিস্ময়কর ঘটনা হলো,

www.pathagar.com

ভার্জিনিয়ার স্টেট সিনেটের জন্যে সাঈদ আফিফা নামে একজন হিজাবধারী মহিলা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নমিনেশন পাওয়ার নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছে। এটা কোনো মিরাকল নয়, মিথ্যার ওপর সত্যের জয় এভাবেই সূচিত হয়ে থাকে।

নাইন-ইলেভেনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'হোম এ্যাফেয়ার্স-এ এত পরিবর্তন এলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ফরেন এ্যাফেয়ার্স'-এ কোনো পরিবর্তন লক্ষ করিনি। সফরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আফগান পলিসি, ইরাক পলিসি, ফিলিস্তিন-ইসরাইল পলিসি ও 'ওয়ার অন টেরর' প্রসঙ্গ নিয়ে অনেক মতবিনিময় আমাদের হয়েছে। কিন্তু পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে কোনো নতুন চিন্তার কোনো ইঙ্গিত আমরা পাইনি। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনার সাথে একজন আফগান জড়িত না থাকলেও এবং লাদেন এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার প্রত্যক্ষ ও সন্দেহাতীত প্রমাণ না মিললেও আফগানিস্তানে ধ্বংস-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্রের নাম-নিশানা পাওয়া না গেলেও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইরাক প্রায় বিরান ভূমিতে পরিণত। এটা তাদের সিদ্ধান্তগত দৃঢ়তা, না ঘটনা-পূর্ব কোনো মাইন্ড সেট-এর ফল, তা বলা মুসকিল। তবে সত্য এই যে অনেক আমেরিকানও মনে করেন, সত্যের মুখোমুখি মার্কিন প্রশাসনকে একদিন দাঁড়াতেই হবে। ২০০৩ সালের ২১ মে সিনেটের সাবেক মেজরিটি লিডার ডেমোক্র্যাট দলীয় সিনেটর বায়ার্ড সিনেটের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে এ কথাটাই বলেছিলেন এভাবে;

"Truth has a way of asserting itself despite all attempts to obscure it. Distortion only serves to derail it for a time. No matter to what lengths we humans may go to obfuscate facts or delude our fellows, truth has a way of squeezing out through the cracks, eventually.... the American people unfortunately are used to political shading, spin, and the usual chicanery they hear from public officials. They patiently tolerate it up to a point. But there is a line. It may seem to be drawn in invisible ink for a

www.pathagar.com

time, but eventually it will appear in dark colors, tinged with anger. When it comes to shedding American blood-when it comes to wreaking havoc on civilians, on innocent men, women, and children-callous dissembling is not acceptable. Nothing worth that kind of lie-not oil, not revenge, not reelection, not somebody's grand pipedream of a democracy dimino theory. And mark my words, the calculated intimidation which we see so often of late by the powers that be' will only keep the loyal opposition quiet for just so long. Because eventually, like it always does, the truth will emerge. And when it does, this house of cards, built of deceit, will fall."

অনুরূপভাবে ফিলিস্তিন-ইসরাইলের ব্যাপারেও মার্কিন পলিসি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বাপর সব ঘটনা এটাই প্রমাণ করে, মার্কিন সরকার ফিলিস্তিনে অবশ্যই শান্তি চায়, কিন্তু সে শান্তি ইসরাইলী অভিভাবকত্বে, ইসরাইলকে অদ্বিতীয় অবস্থায় রেখে। ব্যাপারটা ঠিক ভারতের বৃটিশ শাসক লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক দেশীয় রাজ্যগুলোর জন্যে প্রণীত অধীনতামূলক মিত্রতার মতোই কতকটা। এ না হলে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের জন্য 'সেলফ রুল' এবং 'রোডম্যাপ' কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। পিএলও যখন ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নিল, তখন সেলফ রুলের অনিশ্চিত পথে না গিয়ে যদি তখনই ১৯৬৭ সালে অধিকৃত ফিলিস্তিনী অঞ্চল ইসরাইল ফেরত দিত, তাহলে অশান্তির বড় কারণ দূর হয়ে যেত। হামাসেরও সৃষ্টি হতো না। মধ্যপ্রাচ্য শান্তি স্থাপন সহজ হয়ে যেত। কিন্তু ইসরাইল শান্তি চায় না, চায় আধিপত্য, যার সুন্দর নাম হলো 'অধীনতামূলক মিত্রতা'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত ইসরাইলী এই নীতিকেই এনডোর্স করছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির পথে এই মানসিকতাই সবচেয়ে বড় বাধা। আমি এবারের সফরকালে শান্তির জন্যে ইসরাইল বিনা শর্তে ১৯৬৭ সালের অধিকৃত এলাকা ছাড়তে পারে কি না এই প্রশ্ন তুলেছিলাম। স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও ন্যাশনাল

www.pathagar.com

সিক্যুরিটি কাউন্সিলের দু'জন দায়িত্বশীল ব্যক্তি একই জবাব দিয়েছেন: সমস্যাটা এত সরল নয়, সমাধানও এত সহজ নয়। ইহুদি গ্রুপের সাথে আমাদের আলোচনা ছিল। সেখানেও এই প্রশ্ন আমি করেছিলাম। বিস্ময়করভাবে জবাব একই রকমের ছিল- সমস্যাটা এত সহজ নয়। তবে সেলফ রুল রোডম্যাপ ফর্মুলাও সমস্যাকে সহজ করেনি।

নাইন-ইলেভেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় নীতিকেই প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাব তার অভ্যন্তরীণ নীতিতে যেমন কিছু নেতিবাচক প্রভাব এনেছে, তেমনি তার বৈদেশিক নীতির ইতিবাচক পরিবর্তনে বাধার সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনোদিনই আর তেমন হবে না, যেমনটা ছিল নাইন-ইলেভেনের পূর্বে।" এর সাথে আমি একমত নই। আমি সিনেটর বায়ার্ডের সাথে একমত যে, মার্কিন জনগণের দ্বারাই অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয়। তবে এর জন্যে অপেক্ষাটা অনেক কষ্টকর।

www.pathagar.com

১১

২৫ অক্টোবর আমার দেশে ফেরার কথা। কিন্তু আমি চললাম মেরিল্যান্ডে, আমার মেয়ে-জামাইয়ের বাড়িতে। অ্যামব্যাসির গাড়িতে মেরিল্যান্ডে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সাথে বাংলাদেশ অ্যামব্যাসির সৈয়দ কামাল উদ্দিন সাহেব। তিনি বাংলাদেশের একজন সিনিয়র সাংবাদিক। বিদেশী বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে কাজ করেছেন। বাংলাদেশ অ্যামব্যাসিতে এখন তিনি চুক্তিভিত্তিক কূটনীতিক জবে রয়েছেন। তিনি যাচ্ছেন ওয়াশিংটনে, অ্যামব্যাসির হেড কোয়ার্টারে। ওয়াশিংটন যাওয়ার আগেই মেরিল্যান্ড পড়ে। মেরিল্যান্ডে আমি নেমে যাব। নিউইয়র্ক থেকে সড়ক পথে মেরিল্যান্ডে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে খুবই খুশি আমি। কিন্তু যাবার পথে উন্মুক্ত প্রান্তর পেলাম, বনভূমি পেলাম, লোকালয় খুব একটা পেলাম না। আমেরিকার ফ্রিওয়েগুলোতে গাড়ি শুধু চলে থামে না। যারা ডানে বামে ট্রানজিট নিতে চায় তারা না থেমে আস্তে আস্তে লেন চেঞ্জ করে সড়কের প্রান্তের লেনে চলে যায় এবং ট্রানজিট নিয়ে নেয়। হাইওয়েতে মাঝে মাঝেই সড়কের পাশে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং আছে। যাদের কোনো কারণে থামার জরুরি প্রয়োজন দেখা দেয় তারা ট্রানজিট নেয়ার পদ্ধতিতেই লেন চেঞ্জ করে ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিংয়ে ঢুকে যায়। হাইওয়েতে গাড়িগুলো প্রায় ১০০ কিলোমিটারের নিচে চলেই না। এই কারণে হাইওয়েগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোকালয় এড়িয়ে তৈরি। এই কারণেই লোকালয় না পাওয়ায় দু'পাশের জনজীবন সম্পর্কে কোনো ধারণা নিতে পারিনি। তবে যেটুকু নজরে পড়েছে তাতে আমার আগের ধারণাই কনফার্ম হয়েছে। আসলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতন দেশগুলোতে কোনো গ্রাম নেই। গ্রাম নামে যা আছে তা শহর থেকে আরামদায়ক।

আমরা বারবার জামাই-মেয়েদের সাথে কথা বলে লোকেশনের বিবরণ জেনে নিয়ে বিভিন্ন রাস্তা ঘুরে অবশেষে মেয়ের বাড়িতে যখন পৌঁছলাম তখন দুপুর হয়ে গেছে। কামাল উদ্দিন সাহেবকে ধন্যবাদ যে, তিনি আমার জন্য খুব কষ্ট

www.pathagar.com

করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে নতুনদের পক্ষে কোনো বাড়ি খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন। সেখানে মাকড়সার জালের মতো রাস্তার জটিল নেটওয়ার্ক। একবার ভুল হলে অনেক ঘুরে ভুলের মাসুল দিতে হয়। আমরাও কম ঘুরিনি।

কামাল উদ্দিন সাহেব আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমার মেয়ে-জামাইয়ের সাথে পরিচিত হওয়ার পরেই বিদায় নিতে চাইলেন। কিন্তু তাকে তারা ছাড়ল না। লাঞ্চের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আমার জামাই ড. হাসমত লাঞ্চ করে যাবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কামাল উদ্দিন সাহেবও আমি দু'জনেই লাঞ্চে বসলাম। শুরুতেই ধাক্কা খেলাম লাঞ্চের জন্যে যে প্লেট দেয়া হলো সেটা ডিসপোজেবল। আমি হেসে বললাম, শেষে কাগজের প্লেটে মেহমানদারি! আমার মেয়ে ও জামাই কিছু বলার আগেই কামাল উদ্দিন সাহেব বলে উঠলেন, 'আবুল আসাদ সাহেব আপনার কাছে এটা নতুন কিন্তু আমরা অভ্যস্ত।' কিন্তু আমার মেয়ে দু'জনের প্লেটই পরিবর্তন করে দিলো। পরে আমি আমেরিকায় যতদিন ছিলাম দেখেছি সাধারণভাবে সকলেই ডিসপোজেবল প্লেট ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। পরিষ্কার করার বাড়তি ও বিরক্তিকর পরিশ্রম থেকে বাঁচার জন্যে এই ব্যবস্থা। ও দেশে বাড়ির কাজের জন্য লোক পাওয়ার কল্পনাই করা যায় না। সেখানে শ্রমিকের যে মূল্য সেদিক থেকেও এ ধরনের শ্রম কেনার কথা কেউ কল্পনাও করে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেস-বাড়িতেও দাওয়াত খেয়েছি, যেখানে কয়েকজন চাকরিজীবী বাস করে। মাছ কাটা, গোস্ত কাটাসহ তারা নিজেরাই রান্না করে, অভিজ্ঞ কুকের মতো। মাছের আঁশ ছাড়ানো, টুকরো করার দ্রুততা দেখে আমি অবাক হয়েছি। লাঞ্চের পর বিদায় নিয়ে কামাল উদ্দিন সাহেব চলে গেলেন। আমি ও জামাই ড. হাসমত কামাল উদ্দীন সাহেবকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম।

প্রায় বছর পাঁচেক পরে জামাই-মেয়ের সাথে দেখা। জামাই ড. হাসমত জাপানে পিএইচডি করে আমেরিকার জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট ডক্টরাল স্কলারসিপ নিয়ে জাপান থেকে আমেরিকা চলে আসে। আর আমার মেয়ে দুই বাচ্চাকে নিয়ে জাপান থেকে দেশে ফিরে। দুই নাতি নাসিফ ও ওয়াসিফ জাপানেই জন্মগ্রহণ করে। দেশে কিছুদিন থাকার পর জামাই গিয়ে আমার মেয়েকে আমেরিকায় নিয়ে আসে। তারপরে এই প্রথম দেখা। ইতোমধ্যে আমেরিকাতে আমার তৃতীয় নাতি আহমদ মুসার জন্ম হয়েছে। তাকে এই প্রথম

www.pathagar.com

দেখলাম। আমার মেয়ে নুসরাত নুরুন নাহার সাবিনা ঢাকার ইডেন কলেজে অনার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ার সময় বিয়ে হয়। জামাই হাসমত আলী তখন জাপানে পিএইচডি করছিল। জন হপকিন্সে পোস্ট ডক্টরেট করার পরে ওখানেই সে রিসার্চ প্রজেক্টে যোগ দেয়।

কামালউদ্দিন সাহেবকে বিদায় দিয়ে আসার পর সবাই মিলে বসলাম। এবার গল্প-গুজব ও পরিচয়ের পালা। পরিচয় মানে নাতিদের সাথে নানার পরিচয়। ছোট নাতি আমাকে চিনতে পারার কথায় নয়। তার জন্ম ২০০১ সালে আমেরিকায়। বয়স এখন তার তিন বছর। পরিচয় না থাকলেও আমি যে নানা সে কথা বেশ বুঝতে পেরেছে। কিন্তু কথা বলার পর্যায়ে এখনো আসেনি। বড় এবং মেঝো দুই নাতি যখন আমেরিকায় আসে, তখন তাদের বয়স ছিল সাড়ে তিন বছর আড়াই বছর। দেখলাম বড়নাতি নাসিফ-এর কিছু মনে আছে। কিন্তু মেজনাতি ওয়াসিফ-এর কিছুই মনে নেই। পরে দেখেছিলাম যে সব ঘটনার কথা তাদের মনে আছে সেসব ভালো ঘটনা নয়। তাতে আমি এটা নতুন করে বুঝলাম যে, অবাঞ্ছিত, খারাপ ঘটনাগুলো শিশুদের মনে দাগ কাটে বেশি। শিশুর জন্য অবাঞ্ছিত, বকাবকি ধরনের কিছু ঘটলে আমরা মনে করি শিশুরা দুদিন পরেই ভুলে যাবে। কিন্তু তা তারা ভুলে না। শিশু মনে এ ধরনের কিছু ঘটনা এমনভাবে দাগ কেটে বসে যা তারা ভুলে যায় না। আমেরিকায় যারা বড় হয় এমন বাচ্চাদের সাথে কথা বলা খুব সুখকর হয় না। আমাদের যেমন ভাষার স্থানীয় উচ্চারণ আছে। তেমনি ওদের ইংলিশেরও স্থানীয় স্টাইল তারা ব্যবহার করে। স্থানীয় উচ্চারণে শব্দের আংশিক বা কিছু পরিবর্তিত প্রকাশ ঘটে থাকে। যা আমেরিকায় নতুনদের পক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে বুঝে নেয়া খুব কঠিন। নাতিদের সাথে কথা বলায় প্রথম দিকে আমি এই সমস্যা অনুভব করেছি। অবশ্য বড় নাতি বাংলা ভাষায় নিজেকে কিছুটা প্রকাশ করতে পারে। মেজনাতি, ছোটনাতিও কিছু বাংলা কথা বলতে পারে। কিন্তু শব্দের ভান্ডার খুবই সীমিত। আমার মেয়ের পরিবার বাসায় বাংলা বলে, এর পরেও এই অবস্থা। এবার যখন আমি আমেরিকায় আসি, তখন অক্টোবর মাস। আর মেয়ের বাড়িতে যখন এলাম তখন সময়টা অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ। আমি মনে করেছিলাম রাতে লেপের মতো কিছু গায়ে দিতে হবে। অন্য সময়ও ঘরে নিশ্চয় গরম জামা কাপড় ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু দেখলাম ঘটনা তার উল্টো রাতের বেলাতেও ঘরে গেঞ্জি জামার বেশি

www.pathagar.com

ব্যবহার করা গেল না। শোয়ার পরে যে অবস্থা সেটা কম্বল ব্যবহারের মতো নয়। এর কারণ আমেরিকার সব বাড়িতেই শীতকালে সর্বক্ষণ হিটার ব্যবহার করা হয়। নতুনদের জন্য প্রথম দিকে হিটারের উত্তাপ খুব সুখকর হয় না। কিন্তু আমেরিকার মতো শীতের দেশগুলোতে হিটার ব্যবহার শুধু জরুরি নয়, জীবন রক্ষার মতোই অপরিহার্য। বড় উপকারি জিনিসের কিছু অপকার থাকতেই পারে। আমেরিকায় এই সমস্যা আছে। বাড়িতে হিটারের মধ্যে মানুষ যে তাপমাত্রায় থাকে বাইরে তার বিপরীত অবস্থা। বাইরে গিয়ে গাড়িতে ওঠলে রক্ষা, কিন্তু গাড়ির বাইরে গিয়ে হাঁটতে বা কাজকর্ম করতে গেলে সমস্যায় পড়তে হয়। তাপ ও ঠাণ্ডার খুব উৎকট বৈপরীত্য দেহের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু তো ক্ষতি করে। যেমন কানের অসুবিধা সেখানকার একটি বড় সমস্যা। কিন্তু আমাদের মতো গরম দেশে ঠিক তার উল্টো অবস্থা। প্রচণ্ড গরমে ঘরের এয়ারকন্ডিশন শান্তির আশ্রয়। ঘর থেকে বেরুলেই রোদ এবং গরমের তাপদাহ আমাদের এসে ঘিরে ধরে, ঘাম ঝরায় এবং অবস্থাকে অসহনীয় করে তোলে। কোল্ডস্ট্রোকের মতো মানুষ হিটস্ট্রোকেও আক্রান্ত হয়। প্রচণ্ড শীতের দেশেও মানুষের যেমন কিছু সুবিধা আছে তেমনি প্রচণ্ড গরমের দেশেও মানুষ কিছু সুবিধা ভোগ করে। এখন এই দুয়ের কোনটা বেশি সুবিধাজনক সে রায় দেয়া কঠিন। স্রষ্টা নিশ্চয় কারো প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব করেননি।

তবে একথা ঠিক সৌজন্য সামাজিকতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক দেশ থেকে অনেক দেশের মধ্যে পার্থক্য আছে। শিক্ষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি এই পার্থক্য সৃষ্টি করে। আর এগুলোর নিয়ামক মানুষ।

আমেরিকায় আমার মেয়ের বাড়িতে প্রথম ভোর। ঘুম থেকে ওঠে নামায পড়ে বসে আছি। সূর্য ওঠেছে কিনা বুঝার উপায় নেই। তবে ঘড়ির কাটা বলছে সূর্য ওঠার পর বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেছে।

দরজায় নক হলো। দেখলাম দরজায় দাঁড়িয়ে আমার ছোট নাতি আহমদ মুসা। আমি তার দিকে তাকিয়ে নানাভাই এসো বলতেই সে বললো নানা আমি কি কম্পিউটারে বসতে পারি। আমি বললাম, হাঁ এসো। আমাদের দেশের মতো অনেক দেশেই ঘরে ঢোকা এবং এ ধরনের অনুমতি নেয়ার অভ্যাস নেই বা কম দেখা যায়। তাদের বাড়ি তাদের ঘর সোজা এসে সে কম্পিউটারে বসতে পারতো। কিন্তু আমি যেহেতু বয়সে বড় এবং এ ঘরে আমি থাকছি, অতএব সে

www.pathagar.com

অনুমতি নেয়ার প্রয়োজনবোধ করেছে। লেখাপড়া এবং দীর্ঘদিনের অভ্যেস মানুষের ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। এরই নাম সভ্যতা। আমাদের হতাশ হবার কিছু নেই। একটা সভ্যতা সৃষ্টি হতে বা পুনর্জীবিত হতে অনেক সময় লাগে। সে সময় আমাদের প্রয়োজন। আমার মেয়ে-জামাইরা একটা ফ্ল্যাট-বাড়ির একটা ফ্ল্যাটে থাকে। আমি তাদের বাড়িতে ঢোকার সময় কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে ঘরের মেঝে পেলাম। পরের দিন আমি তাদের ড্রয়িং রুমে বসে আছি উত্তরমুখী হয়ে। দেখলাম সামনে উত্তর দেয়ালটা কাচের। দেয়াল ঠিক নয় আসলে বড় দরজা। দেখলাম বাইরের মাটির লেভেলটা ফ্লোরের সমান্তরাল। আমি ভাবলাম যখন বাড়িতে ঢুকি, তখন কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে তবেই ফ্লোর পেয়েছিলাম। এখন ফ্লোর দেখি মাটির সমান্তরাল। জানলাম, এটা বাড়ির একটা নির্মাণ কৌশল। বাড়ির দক্ষিণ পাশটার জমি উঁচু আর উত্তর পাশটা নিচু। দরজা দুই দিকেই আছে। দক্ষিণ দিক সম্মুখ ভাগ,উত্তরটা পিছন দিক। সামনের দিকের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকতে কয়েক ধাপ নিচে নামতে হয় আর উত্তর দিকের পিছন দরজায় তার প্রয়োজন হয় না। এই নির্মাণ কৌশলের সাথে আবহাওয়ার সম্পর্ক থাকতেও পারে।

বড় দুই নাতি পড়াশুনায় খুবই ভালো। সবসময় ক্লাসে ভালো করে। ছোট নাতি এখনো স্কুলে যাওয়া শুরু করেনি। তবে সেও খুব বুদ্ধিমান। মেয়ে অভিযোগ করলো পড়াশুনায় ভালো হলেও ভালো রেজাল্ট করলেও মেঝো নাতি ওয়াসিফ বাড়ির পড়া তৈরিতে যতটা মনোযোগী বড় নাতি ততটা নয়। মেঝো নাতি বাড়ির পড়া সব তৈরি করে স্কুলব্যাগ গুছিয়ে ঘুমাতে যায়। কিন্তু বড়টা এ ব্যাপারে অমনোযোগী। আমি একসময় বড় নাতিকে জিজ্ঞাস করি সে কেনো এমন করে। সে বললো, ক্লাসে যা পড়ায় আমি জানি। আসলে ঘটনা তাই। ক্লাসে এমন অনেক শিক্ষার্থী থাকতে পারে যাদের মেধা ক্লাসের লেভেল থেকে অনেক এগিয়ে। এদের জন্য ক্লাসের পড়ায় সিরিয়াস হওয়া কঠিন। পরে শুনেছিলাম এ ধরনের ছাত্রের জন্য আমেরিকায় আলাদা ব্যবস্থা হয়ে থাকে। ক্লাসে থেকেও তারা যে ক্লাসের জন্য উপযুক্ত সে ক্লাসের সিলেবাস ফলো করে থাকে। আমার নাতির ক্ষেত্রেও স্কুল কর্তৃপক্ষ থেকে এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি সবচেয়ে খুশি হয়েছিলাম আমার মেয়ে-জামাইরা তাদের তিন ছেলেকে যেভাবে মানুষ করছে সেটা দেখে। ওদের কম্পিউটারে ইন্টারনেট কানেকশন নেই। টিভিতে ওরা

www.pathagar.com

মেরিল্যান্ড স্টেট টিভির কয়েকটা বিশেষ প্রোগ্রাম দেখে মাত্র। তার অধিকাংশ প্রোগ্রামই শিশুতোষ, নির্দোষ বিনোদনমূলক এবং পারিবারিক জীবনের দিক থেকে প্রয়োজনীয়। এর বাইরে কম্পিউটারে কিছু সিলেক্টেড ভিডিও, যা তারা নানাভাবে সংগ্রহ করে, দেখে থাকে। এইভাবে তারা সামাজিক নানা প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও আদর্শনিষ্ঠ জীবন গড়ার চেষ্টা করছে। এর ফল তারা পাচ্ছে। স্কুল এবং বাইরের নানা রকম সামাজিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তারা নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করে চলতে পারছে। এ রকম চলতে গিয়ে তারা অসুবিধাতেও পড়ছে। সম্ভবত আমার বড় নাতি তখন এইট কিংবা নাইন লেবেলে পড়ে। সে তার বাবা-মাকে বলে যে, স্কুলের পরিবেশ তার ভালো লাগে না। সে বাড়িতেই পড়তে চায়। এমন সিস্টেম আমেরিকান শিক্ষা ব্যবস্থায় আছে। আমার মেয়ে-জামাইরা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানায় যে, স্কুলের সিলেবাস কারিকুলাম অনুসারে ছেলেকে আমরা বাড়িতেই পড়াতে চাই। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের আবেদন গ্রহণ করে তাদের বাড়িতে তদন্তে যায়। বাড়ির পরিবেশ কেমন, কে পড়াবে, তাদের যোগ্যতা কি ইত্যাদি দেখার পর তারা আবেদন মঞ্জুর করে। তবে শর্ত এই যে, পরীক্ষাগুলো সব স্কুলে দিতে হবে। এইভাবে এক বছর চলে। এই এক বছরের পরীক্ষাগুলোতে সব বিষয়ে সে ভালো রেজাল্ট করে। এক বছর পরে নানা চিন্তা করে তাকে স্কুলে ফেরত পাঠানো হয়। আমিও তাদের পরামর্শ দিই যে, সমাজ ও শিক্ষার মেইন স্ট্রিম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা কিছুতেই ঠিক হবে না। নিজেদের কালচার ও বিশ্বাস সম্পর্কে তাদের সতর্কতা বেড়েছে, কোন আশঙ্কার কারণ নেই।

আমি যে কয়দিন মেয়ের বাড়িতে ছিলাম দাওয়াত ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সময় কেটেছে। মেরিল্যান্ড, ওয়াশিংটন এবং ভার্জিনিয়া অঞ্চলে প্রচুর বাংলাদেশীর বাস। এই তিন স্টেটেই বাংলাদেশীদের বিভিন্ন বাড়িতে দাওয়াত খেয়েছি এবং তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। কোনো কোনো প্রোগ্রাম আমার যাওয়া উপলক্ষে আয়োজন করা হয়েছিল। কোনো কোনো প্রোগ্রাম আগে থেকেই নির্দিষ্ট ছিল। সবগুলো অনুষ্ঠানে খাওয়া-দাওয়া এবং কিছু আলোচনা শামিল ছিল। মজার ব্যাপার হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যারা অনুষ্ঠানে আসতো তারা প্রত্যেকেই নিজেদের বাড়ি থেকে বিভিন্ন ধরনের যথেষ্ট খাবার নিয়ে আসতো। সবগুলো খাবার একসঙ্গে করে সুন্দর একটা ভোজ হয়ে যেত। সবার

www.pathagar.com

অংশগ্রহণে সবার আনন্দে অনুষ্ঠান সবার জন্যই উপভোগ্য হয়ে উঠতো। কিছু কিছু অনুষ্ঠানে আমাকে কথা বলতে হয়েছে। কোথাও বৈঠকি আলোচনা কোথায় আনুষ্ঠানিক বক্তৃতা। সব জায়গাই দেখেছি প্রবাসীদের সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেশ ও দেশের ভবিষ্যৎ এবং ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে কিছু শুনার। এই অনুষ্ঠানগুলোতেও সেটাই ঘটেছে। বড় একটা অনুষ্ঠান হয়েছিল কোনো একটা হলে বা কমিউনিটি সেন্টার ধরনের একটা স্থানে, নাম ভুলে গেছি। অধিকাংশ অনুষ্ঠানেই যেমন দেখেছি পরিবার সমেত সবাই আসে, এখানেও সবাই পরিবার নিয়ে এসেছিল। বয়স্ক থেকে বাচ্চা পর্যন্ত সবাই। সব মিলিয়ে অনেক লোক। খাওয়ার আনন্দঘন অনুষ্ঠানের পর আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু হয়। এখানে আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের তরফ থেকে কতগুলো মৌলিক প্রশ্নের অবতারণা করা হয়। যেমন আজকের এই আধুনিক যুগে ফলপ্রসূ দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া প্রয়োজন। একসময় দাওয়াতের যে ফল পাওয়া যেত সে ফল এখন পাওয়া যায় না কেন? দুনিয়ায় মুসলমানরা এত পশ্চাদপদ এবং নিপীড়িত কেন? এসব প্রশ্নের ওপর বক্তব্য আমাকে রাখতে হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা পশ্চাদপদ কেন, তারা নির্যাতিত নিপীড়িত কেন এমন প্রশ্নের জবাবে আমেরিকায় অনেক অনুষ্ঠানে আমাকে কথা বলতে হয়েছে। আমি সেই কথাগুলো এখানেও বললাম। আমি বেশি গুরুত্ব দিলাম প্রচার, আহ্বান, দাওয়াত ইত্যাদি আমাদের ফলপ্রসূ হয় না কেন। ব্যাপকভাবে আমাদের দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না কেন। আমি তাদের বললাম, ইসলাম কোনো সম্প্রদায়ের ধর্ম নয় এবং ইসলামের আবেদন আহ্বান গোটা দুনিয়ার মানুষের জন্য। মুসলমান কোনো সম্প্রদায়ের নাম নয়। যারা আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে, আল্লাহর শেষ বার্তাবাহক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে মানে এবং যারা ইহকালীন কল্যাণ এবং পরকালীন মুক্তির ইসলামী জীবন দর্শনকে গ্রহণ করে, তারাই মুসলিম হয়ে যায়। ইসলাম কোনো দেশ বা কালের বাঁধনে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলাম সব মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির কথা ভাবে। এই বৃহত্তর আঙ্গিকে আমরা ইসলামের উপস্থাপন করতে পারি না। এর কারণ হলো আমরা যারা ইসলামের কথা বলি তারা আসলেই এই কাজের জন্য প্রস্তুত নই। আধুনিক একজন সমাজবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার একটি কথা আমি শ্রোতাদের সামনে নিয়ে এলাম।

www.pathagar.com

ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা বলেছেন, ধর্ম হিসাবে ইসলামেরই শুধু পশ্চিমী সভ্যতার উদার নৈতিক মতবাদের সাথে (liberalism) প্রতিযোগিতার যোগ্যতা রয়েছে। কিন্তু একবিংশ শতকের মতবাদিক লড়াইয়ে ইসলাম পরাজয় বরণ করবে। কারণ ইসলামের আবেদনটা সাম্প্রদায়িক, অন্যদিকে উদার নৈতিক মতবাদের আবেদন বিশ্বজনীন। ফুকুয়ামা ইসলাম সম্পর্কে এই কথা বলতে পেরেছেন এই কারণে যে, আমরা ইসলামকে অনেক ক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক করে ফেলেছি। অথচ আল্লাহর রাসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাওয়াত ছিল সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন। মানুষের প্রতি তার আহ্বান ছিল দুনিয়ার সকল খোদা ও উপাস্য হওয়ার দাবিদারদের অস্বীকার করে বিশ্ব জগতের স্রষ্টা প্রতিপালক ও বিচার দিবসের মালিক আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ এবং প্রেরিত নবী-রাসূলগণের মধ্যে সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রেসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দিকে। এই বিশ্বাস ও আনুগত্য কোনো দেশ, সাম্রাজ্য কিংবা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর স্বার্থে নয়। কোনো সংকীর্ণ স্বার্থ নয়, ইহকালীন মানবিক কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্যই এর সবিশেষ প্রয়োজন। যা কথিত উদার নৈতিক মতবাদ মানুষকে দেয়নি, দিতে পারছে না এবং দিতে পারে না। কিন্তু মানব ধর্ম ইসলাম যাকে আল্লাহ স্বয়ং মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম হিসেবে সুনির্দিষ্ট করেছেন, তাকে এইভাবে দুনিয়ার মানুষের কাছে তুলে ধরতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। এই ব্যর্থতার কারণেই ইসলাম দুনিয়ায় সব মানুষের ধর্ম হয়ে উঠেনি, যেমন আমরা আশা করি। ইসলামী আদর্শের যারা বাণী বাহক হন তারা কেমন, তাদের কাছে মানুষ কেমন, আদর্শের গ্রহণযোগ্যতার জন্য দুটোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার এই আলোচনায় শ্রোতাদের একটি গল্প শুনিয়েছিলাম। গল্প খুবই মজার এবং গুরুত্বপূর্ণ। বেশ আগের গল্পটি। তখনও ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে শাসন দণ্ডের মালিক। সেই সময়ের লাক্ষ্ণৌ ও বাংলাদেশে বসবাসকারী দুজন ব্যক্তিকে নিয়ে গল্পটা। তাদের একজন পীর অন্যজন তার মুরীদ। পীর থাকেন লাক্ষ্ণৌতে আর মুরীদ থাকেন বাংলাদেশে। তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে পত্রালাপ হতো। একবার পীর সাহেব তার মুরীদকে এক দীর্ঘ চিঠিতে একটা কাহিনী জানালেন। কাহিনীটা আমার ভাষায় ঠিক এই রকম:

বাংলাদেশ থেকে একজন সত্য সন্ধানী লোক খুব আশা করে লাক্ষ্ণৌ গেলেন পীর সাহেবের মুরীদ হওয়ার জন্য। পীর সাহেব তাকে সাক্ষাৎ দিলেন। বাংলাদেশী

www.pathagar.com

লোকটি জানালো সে বাংলাদেশ থেকে এসেছে পীর সাহেবের মুরিদ হওয়ার জন্য। পীর সাহেব খুব বড় আলেম ও বুযুর্গ লোক ছিলেন। তিনি তাকে এ ব্যাপারে কোনো কথা না বলে দীর্ঘক্ষণ ধরে তার সাথে আলাপ করলেন। অবশেষে বললেন, বাবা তোমাকে এখন আমি মুরীদ করতে পারছি না। তোমাকে একটা কাজ দিব, সে কাজ তোমাকে করতে হবে। বাংলাদেশী লোকটি জিজ্ঞেস করলো, হুজুর সে কাজটি কী? পীর সাহেব বললেন, 'কাজটা তেমন কিছু না তোমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতে হবে। প্রশ্নটা হলো দুনিয়ায় তোমার কাজ কী? তুমি চারদিকে তাকিয়ে দেখ, গাছ-পালা, নদী-নালা, রোদ-বৃষ্টি, জীব-জন্তু, বাতাস-পানি সবকিছুরই সুনির্দিষ্ট কাজ আছে। গাছ ফল দেয়। মানুষের জ্বালানি হয়। গরু, ছাগল দুধ দেয়। মানুষকে তার গোশত খাদ্য হিসেবে দেয়। পানি তৃষ্ণা মিটায়। সূর্য আলো দেয়। বাতাস মানুষের জীবন রক্ষা করে। এইভাবে তুমি চারদিকে যা কিছু দেখ সবকিছুরই কাজ আছে দুনিয়ায়। তোমাকে দিয়ে কোন কাজটা হয়। আল্লাহ তোমাকে কেন দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। চারদিকের সবকিছুই তুমি ভোগ করো, ব্যবহার করো। কিন্তু তুমি কার কাজে লাগো? তুমি এক বছর ধরে এই প্রশ্নটির উত্তর সন্ধান করো। এক বছর পর তুমি এসো আমি তোমাকে মুরীদ করবো। 'বাংলাদেশের লোকটি পীর সাহেবকে বললো ঠিক আছে হুজুর এক বছর ধরে আমি এই প্রশ্নটির উত্তর সন্ধান করব এবং প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আপনার কাছে আসবো। লোকটি পীর সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এল। এক বছর ধরে প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলো এবং উত্তর সন্ধান করলো। এক বছর পর সে লাক্ষ্ণৌতে ফিরে গেল। পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করল এবং বলল আপনার দেয়া প্রশ্নের জবাব আমি পেয়েছি। আমি মুরীদ হতে এসেছি। পীর সাহেব তাকে জিজ্ঞাস করলেন না প্রশ্নের কী জবাব সে পেয়েছে। তার বদলে আবার দীর্ঘক্ষণ ধরে বাংলাদেশী লোকটির সঙ্গে কথা বললেন। অবশেষে পীর সাহেব বললেন, বাবা তোমাকে আমি এবারও মুরীদ করতে পারছি না। আর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে। বাংলাদেশের লোকটি কিছুটা হতাশ হলো। কিন্তু পরক্ষণেই উৎসাহের সাথে সে বললো হুজুর কাজটা আমাকে দিন, আমি করবো। পীর সাহেব তাকে বললেন, বাবা তুমি এখান থেকে যাওয়ার পর তুমি যে মানুষকেই দেখবে, যার মুখই তোমার সামনে আসবে, তুমি তার পরিচয় নিয়ে ভাববে না, মনে করবে যে লোকটা তোমার চেয়ে ভাল এবং আল্লাহ

www.pathagar.com

লোকটাকে তোমার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন। যেহেতু লোকটিকে আল্লাহ তোমার চেয়ে বেশি ভালোবাসেন, সে জন্য তুমিও তাকে সমগ্র অন্তর দিয়ে ভালোবাসো। এক বছর ধরে তোমাকে এ কাজ করতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান, চোর-ডাকাত, খুনি যেই হোক, তোমার সামনে যাকে তুমি দেখবে তাকে তুমি এভাবে ভালোবাসবে। এক বছর পর তুমি এসো তোমাকে আমি মুরীদ করে নেব। বাংলাদেশী লোকটি এক বছর ধরে বাড়িতে হাটে-মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে যাকেই দেখলো তাকেই সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে নিঃস্বার্থভাবে নিজের চেয়ে বেশি ভালোবাসলো। এক বছর পর সে লাক্ষ্ণৌতে আবার ফিরে গেল। পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে সে বললো, হুজুর আপনি যেভাবে বলেছেন সব মানুষকে আমি সেইভাবে ভালোবাসতে চেষ্টা করেছি। আমাকে এবার দয়া করে মুরীদ করুন। পীর সাহেব তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে আগের মতোই দীর্ঘক্ষণ তার সাথে আলাপ করলেন নানা বিষয়ে। অবশেষে বললেন, বাবা তোমার আর আমার মুরীদ হওয়ার দরকার নেই। আমি তোমাকে মুরীদ করার ক্ষমতা দিলাম। গল্পের এখানেই শেষ।

গল্পের দুটি মৌলিক বিষয় লক্ষণীয়। একটি হলো এই দুনিয়ায় মানুষের মিশন কী? তার দায়িত্ব কী? কাজ কী? অন্য মৌলিক বিষয়টি হলো, পরিচয় নির্বিশেষে মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসা। এই দুইটি মৌলিক বিষয় একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষ যখন স্রষ্টার দেয়া মিশন সম্পর্কে জানে, তার দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন ও সক্রিয় হয়, মানুষ তখন প্রকৃত অর্থে মানুষ হয়ে দাঁড়ায়। যখন সে সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়, তখন তার মধ্যে বড়ত্বের অহংকার নির্মূল হয়ে যায়। আল্লাহর বান্দা হিসেবে তার দায়িত্ব কর্তব্য বড় হয়ে দাঁড়ায়। এসব মানুষ পরিচয় নির্বিশেষে সব মানুষকে ভালোবাসতে পারে এবং সকল বিপদ-আপদে তার পাশে দাঁড়াতে, সব ক্ষতি থেকে তাকে বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। এরা যেমন মানুষকে ভালোবাসে তেমনি মানুষরা এদেরকে ভালোবাসে এবং এদের কথা সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে। আমি শ্রোতাদের বললাম, অতীতে ইসলামী দাওয়াত যারা দিয়েছেন তারা যেমন একদিকে আল্লাহর দেয়া মিশন এবং নিজেদের দায়িত্ব কর্তব্যকে পুরোপুরি জানতেন, সেই সাথে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবেসেছেন মানুষকে। এদের দাওয়াত মানুষ দলে দলে গ্রহণ করেছে পাগলের মতো। আমি একটু উদাহরণ টেনে বাংলাদেশের প্রসঙ্গে

www.pathagar.com

বললাম, বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার হয়েছে মানুষকে ভালোবাসার মাধ্যমে। বাংলাদেশে ধর্ম প্রচার হয়েছে ইসলামী মিশনারীদের দ্বারা, শাসকদের দ্বারা নয়। এজন্যই ভারতে মুসলিম শাসনের কেন্দ্র দিল্লি এবং মুসলিম শাসকদের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, অথচ মুসলিম শাসন কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থিত বাংলায় শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ মানুষ মুসলমান। বাংলায় ইসলামের এই যে বিজয় তা ইসলামের বিজয়, মুসলিম শাসকদের বিজয় নয়। বাংলায় ইসলামের যে বিজয় তা মানুষকে ভালোবাসার বিজয়। আমি শ্রোতাদেরকে বললাম, আমরা যদি নিজেদেরকে মানুষের প্রতি ভালোবাসায় সজ্জিত করতে পারি এবং আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আমরা সচেতন হই, তাহলে আমাদের দাওয়াতও কাজ দিবে এবং আমাদের আহ্বানে মানুষের সাড়া পাওয়া যাবে।

আমার মনে হয় এই অনুষ্ঠানটাই ছিলো বেসরকারি পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমার শেষ প্রোগ্রাম। আমার মেয়ের বাড়িতে যে কয়দিন ছিলাম প্রত্যেকদিনই আমেরিকা প্রবাসী বাংলাদেশীদের কারো না কারো সাথে দেখা হয়েছে। অনেকের বাড়িতে গিয়েছি। দাওয়াত খেয়েছি। তাদের অনেকেরই নাম ভুলে গেছি। আমার এক অসুবিধা হলো কারো সঙ্গে কয়েকবার দেখা না হলে তাদের চেহারা মনে থাকলেও নাম মনে থাকে না। সম্ভবত আমার মেয়ের বাড়িতে অবস্থানের শেষ দিকে দেখা হয়েছিল মুনসুর খানের সঙ্গে তার বাড়িতে। তিনি ভয়েস অব আমেরিকায় কাজ করেন। জামাইসহ গিয়েছিলাম তার দাওয়াত রক্ষার জন্য। তার নামটা মনে আছে এই কারণে যে, তার সাথে অনেক ব্যাপারে অনেক আলাপ হয়েছিলো। তার পার্সোনাল কালেকশনে অনেক বই দেখলাম। তার গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখলাম। বইগুলো সব আমারও পছন্দের। খুব ভালো মানুষ তিনি। আমার পছন্দের কথা জেনে তিনি অনেকগুলো বই আমাকে দিয়ে দিলেন। যেগুলো খুবই দুষ্প্রাপ্য। আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম বইগুলো পেয়ে। কষ্ট হলেও আমি বইগুলো দেশে নিয়ে এসেছি।

সফরের সমাপ্তির দিকে এসে মনে হলো মেয়ে-জামাইদের সাথে যথেষ্ট সময় দেয়া হয়নি। মনে হলো প্রাণ খুলে যেন তাদের সাথে আলাপও হয়নি। দাওয়াত ও প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে বেশি সময় গেছে। অবশিষ্ট সময়ের বেশির ভাগ গেছে মার্কেটে ও এখানে সেখানে বেড়ানোর মধ্য দিয়ে। অবশ্য এমনটাই নাকি হয়। সুখের সময় খুব তাড়াতাড়ি নাকি কেটে যায়।

www.pathagar.com

আনন্দ বেদনা পাশাপাশিই চলে। বেদনার পর আনন্দ যেমন আসতে পারে। আনন্দের পর বেদনাও তেমনি আসে।

মেয়ের বাড়ি থেকে বিদায়ের দিনটি এলো। সকাল থেকে আমার মেয়েটিকে আমি নীরব দেখেছি। মুখে সে হাসি নেই। বিদায়ের সময় কান্নারুদ্ধ কণ্ঠ এবং চোখে অশ্রুর ধারা গোপন করার চেষ্টাও দেখলাম। আমার আমেরিকা সফরের আনন্দ যেন বিষাদে রূপ নিলো। এমন মুহূর্তকে আমি ভয় করি। একটা কথা খুব বড় হয়ে বুকে বিঁধলো। আমার আমেরিকা প্রবাসী মেয়েটির হাসি আনন্দ ও স্বাভাবিকতার মধ্যেও যে দেশ ও দেশের স্বজনদের জন্য বেদনার এক বন্যা তাকে আকুল করে থাকে, তার সন্ধান আমরা কোনোদিনও করিনি। এয়ারপোর্টে আমাকে বিদায় দিতে এসেছিলো আমার জামাই ড. হাসমত। তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইমিগ্রেশনে প্রবেশের শেষ মুহূর্তে জামাইয়ের মোবাইলে মেয়ের টেলিফোন এলো। জামাই ড. হাসমত আমাকে টেলিফোন দিয়ে কিছুটা দূরে সরে গেল। বেদনার বিব্রতকর অবস্থা সেও এড়াতে চায়। মেয়ের সাথে কথা বললাম। আমরা কেউ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারিনি। একদিকে বিদায় দেয়ার কষ্ট অন্যদিকে বিদায় নেয়ার কষ্ট। পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো, সবচেয়ে নতুন, সবচেয়ে পরিচিত কষ্টই হলো স্বজনের কাছ থেকে বিদায়ের চির অনাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত।

0

www.pathagar.com

আবুল আসাদ

যুক্তরাষ্ট্রে ধর্ম সমাজ